মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ও ইসলামের সৌন্দর্য

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ও ইসলামের সৌন্দর্য

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

মাকাসিদ আশ্‌শরীআহ্‌ ও ইসলামের সৌন্দর্য

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

মুক্তদেশ
মুক্তচিন্তার সৃজনশীল প্রকাশন

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ও ইসলামের সৌন্দর্য

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

প্রকাশক

মুক্তদেশ প্রকাশন

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৬৭৫৪১৭৫৬৪, ০১৮২২৯০৩৬৬৬.

প্রচ্ছদ

জিয়াউল আজহার মুক্তার

ক্যালিগ্রাফি

মুকাদ্দিম পৃ

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

মুদ্রণ

বরাত প্রিন্টার্স

২১ শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০১৫

মূল্য : ৩৫০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। যাঁর অসীম কৃপায় এ গ্রন্থখানির রচনা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব-মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম।

আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতি। তিনি মানুষের প্রতি করুণা করে তাদেরকে সিরাতুম মুস্তাকিম বা সুপথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানি কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। এসব কিতাবের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানবজাতিকে দেয়া হয়েছে ইসলামী শরী'আহ্ নামের অনন্য এক জীবনবিধান, যা দ্বারা সকল যুগের ও মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সমস্যার যৌক্তিক ও বাস্তব সমাধান পেশ করা যায়।

অহির মাধ্যমে প্রাপ্ত জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী শরী'আহ্র রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের বহু দেশ দীর্ঘ তেরশ' বছর ইসলামী শরী'আহ্র আইন দিয়েই শাসিত হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামী শরী'আহ্ সেসব দেশের সকল মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সকল চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে।

প্রকৃতি জগতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত আইন-কানুন সক্রিয় রয়েছে বলেই সেখানে কোনো অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা নেই। তেমনিভাবে মানবসমাজে তাঁর বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে সেখানেও থাকবে না কোনো অন্যায়-জুলুম, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা।

আল কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ্র কোনো সৃষ্টিই উদ্দেশ্যহীন নয়। ইসলামী শরী'আহ্ তাঁরই বিধান। কাজেই এরও রয়েছে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। যার প্রধান লক্ষ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা।

ইসলামী শরী'আহ্তে মানুষের কল্যাণকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়। এতে ধর্ম-বিজ্ঞান ও আইন-বিজ্ঞানকে আলাদা করে দেখা হয় না। এটি শুধু পারলৌকিক কল্যাণের পথই দেখায় না, দেখায় কীভাবে ইহলোকেও শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ অর্জন করা যায়। আর ইসলামী শরী'আহ্র এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ফিকহি পরিভাষায় বলা হয় 'মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্'। এটি ইসলামী আইন-

www.pathagar.com

দর্শনের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এটিকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবেও গণ্য করা হয়।

নতুনভাবে উদ্ভাবিত সমস্যাদির সমাধানে কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের পাশাপাশি ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র প্রয়োগ পদ্ধতি, বিভিন্ন রীতিনীতি এবং শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্যাবলির আলোকে ইসলামের চিরন্তন ও নান্দনিক সৌন্দর্যের বিভিন্ন দিক এ গ্রন্থে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বত্র সুশাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, কল্যাণধর্মী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং চালু করা, দাসপ্রথার উচ্ছেদ, পরিবেশ সংরক্ষণ, সার্বজনীন মানবাধিকার ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, স্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা বিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থখানি ইসলামী শরী'আহ্ সম্পর্কে পাঠকের জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ওপর বাংলা ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ আমার নজরে পড়েনি। হতে পারে এটিই বাংলা ভাষায় রচিত এ বিষয়ের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-রচনার প্রথম পদক্ষেপ। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায়ের মতাদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নয়; বরং ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্য তুলে ধরার প্রয়াসেই এ গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ্ এবং যেসব মহামানব ইসলামের কল্যাণে অবদান রেখেছেন তাঁদের রচনা থেকে এ গ্রন্থে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অন্ধ অনুকরণ প্রবণতার অবকাশ বিদ্যমান নেই মোটেও ।

মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি অগোচরে থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো ভুল-ত্রুটি কারো নজরে এলে আমাকে তা অবগত করা হলে কৃতজ্ঞ হবো। গ্রন্থখানির ব্যাপারে সকলের সুচিন্তিত অভিমত সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থখানি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যারা সময় ও শ্রম কুরবানি করেছের তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই আমার একান্ত প্রত্যাশা।

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ্/১৩

১. ইসলামী শরী'আহ্‌র পরিচিতি/১৩

২. ইসলামী শরী'আহ্‌র পরিধি ও বিস্তৃতি/১৪

৩. ইসলামী শরী'আহ্‌র মৌলিক বৈশিষ্ট্য/১৬

৩.১. ইসলামী শরী'আহ্ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান/১৬

৩.২. আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি/১৬

৩.৩. ইসলামী শরী'আহ্ বিশ্ব-মানবতাবাদী/১৭

৩.৪. ইসলামী শরী'আহ্ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান/১৭

৩.৫. অপরিবর্তনীয়/১৭

৩.৬. পরিবর্তনশীলতা/১৮

৩.৭. যুগোপযোগিতা ও গতিশীলতা/১৮

৩.৮. নমনীয়তা ও উদারতা/১৮

৩.৯. সার্বজনীনতা/১৯

৩.১০. পালনে সহজতা এবং কঠোরতা মুক্ত/১৯

৩.১১. সমঝোতার ব্যবস্থা /১৯

৪. ইসলামী শরী'আহ্ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য/২০

৫. আধুনিক আইনি প্রয়োজন পূরণে ইসলামী শরী'আহ্‌র সক্ষমতা/২১

৬. আইনের আধুনিক তত্ত্বসমূহের আগেই ইসলামী শরী'আহ্‌র জন্ম/২৪

৬.১. সমতা তত্ত্ব/২৫

৬.২. স্বাধীনতা তত্ত্ব/২৫

৬.৩. শাসকের জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতার বিধান/২৫

৬.৪. শাসকের সীমিত ক্ষমতা তত্ত্ব/২৬

৬.৫. পারিবারিক শৃঙ্খলা তত্ত্ব/২৬

৬.৬. সুদমুক্ত অর্থনীতি তত্ত্ব/২৬

৬.৭. দারিদ্র্য বিমোচন তত্ত্ব/২৬

৭. আধুনিক আইনের মূলনীতি ও ইসলামী শরী'আহ্/২৭

৮. ইসলামী শরী'আহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি/২৮

৯. ইসলাম ও সার্বজনীন মানবাধিকার/৩০

৯.১. মানুষের মান-মর্যাদা ও সমতার অধিকার/৩১

৯.২. জীবনের ও নিরাপত্তার অধিকার/৩২

৯.৩. ন্যায়বিচারের অধিকার/৩৩

৯.৪. ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার/৩৪

www.pathagar.com

৯.৫. আশ্রয় লাভের অধিকার/৩৪
৯.৬. বিবাহ ও তালাকের অধিকার/৩৫
৯.৭. সম্পদ লাভের অধিকার/৩৫
৯.৮. ধর্ম, চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার/৩৬
৯.৯. শ্রমিকের অধিকার/৩৬
৯.১০. শিক্ষালাভের অধিকার/৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ্র উৎস/৩৮
ইসলামী শরী'আহ্র উৎস/৩৮
১. কুরআন/৩৯
২. সুন্নাহ্/৪০
৩. ইজমা/৪১
৪. কিয়াস/৪৩
৫. ইসতিহ্সান/৪৬
৬. মাসালিহ্ মুরসালাহ্/৪৮
৭. উরফ/৪৯
৮. সাদ্দুয যারায়ি/৫১
৯. ইসতিসহাব/৫২
১০. তা'আমুলুস সাহাবা/৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্/৫৫
১. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পরিচিতি/৫৫
২. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ক'টি প্রামাণ্য সংজ্ঞা/৫৬
৩. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ক্রমবিকাশ/৫৮
৪. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র প্রামাণিকতা/৬০
৪.১. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পক্ষে কুরআনের দলিল/৬০
৪.২. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পক্ষে সুন্নাহ্র দলিল/৬১
৪.৩. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পক্ষে ইজমার দলিল/৬৩
৪.৪. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পক্ষে আকলি বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল/৬৬
৫. ইসলামী শরী'আহ্র বিভিন্ন বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও কল্যাণ/৬৬
৫.১. সালাতের উদ্দেশ্য/৬৬
৫.২. সিয়াম বা রোযার উদ্দেশ্য/৬৮
৫.৩. যাকাতের উদ্দেশ্য/৬৯

www.pathagar.com

৫.৪. হজ্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য/৭০
৫.৫. ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য/৭১
৬. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র শ্রেণিবিভাগ/৭৩
৬.১. মৌলিকত্বের দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য/৭৩
৬.২. ব্যাপকতা বা সার্বজনীনতার দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য/৭৩
৬.৩. অকাট্যতার দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য/৭৪
৭. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র বিভিন্ন স্তর/৭৪
৭.১. জরুরিয়াত/৭৫
৭.২. হাজিয়াত/৭৭
৭.৩. তাহসিনিয়াত/৭৯
৮. ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্য চেনার পদ্ধতি/৭৯

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান নির্ণয় ও মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্/৮৪
১. শরী'আহ্ অভিযোজন ও সাম্প্রতিক বিষয়/৮৪
২. শরী'আহ্ অভিযোজন বা সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান নির্ণয়ের গুরুত্ব/৮৪
৩. ইজতিহাদ সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান নির্ণয়ের প্রধান হাতিয়ার/৮৫
৪. সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে করণীয়/৯২
৫. সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান উদ্ভাবনের মূলনীতি/৯৪
৬. সাম্প্রতিক বিষয়ে শরী'আহ্র সিদ্ধান্ত বের করার পদ্ধতি/১০২
৬.১. শর'ঈ দলিলের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়/১০৪
৬.২. ফিকহি কায়িদার মাধ্যমে বিধান নির্ণয়/১০৪
৬.৩. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়/১০৫
৭. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ফিকহি রীতিনীতি/১১২
৮. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ও অগ্রাধিকার ফিকহ্/১১৩
৮.১. অগ্রাধিকার ফিকহ'র প্রামাণিকতা/১১৫
৮.২. রাসূলুল্লাহ্ স. এর অগ্রাধিকার নীতি/১১৬
৮.৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. এর অগ্রাধিকার নীতি/১১৭
৮.৪. ইবনুল কাইয়্যিম র. এর অগ্রাধিকার নীতি/১১৮
৮.৫. ইমাম গাযালি র. এর অগ্রাধিকার নীতি/১১৮
৮.৬. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক র. এর অগ্রাধিকার নীতি/১১৯
৮.৭. অন্যান্য মনীষীর অগ্রাধিকারনীতি/১১৯
৯. অগ্রাধিকার ফিকহ্ অনুসরণের অপরিহার্যতা/১২০
৯.১. বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান/১২১
৯.২. অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন/১২২

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মাকাসিদ আশ্‌ শরী'আহ্‌ ও অবারিত মানবকল্যাণ/১২৩

১. মাকাসিদ আশ্‌ শরী'আহ্‌ ও অবারিত মানবকল্যাণ/১২৩

২. মাসালিহ্‌ মুরসালাহ্‌ বা জনকল্যাণকে শরী'আহ্‌র উৎস হিসেবে গ্রহণ/১২৫

৩. মাসালিহ্‌ মুরসালাহ্‌র প্রামাণিকতা/১২৭

৪. মাসালিহ্‌ মুরসালাহ্‌র গুরুত্ব ও তাৎপর্য/১২৭

৫. মাসলাহা বা কল্যাণের প্রকারভেদ/১২৯

৬. মাসলাহা বা কল্যাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়/১২৯

৭. মাসালিহ্‌ মুরসালাহ্‌র উদাহরণ/১৩০

৮. জনকল্যাণকে শরী'আহ্‌র উৎস হিসেবে গ্রহণ করার শর্ত/১৩৩

৯. বিভিন্ন মাযহাব ও আলিমের দৃষ্টিতে মাসলাহা বা জনকল্যাণ/১৩৪

১০. মাসলাহা বা কল্যাণ গ্রহণ না করার যুক্তিখণ্ডন/১৩৬

১১. শরী'আহ্‌র বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানবকল্যাণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব/১৩৭

১২. মানবকল্যাণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তন/১৩৯

১২.১. মঙ্গাপীড়িত অবস্থায় চুরির শাস্তি মওকুফ/১৪০

১২.২. উমর রা. কর্তৃক 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' খাতে যাকাত প্রদান স্থগিতকরণ/১৪০

১২.৩. লুকতাহ্‌ বা কুড়িয়ে পাওয়া মালের হুকুমের বিভিন্নতা/১৪১

১৩. কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে শাস্তিবিধানে কঠোরতা আরোপের কতিপয় দৃষ্টান্ত/১৪৩

১৪. কল্যাণ সাধনের জন্য শাস্তি মওকুফের অনন্য নজির/১৪৪

১৫. সামষ্টিক কল্যাণ বিধানে শাস্তি স্থগিত/১৪৮

১৬. সামষ্টিক কল্যাণের জন্য বৈধ ভোগের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ/১৪৯

১৭. ইসলামী শরী'আহ্‌ আইনের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ সমীচীন নয়/১৫০

১৮. ইসলামী শরী'আহ্‌র দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়/১৫২

১৯. সমাজে ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগের সুফল ও কল্যাণ/১৫৩

১৯.১. হত্যার শাস্তি ও তা প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কল্যাণ/১৫৫

১৯.২. ব্যভিচারের শাস্তি ও তা প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কল্যাণ/১৫৬

১৯.৩. চুরির শাস্তি ও তা প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কল্যাণ/১৫৭

১৯.৪. ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননার শাস্তি তা প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কল্যাণ/১৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ্‌র কতিপয় উদ্দেশ্য/১৬৩

১. হিফয আন্‌-নফস বা জীবন সংরক্ষণ/১৬৬

১.১. ইসলামে জীবন দৃষ্টি/১৬৭

www.pathagar.com

১.২. মানবজীবনের পবিত্রতা ও মর্যাদা/১৬৭
১.৩. ইসলামে জীবনরক্ষার নিশ্চয়তা/১৬৯
১.৪. মানুষের জীবনরক্ষা ও বিকাশে শরী'আহ্‌র বিধান/১৭০
১.৫. ইসলামে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ/১৭০
১.৬. আত্মহত্যা নিষিদ্ধ/১৭১
১.৭. মায়ের গর্ভে সন্তান ও পরিত্যক্ত শিশুর নিরাপত্তা/১৭১
১.৮. মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা নিষিদ্ধ/১৭২
১.৯. জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন/১৭৩
১.১০. হত্যা রোধে শাস্তি-বিধান/১৭৪
১.১১. জীবন বাঁচানোর জন্য ঈমান গোপন করা ও মৃত জন্তু খাওয়া যাবে/১৭৪
১.১২. যুদ্ধনীতিতে সংস্কার সাধন/১৭৫
১.১৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মাকাসিদ আশ্‌ শরী'আহ্‌/১৭৫
১.১৪. অমুসলিমদের জীবনের নিরাপত্তা/১৭৮

২. হিফয আদ-দীন বা দীন সংরক্ষণ/১৮০
২.১. মানবসম্পদ উন্নয়নে দীন পালনের প্রয়োজনীয়তা/১৮১
২.২. ইসলামে ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা/১৮৫
২.৩. অমুসলিমদের ওপর ইসলামী আইনের প্রয়োগ ও নাগরিক অধিকার/১৮৯
২.৪. অমুসলিমদের অধিকার ব্যাহত হওয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ/১৯১

৩. হিফয আল-আকল বা বুদ্ধি-বিবেকের হিফাযত/১৯৩
৩.১. আকল বা বিবেকের প্রয়োজনীয়তা/১৯৪
৩.২. আকল হিফাযত ও বিকাশের উপায়/১৯৭

৪. হিফয আন্‌-নসল বা বংশধারা সংরক্ষণ/২০০
৪.১. বংশধারা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা/২০০
৪.২. বংশধারা রক্ষার উপায়/২০১

৫. হিফয আল-মাল বা সম্পদের হিফাযত/২০৪
৫.১. ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা/২০৫
৫.২. সম্পদ সংরক্ষণের উপায়/২০৬
৫.২.১. মালিকানা রক্ষার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ/২০৬
৫.২.২. সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ/২০৭
৫.২.৩. পবিত্রকরণের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ/২০৯
৫.২.৪. সঞ্চালনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ/২০৯
৫.২.৫. সম্পদ অর্জন ও এর উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ/২১০
৫.২.৬. ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে সম্পদ সংরক্ষণ/২১১
৫.২.৭. অন্যায় ও আত্মসাৎ থেকে সম্পদ সংরক্ষণ/২১২
৫.২.৮. ভোগবিলাস ও অপচয় থেকে সম্পদ সংরক্ষণ/২১২
৫.২.৯. সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি ও দুর্নীতি থেকে সম্পদ সংরক্ষণ/২১৩
৫.২.১০. সম্পদের মূল্যমান রক্ষার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ/২১৩

www.pathagar.com

৫.৩. ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্/২১৪
৫.৪. ইসলামী ব্যাংকিং-এ মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্/২১৮
৫.৫. ইসলামী ব্যাংকিং, সামষ্টিক সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্/২২২
৫.৬. অমুসলিমদের সম্পদ সংরক্ষণ/২২৩
৫.৭. অমুসলিমদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা/২২৫
৫.৮. অমুসলিমদেরকে সাদাকাহ্ ও যাকাতের অর্থ প্রদান/২২৭
৬. ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন/২২৯
৬.১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য/২২৯
৬.২. ইবাদতের উদ্দেশ্য/২২৯
৬.৩. ইবাদত একটি ব্যাপক ধারণা/২৩০
৬.৪. আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মর্যাদা ও গুরুত্ব/২৩২
৬.৫. ইবাদতের কল্যাণ পায় ইবাদতকারী নিজে/২৩২
৭. ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধন/২৩৩
৭.১. কল্যাণের ধারণা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী/২৩৩
৭.২. ইসলামী শরী'আহ্র প্রতিটি বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর/২৩৪
৭.৩. মুহাম্মদ স. ও কুরআন উভয়ই বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণস্বরূপ/২৩৪
৭.৪. মনীষীদের দৃষ্টিতে ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য/২৩৫
৮. যাবতীয় অন্যায় ও অকল্যাণ দূর করা/২৩৬
৮.১. ইবাদত/২৩৭
৮.২. শাস্তিবিধান/২৩৭
৮.৩. সমন্বিত প্রয়াস/২৩৮
৮.৪. রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ/২৩৮
৯. মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির পরিবেশ সংরক্ষণ/২৩৮
৯.১. মূল্যবোধের বিকাশ/২৩৯
৯.২. আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা/২৩৯
৯.৩. যোগাযোগ ও উপঢৌকন বিনিময়/২৩৯
৯.৪. কটুবাক্য, কলহবিবাদ ও অযথা তর্কবিতর্ক নিষিদ্ধ/২৪০
৯.৫. মীমাংসা ও শান্তিমূলক ব্যবস্থা/২৪০
১০. মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান/২৪১
১০.১. মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংরক্ষণ/২৪৪
১০.২. দোষ-ত্রুটি গোপন করা কল্যাণকর/২৪৫
১০.৩. উপহাস না করা/২৪৬
১০.৪. মন্দ নামে না ডাকা/২৪৬
১০.৫. অমূলক ধারণা বর্জন করা/২৪৬
১০.৬. কাযাফ বা মিথ্যা অপবাদ দেয়া নিষিদ্ধ/২৪৭
১১. সহজপন্থা গ্রহণ ও কঠোরতা বর্জন/২৪৭
১২. ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থি জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করা/২৫০

www.pathagar.com

১২.১. ইসলাম মধ্যপন্থা অনুসরণের কর্মসূচি/২৫১
১২.২. ইসলামী শরী'আহ্ মধ্যপন্থি জাতির জীবন বিধান/২৫১
১২.৩. চরমপন্থা গ্রহণযোগ্য নয়/২৫১
১২.৪. অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়/২৫২
১২.৫. ইসলাম সন্ন্যাসব্রত সমর্থন করে না/২৫২
১২.৬. জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা গ্রহণ করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য/২৫৩
১৩. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা/২৫৪
১৩.১. আদল ও সুবিচার/২৫৪
১৩.২. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব/২৫৫
১২.৩. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ/২৫৫
১৩.৪. আইনের চোখে সবাই সমান/ ২৫৬
১৩.৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা/২৫৭
১৩.৬. ন্যায়বিচারের সোনালি ইতিহাস/২৫৯
১৪. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা/২৬০
১৫. দাসপ্রথার উচ্ছেদ/২৬৭
১৫.১. দাসপ্রথা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়/২৬৯
১৫.২ দাসপ্রথা উচ্ছেদের প্রাথমিক কৃতিত্ব ইসলামের/২৬৯
১৫.৩. ইসলাম এককথায় দাসপ্রথা উচ্ছেদ করেনি কেন/২৭০
১৫.৪. দাসপ্রথা বিলুপ্তকরণে ইসলামের কার্যকর পদক্ষেপ/২৭১
১৫.৫. মানুষকে দাস বানানো হারাম/২৭১
১৫.৬. দাস মুক্তকরণে ইসলামের দুই পদক্ষেপ/২৭১
১৫.৭. পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান/২৭২
১৬. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ/২৭৪
১৬.১. হিসবাহ্ বা সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ/২৭৬
১৬.২. নাসিহাহ্ বা অন্তর নিংড়ানো উপদেশ/২৭৭
১৬.৩. শুরা বা পরস্পরের পরামর্শ বিধান/২৭৭
১৬.৪. গঠনমূলক সমালোচনা/২৭৯
১৭. রাজনীতির অধিকার সংরক্ষণ/২৮১
১৭.১. ইসলামী রাজনীতির ধারণা/২৮২
১৭.২. দীন, রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক/২৮২
১৭.৩. রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা/২৮৫
১৭.৪. রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য প্রত্যাশা/২৮৮
১৮. নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ/২৯০
১৮.১. নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা/২৯২
১৮.২. ইসলামে মায়ের অগ্রাধিকারমূলক মর্যাদা/২৯৩
১৮.৩. কন্যা সন্তান লালন-পালনকারীর জন্য সুসংবাদ/ ২৯৩
১৮.৪. ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার/২৯৩

www.pathagar.com

১৮.৫. নারীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরির অধিকার/২৯৪
১৮.৬. নারীর রাজনৈতিক অধিকার/২৯৫
১৮.৭. বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্ব/২৯৭
১৮.৮. ইসলাম প্রচারে নারীর অবদান/২৯৮
১৮.৯. কল্যাণমূলক কাজে মুসলিম নারীর অবদান/২৯৯
১৮.১০. যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ/২৯৯

১৯. পরিবেশ সংরক্ষণ/৩০০
১৯.১. গাছপালা ও বনাঞ্চল রক্ষায় শরী'আহ্র নির্দেশনা/৩০১
১৯.২. সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টিতে শরী'আহ্তে উৎসাহ প্রদান/৩০২
১৯.৩. অনাবাদি জমিতে বৃক্ষ লাগানো/৩০২
১৯.৪. গাছ পরিচর্যা করা সদকায়ে জারিয়া/৩০৩
১৯.৫. পশু-পাখির উপকারিতা সম্পর্কে আল কুরআনের বর্ণনা/৩০৩
১৯.৬. জীবের প্রতি দয়া করা শরী'আহ্র নির্দেশ/৩০৩
১৯.৭. অন্যায়ভাবে জীব হত্যা নিষিদ্ধ/৩০৪
১৯.৮. পাখির বাচ্চা ধরে আনা উচিত নয়/৩০৫
১৯.৯. পশুপাখি নির্যাতন করা ঠিক নয়/৩০৫
১৯.১০. লড়াইয়ের মাধ্যমে পশুপাখির ক্ষতি করা উচিত নয়/৩০৬
১৯.১১. জীবজন্তুর অধিকার/৩০৬

২০. শান্তি ও স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ/৩০৭
২০.১. মানবভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা/৩০৭
২০.২. শত্রুর সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার কুরআনি নির্দেশ/৩০৯
২০.৩. শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ/৩১০
২০.৪. শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি সম্পাদন/৩১০
২০.৫. মদিনা সনদ শান্তির ঐতিহাসিক মডেল/৩১০
২০.৬. শান্তি রক্ষায় প্রতিশ্রুতি পালন/৩১১
২০.৭. দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধের শান্তিপূর্ণ উপায়/৩১৩
২০.৮. শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে যুদ্ধ ও মতভেদ না করার কুরআনি দৃষ্টিভঙ্গি/৩১৩
২০.৯. ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সব যুদ্ধ নিষিদ্ধ/৩১৪
২০.১০. সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও সম্পদ লুটের জন্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ/৩১৫
২০.১১. প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ/৩১৬
২০.১২. যুদ্ধ নয়, শান্তিই ইসলামের পরম আরাধ্য/৩১৭
২০.১৩. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অসহায়-নির্যাতিতদের সহায়তার জন্য যুদ্ধ/৩১৯
২০.১৪. ইসলামে যুদ্ধের নিয়ম ও শিষ্টাচার মানবিকতা সম্পন্ন/৩১৯
২০.১৫. পরাজিতদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ/৩২০

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
ইসলামী শরী‘আহ্

১. ইসলামী শরী‘আহ্র পরিচিতি

শরী‘আহ্ (شَرِيْعَةٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ দীন, ধর্ম, জীবনপদ্ধতি, নিয়ম-নীতি, সুস্পষ্ট ও সহজ-সরল পথ ইত্যাদি। আর শরী‘আহ্র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো পানির উৎসস্থল, ঝরনা, চলার পথ ইত্যাদি। আরবি ভাষায় যখন বলা হয়, شَرَعَتِ الْإِبِلُ (শারা‘আতিল ইবিল) তখন এর অর্থ হয়, উটের পাল পানি পান করার জন্য জলাশয়ের দিকে রওনা হয়েছে। জলাশয়ের সাথে শরী‘আহ্র সাদৃশ্য এ দিক দিয়ে যে, এ দুটোই জীবনরক্ষার উপায় ও পথ। পানি যেমন দেহকে সজীব করে, তেমনি শরী‘আহ্ও মানুষের আত্মা ও বিবেকের জীবনীশক্তি যোগায়। রাগিব আল ইস্পাহানি র. বলেন, শরী‘আহ্কে এ নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, যে ব্যক্তি যথার্থভাবে শরী‘আহ্কে গ্রহণ করে সে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারীর মতো হয়ে যায়।[১]

সহজ, সরল ও সঠিক পথ অর্থেই শরী‘আহ্ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে আল কুরআনে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا-

অর্থাৎ, ‘অতঃপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ বিধানের (শরী‘আহ্র) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো।’[২]

শরী‘আহ্র অপর একটি নাম হচ্ছে ‘শির‘আহ্’। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا-

অর্থাৎ, ‘আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি আইন (শরী‘আহ্) ও নির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি।’[৩]

অন্য দিকে আইন প্রণয়ন, প্রচলন ও প্রবর্তন করা বুঝাতে আরবিতে اَلتَّشْرِيْعُ (আততাশরি‘) শব্দের ব্যবহার করা হয়। আর আইন প্রণয়নের বিষয়টি যখন ইসলামের দিকে বিশেষিত হয়, তখন বলা হয় اَلتَّشْرِيْعُ الْإِسْلَامِيُّ (আততাশরি‘ আল ইসলামী) বা ইসলামী আইন প্রণয়ন, প্রচলন ও প্রবর্তন।

---

[১]আল-ইস্পাহানি, আল-মুফরাদাতু ফি গারিবিল কুরআন, পৃ. ২৪৭।

[২]আল কুরআন, ৪৫ : ১৮।

[৩]আল কুরআন, ৫ : ৪৮।

www.pathagar.com

পরিভাষায় ইসলামী শরী'আহ্ হলো ইসলামের সেই বিধিবিধান ও নীতিমালা যা মহান আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য প্রণয়ন, প্রবর্তন ও বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব বিধিবিধান আকিদা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতি, আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিকতা, ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণ (মু'আমালাহ্)-সহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। বস্তুত বিশ্বাসী মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন নিয়ন্ত্রণকারী বিধিবিধানের সামগ্রিক রূপকেই ইসলামী শরী'আহ্ বলা হয়। ইসলামী শরী'আহ্র ক'টি প্রামাণ্য সংজ্ঞা এখানে তুলে ধরা হলো :

ইমাম শাতিবি র. বলেন, ' ইসলামী শরী'আহ্ হচ্ছে সেই বিধান, যা দায়িত্বশীল মানুষের কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে একটা সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে।'[১]

ড. আব্দুল করিম যায়দান বলেন, 'মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্র জন্য যেসব বিধিবিধান জারি করেছেন তাকে ইসলামী শরী'আহ্ বলা হয়। সে বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে।'[২]

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. বলেন, 'এটা হচ্ছে মহানবী স.-এর নিকট নাযিলকৃত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্বাসী মানুষের চিন্তাধারা, কর্ম ও সামগ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রদত্ত আইনগত ব্যবস্থা। এটি মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র এবং সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী সামাজিক ব্যবস্থা। যেখানে কোনো বাহুল্য বা অপূর্ণাঙ্গতা বলতে কিছু নেই।'[৩]

ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম বলেন, 'ইসলামী শরী'আহ্ হচ্ছে তাই যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্গণের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তাদের ওপর তা অপরিহার্য করেছেন।'[৪]

২. ইসলামী শরী'আহ্র পরিধি ও বিস্তৃতি

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামী শরী'আহ্ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এটি একটি বিশাল প্রাসাদের মতো। এ প্রাসাদের খুঁটি আছে, দরোজা-

---

[১]ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর-রিযকী, মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ১২।

[২]ড. আব্দুল করিম যায়দান, আল-মাখদাল লিদ দিরাসাতিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ, আলেকজান্দ্রিয়া, দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯, পৃ. ৩৯।

[৩]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, দি ইসলামিক ল' এ্যান্ড কন্‌সটিটিউশন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : খুরশিদ আহমাদ, লাহোর, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৬৭, পৃ. ৫৩।

[৪]ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, আল মাকাসিদুল আম্মা লিশ্ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ, আল মাহমুদ আলাম আল ইসলামী, রিয়াদ, ১৪১৫ হি., পৃ. ১৯-২১।

www.pathagar.com

জানালা আছে। রুচিশীল, মানসম্মত অসংখ্য আসবাবে সুসজ্জিত ও আলোকিত এ প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ। এ প্রাসাদের শুধু একটি ইটকে যেমন প্রাসাদ বলা হয় না, তেমনি একটি জানালাও শুধু প্রাসাদ নয়। বরং সবটুকু মিলেই প্রাসাদের অনুপম সৌন্দর্য প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শরী'আহ্র পরিধি দীন ইসলামের সকল বিধিবিধানকেই অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলামী শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত দিক ও বিভাগগুলো হলো :

২.১. আকিদা বা বিশ্বাস : ইসলামী শরী'আহ্র আকিদাগত বিষয়গুলো হলো, আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাগণ, নবী-রাসূলগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, বিচার দিবস, সকল ভালোমন্দ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয় এবং মৃত্যুর পর উত্থিত হওয়ার ওপর ঈমান আনা।

২.২. ইবাদত: যেমন, সালাত, সাওম, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি।

২.৩. মু'আমালাহ্: সামাজিক কর্মকাণ্ড। যেমন, লেনদেন, আত্মীয়তা-বন্ধুত্ব স্থাপন, হদ (নির্দিষ্ট সাজা) এবং তাযির (অনির্দিষ্ট সাজা), সামাজিক রীতিনীতি, আখলাক ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটি বিষয়েই ইসলামী শরী'আহ্র বিধান রয়েছে। মু'আমালাহ্ আবার পাঁচ প্রকার। যথা :

২.৩.১. **আর্থিক লেনদেন** : যেমন, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসাবাণিজ্য, অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ইত্যাদি।

২.৩.২. **বিবাহ-শাদি** : নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক-সম্বন্ধ, বিবাদ-বিসংবাদ, ঝগড়া-ফাসাদ সংক্রান্ত নীতিমালা।

২.৩.৩. **আমানত** : একজন অন্যজনের নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা।

২.৩.৪. **মিরাস** : কেউ মারা গেলে তার সম্পদে উত্তরাধিকারীদের নির্দিষ্ট অংশ লাভ।

২.৩.৫. **হদ এবং তাযির** : যেমন, কাউকে হত্যা করা, কারো ধনমাল হরণ করা, কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা, কাউকে লাঞ্ছিত করা, বংশনিপাত করা ইত্যাদি শাস্তিসংক্রান্ত বিধান।

২.৩.৬. **অন্যান্য** : এমন কতক ব্যাপার রয়েছে যেগুলো রীতিনীতি হিসেবে সমাজে প্রচলিত রয়েছে, যেমন: উত্তম আখলাক, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। এ ছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ও ইসলামী শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

৩. ইসলামী শরী'আহ্‌র মৌলিক বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক বিষয় বা বস্তুর কতগুলো গুণ বা বিশেষত্ব থাকে, যার দ্বারা তাকে অপরাপর বিষয় বা বস্তু থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়। ইসলামী শরী'আহ্‌রও রয়েছে এমন কতগুলো মৌলিক ও চিরন্তন গুণ ও বৈশিষ্ট্য। এখানে ইসলামী শরী'আহ্‌র কতগুলো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো

৩.১. ইসলামী শরী'আহ্ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান : ইসলামী শরী'আহ্ আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান। তিনি যুগে যুগে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই দিয়েছেন বিশেষ পথ-নির্দেশনা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সঠিক পথ-নির্দেশনা আসবে তখন যারা আমার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না।'[১]

ড. ইউসুফ আল কারযাভি ইসলামী শরী'আহ্‌কে 'শরী'আতে রব্বানি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। শরী'আতে রব্বানি দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ্ প্রদত্ত হওয়া ও আল্লাহ্‌মুখী হওয়া। আল্লাহ্ প্রদত্ত হওয়া বলতে বুঝানো হয় এর ভিত্তি ও বিধিবিধান আল্লাহ্‌র দেয়া। মানুষের মধ্যে স্বভাবসুলভ দুর্বলতা ও অযোগ্যতা থাকে এবং স্থান-কাল, অবস্থা ও সংস্কৃতি দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়, তাছাড়া মানুষ পূর্বপুরুষদের মেজাজ, প্রবৃত্তি ও রাগ-অনুরাগের বশবর্তী হয়ে থাকে বলে তাদের রচিত বিধান সবসময় মানুষের জন্য কল্যাণকর নাও হতে পারে। কিন্তু শরী'আহ্ সেই মহান আল্লাহ্‌র দেয়া যিনি এ বিশ্বের খালিক বা স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক এবং প্রতিপালক। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি জানেন কিসে তাদের কল্যাণ আর কিসে তাদের পরম উন্নতি। কোন জিনিসটি তাদের উপযোগী আর কোন জিনিসটি তাদের সংশোধন করবে। আর আল্লাহ্‌মুখী হওয়ার অর্থ হলো শরী'আহ্‌র মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মানুষের সম্পর্কের উন্নয়ন। যাতে মানুষ যথার্থভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে জানতে ও চিনতে পারে এবং যথোপযুক্তভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করতে পারে। কারণ মানুষ এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট।[২]

৩.২. আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি : ইসলামী শরী'আহ্‌তে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া হয়। অর্থাৎ, যেখানে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান রয়েছে সেখানে আর কোনো রাজা-বাদশাহ্‌র আইন মেনে চলার অবকাশ নেই। নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে হলে তা আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন ও এর মূলনীতির আলোকেই করতে হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'বিধান জারি করার

---

[১]আল কুরআন, ২ : ৩৮।

[২]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২২।

www.pathagar.com

অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র, তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না।'[১]

৩.৩. ইসলামী শরী'আহ্ বিশ্ব-মানবতাবাদী : ইসলামী শরী'আহ্ এসেছে মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য। মানুষের ঈমান-আকিদা, জান-মাল, ইজ্জত-আবরু, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি হিফাযত করা এবং সমাজ থেকে ঝগড়া, বিবাদ, জুলুম, নির্যাতন, সংঘাত-সংঘর্ষ বন্ধ করার মাধ্যমে মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করাই শরী'আহ্র মূল উদ্দেশ্য।

ইসলামী শরী'আহ্ গোটা সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত ও সমগ্র মানবজাতির জন্যে হিদায়াতস্বরূপ। যেমন, ইসলামী শরী'আহ্র উপস্থাপক মুহাম্মদ স.-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, 'আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।'[২]

৩.৪. ইসলামী শরী'আহ্ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান : ইসলামী শরী'আহ্ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানুষের যাবতীয় আচার-আচরণকে নিজের আওতাভুক্ত করেছে। এটি কেবল কতগুলো ইবাদত-বন্দেগি, আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক তথা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের বিধিবিধানের সাথে সম্পৃক্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।'[৩]

৩.৫. অপরিবর্তনীয় : ইসলামী শরী'আহ্র যে অংশ কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে বিধৃত হয়েছে তা অপরিবর্তনীয় এবং চিরস্থায়ী। স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থার আলোকে তা পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্বের মৌলিক বিধান কখনই পরিবর্তন করা যায় না। শত যুক্তি দিয়েও কোনো শাসন কর্তৃপক্ষ কখনই তা রহিত করতে পারবে না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম র. তাঁর 'ইগাছাতুল লাহফান' গ্রন্থে লিখেছেন, ইসলামী শরী'আহ্র এক ধরনের বিধান এমন যে তা সবসময় একই অবস্থায় থাকে। স্থান-কালের পরিবর্তনে তার মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসে না। ইমামগণ ইজতিহাদ করে তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার অধিকার রাখেন না। যেমন ফরয, ওয়াজিব, হারাম, শরী'আহ্র নির্ধারিত দণ্ডবিধি ইত্যাদি।

---

[১]আল কুরআন, ১২ : ৪০।
[২]আল কুরআন, ২১ : ১০৭।
[৩]আল কুরআন, ৫ : ৩।

www.pathagar.com

৩.৬. পরিবর্তনশীলতা : ইসলামী শরী'আহ্র মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ্র ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত আরো কিছু উৎস রয়েছে—যেমন ইজমা, কিয়াস, মাসলাহা, উরফ, ইসতিহ্সান ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত স্থান-কাল-পাত্র এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনযোগ্য। যেমন, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি বিধিবিধান যেগুলো মু'আমালাহ্র অন্তর্ভুক্ত সেগুলো স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়। এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালনা, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা, প্রতিরক্ষা ও সামরিক ব্যয়বহন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনগণের ওপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনে কর হার বাড়াতে পারে আবার তা মওকুফও করতে পারে। একইভাবে তাযিরের আওতাভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারক সুবিবেচনাপূর্বক লঘুদণ্ডের পরিবর্তে গুরুদণ্ড আবার গুরুদণ্ডের পরিবর্তে লঘুদণ্ড দিতে পারেন। তবে কারো ওপর যেন জুলুম না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩.৭. যুগোপযোগিতা ও গতিশীলতা : ইসলামী শরী'আহ্ যুগোপযোগী ও গতিশীল। কালের আবর্তনে উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধান ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে দেয়া সম্ভব। সমস্যা যতোই কঠিন ও আধুনিক হোক না কেনো, যতোই বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই শরী'আহ্র সমাধান রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ্তে কোনো বিষয়ের সমাধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকলে অবশ্যই তাতে একটি ব্যাপক ও সুস্পষ্ট মূলনীতি বিদ্যমান থাকবে, যার ভিত্তিতে মুজতাহিদ উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে প্রাপ্ত মূলনীতির আলোকে মানববুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করা সম্ভব।

ইসলামী শরী'আহ্তে গতিশীলতা ও নমনীয়তার সুযোগ রয়েছে বলেই তা সময়ের বিবর্তনের মোকাবেলা করতে ও সকল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। তাই বলা যায়, ইসলামী শরী'আহ্র ভিত্তি ও লক্ষ্য সুদৃঢ় হওয়ার কারণে তা কখনো অস্তিত্ব হারায় না, বিনাশও হয় না।

৩.৮. নমনীয়তা ও উদারতা : ইসলামী শরী'আহ্ চিরন্তন ও স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এতে নমনীয়তার সুযোগ রয়েছে। মানুষের জীবন যেন অচল ও স্থবির হয়ে না যায় সে জন্য এ নমনীয়তার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত স্বাভাবিক অবস্থায় হারাম কিন্তু খাদ্যাভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে জীবন বাঁচানোর তাগিদে তা খাওয়া

www.pathagar.com

যাবে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদের ওপর মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত হারাম ঘোষণা করেছেন এবং (এমনসব জন্তুও হারাম করছেন) যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবাই করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে অথচ নাফরমান বা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তবে তার কোনো পাপ হবে না।'[১] অন্য দিকে ইসলামী শরী'আহ্ একটি ব্যাপকভিত্তিক উদারতাসম্পন্ন জীবন বিধান। ইসলাম কোনো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতাকে সমর্থন করে না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক তাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাসের সুযোগ পায়। ইসলামী শরী'আহ্র উদারতা প্রসঙ্গে রাসূল করিম স. বলেন, 'আমাকে উদারতাসম্পন্ন দীন সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে।'[২]

৩.৯. সার্বজনীনতা : ইসলামী শরী'আহ্ কোনো বিশেষ শ্রেণি বা স্থানের মানুষের জন্য রচনা করা হয়নি; বরং স্থান-কাল-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল মানুষের জন্য সামঞ্জস্যশীল করে প্রণয়ন করা হয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষের পক্ষেই তা অনুশীলন করা সহজ ও সম্ভব। যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[৩]

ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, 'এ শরী'আহ্ কোনো বিশেষ মানবগোষ্ঠী বা কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে নয়; বরং শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, আরব, অনারব, প্রাচ্যের, পশ্চিমের তথা সর্বস্তরের মানুষের জন্যেই প্রদত্ত। এতে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, পক্ষপাতিত্ব, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং শ্রেণি-বৈষম্যের স্থান নেই। গোটা মানবজাতিই এর দৃষ্টিতে সমান।'[৪]

৩.১০. পালনে সহজতা এবং কঠোরতা মুক্ত : ইসলামী শরী'আহ্র আইন পালন করা খুবই সহজ। এটি পালন করতে গিয়ে কেউ যৌক্তিক সমস্যার সম্মুখীন হলে তার ওপর থেকে হুকুমের ভার হালকা ও সহজ করা যায়। যেমন, আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান এবং যা কঠিন তা তিনি চান না।'[৫]

৩.১১. সমঝোতার ব্যবস্থা : ইসলামী শরী'আহ্তে সমঝোতার বিধান রাখা হয়েছে। বিবদমান বিষয় আদালতে পেশ করার পূর্বে পক্ষগুলোর সমঝোতার

---

[১]আল কুরআন, ২ : ১৭৩।

[২]মুসনাদে আহমাদ।

[৩]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুত তায়াম্মুম।

[৪]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

[৫]আল কুরআন, ২ : ১৮৫।

www.pathagar.com

ভিত্তিতে তা মীমাংসা করার সুযোগ রয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদালতে পেশ করার পরও বিচারক বিবদমান পক্ষগুলোর মাঝে সমঝোতা করে দিতে পারেন। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার বিষয়ে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তাদের উভয়ের মধ্যে যদি বিরোধের আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে যদি নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।'[১]

৪. ইসলামী শরী'আহ্ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য

মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন, মানবসমাজের শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও শান্তি নিশ্চিত করার প্রয়াসে ইসলামী শরী'আহ্ ও প্রচলিত আইন কাজ করে থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে উৎস, ভিত্তি, মূল্যবোধসহ নানা বিষয়ে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। এখানে কয়েকটি পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

ইসলামী শরী'আহ্	প্রচলিত আইন
১. ইসলামী শরী'আহ্র প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং এর আলোকে ইজতিহাদভিত্তিক উৎসসমূহ।	প্রচলিত বা মানবরচিত আইনের সাথে অহিভিত্তিক উৎসের কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। এটি রাজা-বাদশাহ্, আইন, গণভোট, প্রথা ইত্যাদি দ্বারা প্রণীত।
২.ইসলামী শরী'আহ্ প্রণয়ন করেছেন প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্। তাই এটি সকল ধরনের দুর্বলতা, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতামুক্ত।	মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয় বলে প্রচলিত আইনে সকল ধরনের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা রয়েছে।
৩.ইসলামী শরী'আহ্তে জাগতিক জবাবদিহির পাশাপাশি পরকালের জবাবদিহির বিষয়টিও স্বীকার করা হয়। এ আইনে বিশ্বাসী সকলেই মনে করে আইন মেনে চললে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে পুরস্কৃত হবে।	প্রচলিত আইনে পরকালীন জবাব-দিহির স্বীকৃতি নেই।
৪.ইসলামী শরী'আহ্ মানুষকে	প্রচলিত আইনে নৈতিক মূল্যবোধের

[১]আল কুরআন, ৪ : ৩৫।

www.pathagar.com

নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে।	ওপর ততটা গুরুত্ব দেয়া হয় না।
৫.ইসলামী শরী'আহ্‌তে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়।	প্রচলিত আইনে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয় না।
৬.আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতসংক্রান্ত বিধানসমূহও ইসলামী শরী'আহ্‌র অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ।	প্রচলিত আইনে এসব বিধানকে আইনের অঙ্গ হিসেবে মনে করা হয় না।
৭.নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান শর্তহীন নন। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তিনি শরী'আহ্ পরিপন্থি আইন প্রণয়ন করতে পারেন না।	মানবরচিত আইনে রাষ্ট্রপ্রধান আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শর্তহীন। এক্ষেত্রে সংসদ, সিনেট যেমন ইচ্ছা আইন প্রণয়ন করতে পারে।
৮.ইসলামী শরী'আহ্‌র মৌলিক আইন চিরন্তন ও পরিবর্তনযোগ্য নয়।	মানবরচিত আইনের সকল অংশই পরিবর্তনযোগ্য।
৯. শরী'আহ্ আইনে রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকশ্রেণির স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ নেই।	মানবরচিত আইনে রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকশ্রেণির স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ বেশি।
১০. শরী'আহ্ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবতার সংশোধন; প্রতিশোধপরায়ণতা কিংবা প্রতিহিংসা নয়।	মানবরচিত আইনে প্রতিহিংসা-পরায়ণতার সুযোগ বেশি। এখানে দুর্বলদের প্রতি সবলদের শাসন ও শোষণ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

৫. আধুনিক আইনি প্রয়োজন পূরণে ইসলামী শরী'আহ্‌র সক্ষমতা

আল কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিধান চিরন্তন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্‌র নতুন বিধান রচনার সক্ষমতা রয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ্ জড়তা ও বন্ধ্যাত্বমুক্ত। এতে সর্বকালের ও সর্বস্থানের সকল মানুষের সব সমস্যা সমাধানের উপায় রয়েছে। পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনে উদ্ভাবিত নতুন নতুন বিষয় ও সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ইজতিহাদভিত্তিক নতুন আইন প্রণয়ন করা যায়।

ইসলামী শরী'আহ্ এতোটাই বাস্তবসম্মত যে, বিবর্তনের মোকাবেলা করতে ও বিভিন্ন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম এবং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারঙ্গম। ইসলামী শরী'আহ্‌র ভিত্তি ও লক্ষ্য সুদৃঢ় ও

www.pathagar.com

শক্ত হওয়ার কারণে কখনো এর অস্তিত্ব হারায় না, বিনাশও হয় না এবং যে কোনো পরিবর্তনের সামনে মাথা নত করে না।

ইসলামী শরী'আহ্ সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে প্রদত্ত। অতএব সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিকতা শরী'আহ্র আদেশ-নিষেধ দ্বারা পরিচালিত হবে। শরী'আহ্ সর্বদা সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকবে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ এর সামনে সম্পূর্ণ অসহায়; বরং এতে মানুষের ইজতিহাদ বা গবেষণার বিরাট সুযোগ রয়েছে। কুরআন-হাদিস বুঝে তা থেকে বিধি-বিধান অর্জন করার ব্যাপারে ইজতিহাদের বিরাট সুযোগ আছে।[১]

ইসলামী শরী'আহ্র গভীরতা সম্পর্কে যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখেন না তারা প্রায়শ শরী'আহ্র প্রতি কটাক্ষ করে বলে থাকেন যে, আধুনিক পৃথিবীর বিচিত্র, জটিল ও ক্রমপ্রসারমাণ বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনধারার সাথে তা খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম নয়।

প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার উৎকর্ষ ও অগ্রগতি সাধনে ইসলামী শরী'আহ্ ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে। বস্তুত ইসলামী শরী'আহ্ মানুষের বিশ্বাসের রক্ষাকবচ, পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের নির্ধারক, সুষ্ঠু ও সংঘবদ্ধ সমাজ গঠনের মাধ্যম, শোষণ-জুলুম প্রতিরোধের হাতিয়ার এবং সার্বজনীন কল্যাণের উৎস।

ইসলামী শরী'আহ্ মানবজাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে এবং ধ্বংস, স্বার্থপরতা, ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করে। এটা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত সত্য।

ইসলামী শরী'আহ্তে এমনসব চিরন্তন ও মৌলিক উপাদান রয়েছে, যা সকল যুগে ও সকল সমাজের আইনি চাহিদা পূরণে সক্ষম। এতে কোনো অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা নেই, তাই তা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে মানবজাতির জন্য সঙ্গতিপূর্ণ। ইতিহাস প্রমাণ করে, মহানবী স. ও খিলাফতে রাশেদার পর উমাইয়া, আব্বাসি, উসমানি, সুলতানি ও মুঘল শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে ইসলামী শরী'আহ্ আইন দ্বারা। ইউরোপের স্পেনীয় জনগণ দীর্ঘ আটশত বছর এই শরী'আহ্ আইন দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। আরো জোর দিয়ে বলা যায়, 'উপমহাদেশে বৃটিশ আইন-কাঠামো গড়ে তোলার ভিত্তি ছিল ইসলামী আইন, যদিও বাস্তবে তা স্বীকার করা হয় না।'[২]

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

[২২]লেখকমণ্ডলী, ফিকহে হানাফির ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৬৭৬।

www.pathagar.com

ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, ইসলামী শরী'আহ্ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত যেসব সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করেছিল সেসব সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। যেসব পরিবেশে ইসলামী শরী'আহ্ প্রবেশ করেছিল সেসব পরিবেশের সমস্যাগুলো সংখ্যায় অধিক ও প্রকৃতিতে বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শরী'আহ্ তার শাশ্বত বিধানের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ, এতে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব বিদ্যমান যা ইতঃপূর্বে ও পরের কোনো আইন ব্যবস্থায় নেই।

তিনি আরো বলেন, ইসলামী শরী'আহ্ভিত্তিক আইন টিকে আছে চৌদ্দশ' বছর ধরে। ইতোমধ্যে এ আইন উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ শাসন করেছে, শহরে-গ্রামে, পাহাড়ে-পর্বতে বসবাসকারী মানুষকে জীবন চলার পথ দেখিয়েছে। বিভিন্ন আচার-আচরণ ও অভ্যাসের সাক্ষাৎলাভ করেছে। বিভিন্ন পরিবেশে বিরাজ করেছে। সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে টিকে রয়েছে। এসব অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করেছে। ফলে তার এমন এক বিশাল আইনের ভাণ্ডার তৈরী হয়েছে যার তুলনা ও নজির খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সুতরাং সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায় একমাত্র এতেই পেতে পারে তাদের যাবতীয় সমস্যার সমগ্র সমাধান।[১]

আধুনিক পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে ইসলামী শরী'আহ্ যে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম তার একটি বড় প্রমাণ হলো ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর সফলতা। বর্তমান বিশ্বে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকলের কাছেই ইসলামী ব্যাংকিং টেকসই ও শ্রেষ্ঠ ব্যাংকব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হচ্ছে এবং অমুসলিমগণও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছেন। বিগত অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পুঁজিবাদী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলেও ইসলামী শরী'আহ্ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানও পদ্ধতিগত দুর্বলতার কারণে এ সমস্যায় আক্রান্ত হয়নি।

আধুনিক পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে ইসলামী অর্থনীতি শুধু খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষমই নয়; বরং প্রচলিত সকল অর্থনৈতিক মতবাদের চেয়ে সফলভাবে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদগুলো মূলত তত্ত্বসর্বস্ব ব্যবস্থা যার অধিকাংশ বিষয়ের সাথে বাস্তব কর্মের সামঞ্জস্য নেই। এ কথা বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবিদ বারবারা উটন অকপটে স্বীকার করে তাঁর 'Lament for Economics' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমরা আমাদের মূল্যবান সময়ের অধিকাংশই কেবল মতবাদের অস্ত্র তৈরি করার কাজে ব্যয় করছি। অথচ

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

www.pathagar.com

বাস্তব কর্মজীবনে এর প্রয়োগ মাত্রই হয় না।... বর্তমানে মানুষ যে অর্থবিজ্ঞানের অনুশীলন করছে, তা হতে সমাজের কোনো কল্যাণ হয় না। আর তা সাধারণ মানুষের বোধগম্যও নয়।'[১] আবার অধ্যাপক জোড বলেছেন, 'বর্তমান যুগের বিজয়ী দর্শন হচ্ছে পেট। পেট বা পকেটের দৃষ্টিতেই এ যুগের সব কিছুর বিচার ও যাচাই করা হয়।[২] অন্য দিকে শুধু পেটের দাবি পূরণ করা কিংবা জঠরজ্বালা নিবৃত্ত করাই ইসলামী অর্থনীতির কাজ নয়। বরং এটি মানুষের বৈষয়িক ও নৈতিক দিকসহ সকল সমস্যার সমাধানের দিকে নজর দিয়ে থাকে।

মানবরচিত সকল প্রকার আইন প্রণীত হওয়ার বহু বছর পূর্ব থেকেই ইসলামী আইন নির্ধারিত হয়েছে। মানবপ্রকৃতির যাবতীয় বিষয় বিবেচনায় রেখে জীবনের সকল বিষয় ও দিকের সহজ-সুন্দর দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামী শরী'আহ্ভিত্তিক আইনব্যবস্থায়। একটি সুন্দর পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা বিনির্মাণের যাবতীয় বিধান ও উপায়-উপকরণ রয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলামে।

ইসলামী আইনের স্থায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিয়ে সিরিয়ার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ প্রফেসর ফারেস আল খাওরি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, বিদেশ থেকে আগত নানান থিউরি ও মতবাদে বিশ্বাসীদের শক্তি যাই থাকুক না কেন ইসলাম তাদের সকলের মোকাবেলা করার শক্তি রাখে। আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি, কমিউনিজম ও সোসালিজমের সঠিক মোকাবেলা করা একমাত্র ইসলাম দ্বারাই সম্ভব। একমাত্র ইসলামই এসব মতবাদ নিশ্চিহ্ন ও খতম করে দিতে পারে।'[৩]

৬. আইনের আধুনিক তত্ত্বসমূহের আগেই ইসলামী শরী'আহ্র জন্ম

আইনের যেসব তত্ত্ব, মূলনীতি ও দর্শন নিয়ে আধুনিক যুগ গর্ববোধ ও অহঙ্কার করে থাকে ইসলামী শরী'আহ্তে সে সবের ভিত্তি অনেক আগেই স্থাপিত হয়েছে। এটি ইসলামী শরী'আহ্র চিরন্তনতা, সার্বজনীনতা ও শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন আইনব্যবস্থা মাত্র সোয়া শতাব্দীর সৃষ্ট। অর্থাৎ পার্থিব বিষয় থেকে ধর্মীয় বিষয়কে আলাদা করার মাধ্যমে এ আইনের জন্ম হয়। আর রাশিয়ার আইন মাত্র অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সৃষ্ট। রুশ-কমিউনিজমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পর। অথচ ইসলামী শরী'আহ্ মানুষের প্রয়োজনীয় হাজারো বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে এসব আইনের জন্মের বহু পূর্বে।

---

[১]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ৬।
[২]প্রাগুক্ত।
[৩]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

www.pathagar.com

৬.১. সমতা তত্ত্ব : আইনের আধুনিক মতবাদসমূহের মধ্যে রয়েছে সাম্যসংক্রান্ত মতবাদ। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মানবরচিত আইনে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তা সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন শুরু হয়। কিন্তু ইসলামী শরী'আহ্র সূচনালগ্নেই কুরআন-সুন্নাহ্তে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় এবং কোনোরূপ শর্ত ও ব্যতিক্রম ছাড়াই তা বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

৬.২. স্বাধীনতা তত্ত্ব : আইনের আধুনিক মতবাদের মধ্যে আরো রয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনীতির স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়। এ বিষয়গুলো ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। প্রত্যেক মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে বহু ঘোষণা কুরআন-সুন্নাহ্তে বর্ণিত রয়েছে।

৬.৩. শাসকের জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতার বিধান : সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের জবাবদিহির বিষয়টি বর্তমানে ব্যাপকভাবে আলোচিত একটি বিষয়। এ বিষয়ে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। রাষ্ট্রপ্রধানকে তার কার্যাবলির জন্য যেমন আখিরাতে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে তেমনি তাকে জনগণের নিকটও জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট জনগণ কর্তৃক অর্পিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত। এ আমানতের খেয়ানত করলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ-

অর্থাৎ, 'সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।'[১] এই জবাবদিহির ব্যাপারে চিন্তিত হয়েই উমর রা. বলেছিলেন, 'ফোরাত নদীর তীরে একটি বকরিও যদি অযত্নে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে এর জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'[২]

শুরা বা পরামর্শ গ্রহণসংক্রান্ত তত্ত্বটি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রের আইনবিশারদগণের কাছে আলোচিত হয়। অথচ এর

---

[১]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারাহ্, বাবু মা ইয়ালযিমুল ইমামু মিন হাক্কির রাইয়্যাহ্।

[২]حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم। আরো দেখুন : ইসলামী আইন ও আইনবিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১, পৃ. ২৩৫।

www.pathagar.com

এগারশ' বছর আগেই এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়- وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ — 'এবং কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।'[১]

৬.৪. শাসকের সীমিত ক্ষমতা তত্ত্ব : আধুনিক আইনের একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ হলো শাসকের ক্ষমতা সীমিতকরণ। এ তত্ত্বে বলা হয় : শাসকের ক্ষমতা সীমিত থাকবে, তার ভুল, সীমালঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য তাকে দায়ী করা যাবে এবং জনগণ প্রয়োজনে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, ইসলামী শরী'আহ্ই সর্বপ্রথম শাসকের ক্ষমতা সীমিতকরণ তত্ত্বের অনুমোদন করে এবং জনগণকে অধিকার প্রদান করে যে, তারা শাসকের সীমালঙ্ঘনের কারণে তার ওপর থেকে আনুগত্য পরিহার করতে পারবে।

৬.৫. পারিবারিক শৃঙ্খলা তত্ত্ব : পারিবারিক শৃঙ্খলার ব্যাপারটি ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শুরু থেকেই এটিকে আবশ্যকীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। অথচ মাত্র ১৯৬৮ সালে ইতালির লাহাই শহরে আন্ত র্জাতিক আইনের ওপর অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের আইনগত স্বীকৃতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।[২]

৬.৬. সুদমুক্ত অর্থনীতি তত্ত্ব : একসময় মানুষের ধারণা ছিল সুদ ছাড়া অর্থনীতির চাকা চলতে পারে না। কিন্তু পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের কতক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের নামেই সুদের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। তারা বললেন যে, সুদ উৎখাত না হলে সমাজের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। অথচ ইসলাম পনেরশ' বছর আগেই সুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৬.৭. দারিদ্র্য বিমোচন তত্ত্ব : দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বহু আগেই আল কুরআন-সুন্নাহ্‌র বহু স্থানে দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের একটি চিরন্তন কৌশল হলো ইসলামের যাকাত বিধান।

যাকাতের মাহাত্ম্য না বুঝেই অনেক মুসলিম নামধারী এটিকে নানাভাবে গালমন্দ করে থাকে। অথচ পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে এমন প্রচুর লেখক রয়েছেন যারা যাকাতব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মানুষের কল্যাণে এরূপ একটি ব্যবস্থা যে ইসলামই সর্বাগ্রে করেছে তাও তারা অকপটে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিল দিউরান্টের বক্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি তার 'সভ্যতার গল্প'

---

[১]আল কুরআন, ৩ : ১৫৯।

[২]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

www.pathagar.com

নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমরা মানবজাতির গোটা ইতিহাসে মুহাম্মদের ন্যায় অন্য কোনো সংস্কারককে ফকিরের সাহায্যার্থে ধনীদের ওপর এতো বেশি ট্যাক্স ধার্য করতে আর দেখিনি। তিনি সব মানুষকেই তাদের সম্পদের একটি অংশ ফকিরদের জন্যে ধার্য করতে আদেশ করতেন।'[১]

বিখ্যাত পণ্ডিত লিউড্রোশ বলেন, যে দুটো কঠিন সামাজিক সমস্যা গোটা বিশ্বকে জর্জরিত করে তুলেছে, তার সমাধান আমি ইসলামে পেয়েছি। প্রথমত আল্লাহ্‌র ঘোষণা 'সব মু'মিন ভাই ভাই'। সামাজিক মৌল বিধানের সংক্ষিপ্ত ঘোষণা এটা। আর দ্বিতীয়ত প্রত্যেক মালদারের ওপর যাকাত ফরয করা, এমনকি গরিবদেরকে তাদের প্রাপ্য জোরপূর্বক নিয়ে নেয়ার সুযোগ দান—যদি ধনীরা তা দিতে ইচ্ছুক না হয়। এটাই প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠার পন্থা।[২]

৭. আধুনিক আইনের মূলনীতি ও ইসলামী শরী'আহ্

আধুনিক যুগের কর আইন, চুক্তি আইন, ক্রয়-বিক্রয় আইন, সাক্ষ্য আইন, ভূমি আইন, অংশীদারি আইনসহ অসংখ্য আইনের মূলনীতি ইসলামী শরী'আহ্তে রয়েছে। এখানে কর আইনের মূলনীতি ও ইসলামী শরী'আহ্র সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

'কর আইনের মূলনীতি'-কে আধুনিক যুগের আবিষ্কার বলে দাবি করা হয়। এ নীতির মূলকথা হলো কর আরোপের ক্ষেত্রে সাম্য, সুবিচার, ন্যায়পরতা, দৃঢ় প্রত্যয় ও মধ্যম নীতি অবলম্বন করা। এগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথের উদ্ভাবন বলে দাবি করা হয়। তার জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিগুলোর প্রতি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ রেখেছে। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ধনশালী হবার ন্যূনতম সীমা, কষ্টের তারতম্যের বিচার, বাস্তবায়নের সুবিচার ইত্যাদির ওপর দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেবল যাকাতদাতার প্রত্যক্ষ সম্পদের ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং তার ব্যক্তিগত অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। যাকাতদাতার যাবতীয় জরুরি খরচ ও দায়-দায়িত্ব যাকাতের আওতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে যাকে জীবনযাপনের ন্যূনতম সীমা বলা যেতে পারে। এ ছাড়া যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম এতোটাই যুক্তিসঙ্গত ও সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করে যাতে যাকাতদাতা কোনোরূপ জোরজবরদস্তি ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পরিশোধ করতে আগ্রহী হয়।

---

[১] ড. ইউসুফ আল কারযাভি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

[২] ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামের যাকাত বিধান (ফিকহুয যাকাত), অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৬৯৯।

www.pathagar.com

৮. ইসলামী শরী'আহ্র শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি

মিসরের আইন কলেজের প্রফেসর ড. আলী বাদাবি ইউরোপীয় আইনের প্রথম উৎস রোমান আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে তুলনা করার পর বলেন, ইসলামী আইন অন্যান্য পুরাতন ও আধুনিক আইনের ওপর নানান দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তিনি বলেন, ইসলামী শরী'আহ্র 'তাযিরি' (ইসলামী শরী'আহ্তে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত নয়, সেইসব অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তিকে তাযির বলা হয়) শাস্তিদানের ব্যবস্থা একটি ব্যতিক্রমি দৃষ্টান্ত। 'শাস্তির পরিমাণ ও প্রকার নির্ধারণের দায়িত্ব বিচারকের ওপর ছেড়ে দেয়া, যাতে বিচারক অপরাধের অবস্থা, অপরাধীর মানসিকতা, অপরাধের প্রতি তার ঝোঁকপ্রবণতা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। এ ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামী ফিকহ্তেই বিদ্যমান। আধুনিক অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি তুলেছেন, যাতে আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিশীল শাস্তিদান সম্ভবপর হয়। এ কারণেই চূড়ান্তভাবে বলা যায়, ইসলামী শরী'আহ্ শাস্তিদানের এমনসব বুনিয়াদি ব্যবস্থা ও নীতিমালা সংবলিত যা প্রশস্ততা ও সুচিন্তার দিক দিয়ে মানবরচিত আইনের সর্বাধুনিক বুনিয়াদি ব্যবস্থা ও নীতিমালার চেয়ে কিছুতেই কম নয়। ইসলামী শরী'আহ্তে এমন নীতিমালাও বিদ্যমান রোমান শাস্তিবিধানে যার আদৌ কোনো নজির নেই।'[১]

ইসলামী শরী'আহ্র আইন স্বাধীনভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং অন্য কোনো আইন থেকে এর মূলনীতিতে কোনো কিছু গৃহীত হয়নি; বরং অন্যান্য আইন এ থেকে বহু নীতিমালা ও দর্শন গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ ইতিহাসবিদ ওয়েল্জ বলেন, 'ইউরোপ তার প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক আইনের জন্যে ইসলামের কাছে ঋণী।' একইভাবে ফরাসি ইতিহাসবিদ সিদিউ বলেন, 'নেপোলিয়ান' মালিকি মাযহাবের গ্রন্থ 'খলিল'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আদ-দারদি'র অনুকরণে আইন প্রণয়ন করে ছিলেন।[২]

ইসলামী শরী'আহ্র শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুধু মুসলিম নয়, বরং অমুসলিম পণ্ডিতগণও তা অকপটে স্বীকার করেছেন। জার্মান আইনজ্ঞ কুহ্লার, ইতালির প্রফেসর দিলফিশিও, আমেরিকার বুদ্ধিজীবী ওয়িকমারসহ অনেকেই ইসলামী শরী'আহ্র অন্তর্নিহিত নম্রতা ও উন্নতি-অগ্রগতির পাশাপাশি চলার ক্ষমতার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং যে তিনটি আইন দুনিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে তার একটি হিসেবে তারা ইসলামী

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

www.pathagar.com

আইনকেও রোমান ও ইংরেজ আইনের পাশাপাশি রেখেছেন। বর্তমান যুগে ইউরোপ-আমেরিকার আইনজ্ঞদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব প্রখ্যাত ফরাসি আইনজ্ঞ প্রফেসর লামবির ১৯৩২ সালে লাহাই শহরে আন্তর্জাতিক আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ইসলামী শরী'আহ্র ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ইসলামী শরী'আহ্র এমনসব উপাদান রয়েছে যা সুন্দরভাবে সাজানো হলে এমনসব থিউরি ও ধারা পাওয়া যাবে যা উন্নতি, ব্যাপ্তি ও বিবর্তনের পাশাপাশি চলতে পাশ্চাত্যের আধুনিক আইনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ থিউরির চেয়ে কিছুতেই কম হবে না।[১]

ড. আয়েযকো ইনসাবাতু বলেন, 'ইসলামী শরী'আহ্ অনেক দিক দিয়ে ইউরোপীয় আইনের ওপর প্রাধান্য রাখে। এমনকি ইসলামী শরী'আহ্ই বিশ্বকে দিতে পারে সর্বাধিক শক্তিশালী আইনব্যবস্থা।'[২]

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর শিবরল ১৯২৭ সালে এক আইন সম্মেলনে বলেন, 'মানবজাতি মুহাম্মদ স.-কে নিয়ে গর্ব করতে পারে, কারণ তিনি উম্মি হওয়া সত্ত্বেও চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এমন এক আইনব্যবস্থা উপহার দিয়েছেন আমরা ইউরোপবাসীরা দু' হাজার বছর পরও যদি সেখানে পৌঁছতে পারি তাহলে অতি সৌভাগ্যবান হতে পারতাম।'[৩]

বিখ্যাত পণ্ডিত বিল দিউরান্ট ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলাম সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ' বছর শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়, রাজ্য শাসনে ও মানুষের জীবনমানোন্নয়নে মানবতাবাদী ও কল্যাণকামী বিধিবিধান প্রণয়নে এবং ধর্মীয় সহনশীলতা, সাহিত্য, শিল্পকলা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শনে গোটা দুনিয়ার ওপর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল। [৪]

জর্জ বার্নাড শ' বলেছেন, 'মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে আমি সবসময়ই অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করি। কারণ, এর মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্যকর জীবনীশক্তি। আমার মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম, যা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং যার রয়েছে সর্বযুগোপযোগী আবেদন।'[৫]

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩।

[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

[৩]প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

[৪]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

[৫]জর্জ বার্নাড শ', দি জেনুইন ইসলাম, সিঙ্গাপুর। উদ্ধৃত : খুরশিদ আহমদ, ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মৌল নীতিসমূহ, ইসলামের আহ্বান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

www.pathagar.com

যেসব মুসলিম ইসলামী শরী'আহ্র বিরুদ্ধে কথা বলেন তাদের সমালোচনা করে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর মুহাম্মদ মুবারক বলেন, 'সত্যই আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু কিছু মুসলিম নামধারী লোক ইসলামকে নিয়ে প্রহসন করে। তারা ইসলামকে বাস্তব জীবন হতে হটিয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করে, অন্য দিকে বড় বড় খৃস্টান পণ্ডিত ইসলামী বিধান গ্রহণ করার এবং ইসলামী শরী'আহ্ মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন।'[১]

৯. ইসলাম ও সার্বজনীন মানবাধিকার

আধুনিক যুগে মানবাধিকারের বিকাশ সূচিত হয় ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সে। ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ সালে প্রণীত হয় মানবাধিকার দলিল 'বিল অব রাইটস'। আমেরিকায় ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ফ্রান্সে ১৯৮৯ সালে দেশের সংবিধানে মানবাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করে। কিন্তু এ বিষয়ে ইসলামের ঘোষণা এসেছে চৌদ্দশ' বছর আগেই। অধিকন্তু মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি মানবরচিত মূলনীতির চেয়ে মহত্ত্ব, সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতা ও বাস্তবতায় শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। ১৯৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ইসলামী পরিষদ 'আল মু'তামার আল আ'লামিল ইসলামী' মানবাধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ধারা-উপধারাসমূহ পর্যালোচনা করে মানবাধিকারের একটি ঘোষণা প্রদান করে। ১৯৯০ সালে ওআইসি ফিকাহ একাডেমি একটি মানবাধিকার দলিল তৈরি করে। এ দলিলে ২৫টি ধারায় কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে মানবাধিকার ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের ৩০টি ধারার প্রত্যেকটির অনুরূপ কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাটি অনেক দিক থেকেই অসম্পূর্ণ। কেননা, এই ঘোষণায় শুধু রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের কি অধিকার তা বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষে মানুষে কি অধিকার সে সম্পর্কে তেমন কিছু বলা নেই। শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়েছে যে, নাগরিকগণ পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের ভাবধারাপূর্ণ আচরণ করবে। কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের অধিকারের পরিধির তুলনায় মানুষের সাথে অন্য মানুষের অধিকারের পরিধি বিস্তৃত। একইভাবে উক্ত ঘোষণায় শুধু অধিকারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কর্তব্যের কথা বলা হয়নি। আবার অধিকারের বিষয়টিও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে শুধু স্বাধীনতা, সাম্য, শান্তি, নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ধর্ম পালনের মতো গুটিকয়েক বিষয়ের মধ্যে।

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

www.pathagar.com

ইসলামের মানবাধিকারের বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত। সেখানে শুধু মানুষে মানুষে কিংবা রাষ্ট্রে ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কিত অধিকারের কথা বলা হয়নি; বরং সেখানে মানুষে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রে মানুষে, মানুষে পশুতে, মানুষে উদ্ভিদে, মানুষে প্রস্তরের মধ্যে কি অধিকার ও কর্তব্য তাও বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। বলা যায়, ইসলামে মানবাধিকারে পরিধি মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করেছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারের তুলনায় ইসলামে মানবাধিকারের বিষয়টি অনেক বড় এবং পূর্ণাঙ্গ। এখানে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রধান প্রধান ধারার পাশাপাশি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য যে, এখানে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ্‌র উদ্ধৃতি পেশ করা হয়নি; বরং শুধু এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামী শরী'আহ্‌রও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

৯.১. মানুষের মান-মর্যাদা ও সমতার অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা[১]

ধারা-১ : সকল মানুষই মুক্তাবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং মর্যাদা ও অধিকারে সমান থাকে।

ধারা-২ : প্রজাতি, গায়ের রঙ, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয় সামাজিক উৎপত্তি, সম্পদ, জন্মগত বা অন্যান্য অবস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেকের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৪: কাউকে দাসত্ব কিংবা নির্দয়, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর ব্যবহার বা শাস্তির শিকারে পরিণত করা যাবে না।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'তোমরা একে অপরের সমান।' [৪ : ২৫]

'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন পুরুষদের আছে তাদের ওপর।' [২ : ২২৮]

'প্রত্যেকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুপাতে মর্যাদা রয়েছে।' [৪৬ :১৯]

'কোনো অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোনো আরবের ওপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব। কোনো কালোর ওপর কোনো সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোনো সাদার ওপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব, তবে তাক্বওয়া ছাড়া।'[১]

---

[১]মিয়া মুহম্মদ সেলিম ও ড. লুৎফর রহমান, মানবাধিকার-সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ, নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১০, পৃ. ১১৫-১১৮।

www.pathagar.com

'আমরা তাদের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।' [২ : ১৩৬]

'আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি।' [৪৯ : ১৩]

'যে ব্যক্তি অপর কোনো লোকের মানহানি করে অথবা অন্য কোনো প্রকার জুলুম করে তবে সেদিন আসার পূর্বেই তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত- যেদিন তার না থাকবে কোনো ধন-সম্পদ, আর না থাকবে অন্য কিছু।'[২]

'কোনো ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে অপমানিত, লাঞ্ছিত অথবা সম্মানহানি হতে দেখেও যদি তার সাহায্য না করে তাহলে আল্লাহ্ এমন জায়গায় তার সাহায্য ত্যাগ করবেন যেখানে সে নিজে আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী হবে।'[৩]

'প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের (সত্য ধর্ম বা স্বাধীনতার) ওপর জন্মগ্রহণ করে।'[৪]

উমর রা. বলেন : 'তোমরা কখন মানুষকে পরাধীন করলে? অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন অবস্থায় প্রসব করেছিল।'[৫]

৯.২. জীবনের ও নিরাপত্তার অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা

ধারা-৩: প্রত্যেকের বাঁচার স্বাধীনতা ও নিরাপদে থাকার অধিকার রয়েছে।

ধারা-৫: কাউকে নিপীড়ন কিংবা নির্দয়, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর ব্যবহার বা শাস্তির শিকারে পরিণত করা যাবে না।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।' [১৭ : ৩৩]

'মানুষ হত্যা অথবা পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টির কারণ ছাড়াই কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল; আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।' [৫ : ৩২]

'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের মধ্যে ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমন তোমাদের আজকের এই দিন এই মাস এই শহর পবিত্র।'[১]

---

[১]ইমাম তাবারানি, মু'জামুল কাবির, চতুর্থ অধ্যায়।

[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল মাজালিমি ওয়াল গাসবি, বাবু মান কানাত লাহু মাজলামাহ...।

[৩]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবুররাজুলি ইয়াজুব্বু আন ইরজি আখিহি।

[৪]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি জারারিয়্যিল মুশরিকিন।

[৫]আলি আল-তানতাবি ও নাজি আল-তানতাবি, আখবারু উমর, ১৯৫৯, পৃ. ২৬৮।

www.pathagar.com

'কিয়ামাতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে।'[২]

'যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিমকে হত্যা করল সে কখনো জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।'[৩]

'এবং তোমরা যখন আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক নিষ্ঠুরভাবে।' [২৬ : ১৩০]

'বিনা কারণে কোনো মুসলমানকে মারলে আল্লাহ্ তার ওপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন।'[৪]

'আমি আমার নিজের ওপর ও বান্দাহ্দের ওপর অত্যাচারকে হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পরকে অত্যাচার করো না।'[৫]

'নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতম দায়িত্বশীল হচ্ছে অত্যাচারী শাসক।'[৬]

৯.৩. ন্যায়বিচারের অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা

ধারা-৬: আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেরই যে কোনো স্থানেই একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৭: আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই আইনগত নিরাপত্তা লাভের সমান অধিকারী।

ধারা-৯: কাউকেই বিধিবহির্ভূতভাবে গ্রেফতার, আটক কিংবা দেশ ত্যাগ করানো যাবে না।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার কায়েম করতে পারে।' [৫৭ : ২৫]

'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা করবে।' [৪ : ৫৮]

'মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।'[১]

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, বাবু হাজ্জাতিল বিদায়ি ও ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক।

[২]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাসামাহ্ ওয়াল মুহারিবিন ওয়াল কিসাস ওয়াদদিয়াত, বাবুল মুজাযাতি বিদ্দিমায়ি ফিল আখিরাতি...।

[৩]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল জিযইয়াহ ওয়াল মুওয়াদাআহ, বাবু ইসমি মান কাতালা মুআহাদা বিগাইরি জুরমি।

[৪]তাবারানি।

[৫]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস্ সিলাহ্ ওয়াল আদাব, বাবু তাহরিমিয যুল্‌ম।

[৬]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, বাবু ফাযিলাতিল ইমামিল আদিলি ওয়া উকুবাতি...।

www.pathagar.com

'একবার রাসূলুল্লাহ্ স. মসজিদে নববীতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার প্রতিবেশীকে কোন্ অপরাধে বন্দি করা হয়েছে? তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনি ভাষণ দিতেই থাকেন। লোকটি এবারও একই প্রশ্ন করল। এবারও তিনি উত্তর দিলেন না। লোকটি তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ্ স. নির্দেশ দিলেন, তার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও।'[২]

৯.৪. ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা

ধারা-১২: বিধি বহির্ভূতভাবে কারো ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা ঘরের বিষয়ে বা চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ করা যাবে না কিংবা তার সুনাম বা সম্মানে আঘাত করা যাবে না।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'তোমরা নিজেদের বাড়ি ব্যতীত অন্যের বাড়িতে বাড়ির মালিকের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।' [২৪ : ২৭]

'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবীগৃহে প্রবেশ করো না।' [৩৩ : ৫৩]

'হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে।' [২৪ : ৫৮]

'দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।' [১০৪ : ০১]

৯.৫. আশ্রয় লাভের অধিকার

জতিসংঘ ঘোষণা

ধারা-১৩: প্রত্যেক দেশের মধ্যে চলাচল ও বসতির অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। প্রত্যেকেরই নিজদেশসহ কোনো দেশত্যাগ এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'কেউ আল্লাহ্র পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে।' [৪ : ১০০]

'আল্লাহ্র যমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে?' [৪ : ৯৭]

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল হুদুদ, বাবু ইকামাতিল হুদুদি আলাশ শারিফি ওয়াল অদি'ঈ ও আবু দাউদ।
[২]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল ক্বাদা, বাবু ফিদ্দাইনি হাল ইয়ুহবাসু বিহি।

www.pathagar.com

'যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।' [৩ : ৯৭]

'স্মরণ করো, যখন আমি কা'বাঘরকে মানবজাতির জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান বানালাম।' [২ ; ১২৫]

'কোনো মুশরিক তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ পর্যন্ত আশ্রয় দাও, তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও।' [৯ : ৬]

৯.৬. বিবাহ্ ও তালাকের অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা

ধারা-১৬: প্রজাতি, জাতি ও ধর্মের সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর বিবাহ্ করার ও পরিবার গঠন করার অধিকার রয়েছে। বিবাহ্ পূর্বে, বিবাহকালে ও বিবাহ্ বিচ্ছেদের ব্যাপারে তাদের অধিকার সমান সমান। বিবাহে ইচ্ছুক বর-কনের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিতেই শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন।' [২৫ : ৫৪]

'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।' [৩০ : ২১]

'তাদের উভয়ের মধ্যে যদি বিরোধের আশঙ্কা দেখা দেয়, তা হলে তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে যদি নিস্পত্তি চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।' [৪ :৩৫]

'আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে ভরণ-পোষণ দেয়া মুত্তাকিদের কর্তব্য।' [২ : ২৪১]

৯.৭. সম্পদ লাভের অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা

ধারা-১৭: প্রত্যেকেরই একক কিংবা অন্যদের সাথে সম্পত্তির মালিকানার অধিকার রয়েছে। কাউকেই বিধি-বহির্ভূতভাবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে। অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়ে যায়!' [৩৬ : ৭১]

www.pathagar.com

'পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।' [৪ : ৩২]

'তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে খেয়ো না।' [৪ : ২৯]

'এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে।' [৫৯ : ৮]

৯.৮. ধর্ম, চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা

ধারা-১৮: প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে অধিকার রয়েছে।

ধারা-১৯: প্রত্যেকেই মতামত ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী। এ অধিকারের মধ্যে রয়েছে কোনো রকমের হস্তক্ষেপ ছাড়াই মতামত ধারণের স্বাধীনতা এবং যে কোনো মাধ্যমে তথ্য ও ভাবনা চাওয়া-পাওয়া ও প্রদানের স্বাধীনতা- যার কোনো সীমানা থাকবে না।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'দীন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে।' [২ : ২৫৬]

'তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, আর আমার জন্য আমার দীন।' [১০৯ : ৬]

'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে; সুতরাং যার ইচ্ছে বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' [১৮ : ২৯]

'লোকদের সঙ্গে সুন্দর কথা বলবে।' [২ : ৮৩]

'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা শ্রেষ্ঠ জিহাদ।'[১]

'মুসলমানরা যা উত্তম বলে মনে করে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও তা উত্তম।'[২]

৯.৯. শ্রমিকের অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা

ধারা-২৩: প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকরি বাছাই করার, কর্মক্ষেত্রে সঙ্গত ও অনুকূল পরিবেশ লাভের এবং বেকারত্ব হতে রক্ষা পাওয়ার অধিকার

---

[১] সহিহ আত-তিরমিযি, তাহকিক- মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, কিতাবুল ফিতান, বাবু মা জায়া আফদালুল জিহাদ... ও সুনান আবু দাউদ।

[২] রাসূল স.-এর হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইমাম শাতিবি, আল-ইতিসাম, খ. ২, পৃ. ৩১৯; কেউ কেউ এটিকে প্রখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হবার সম্ভাবনা বেশি বলেই মন্তব্য করেছেন।

www.pathagar.com

রয়েছে। কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেকেরই সমপরিমাণ কাজের জন্য সমপরিমাণ ভাতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৪: প্রত্যেকেরই কাজের ন্যায়সঙ্গত সময়সীমা, বেতনসহ নিয়মিত ছুটি ও বিশ্রাম এবং অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।' [১১ : ৮৫]

'তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, যেন তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার।' [২৮ ; ৭৩]

'শ্রমিককে তার দেহের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দাও।'[১]

'কাজের পারিতোষিক নির্ধারণ ব্যতিরেকে কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করবে না।'[২]

'শ্রমিকদেরকে দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে উপযুক্ত আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে এবং তাদের ওপর সামর্থ্য অনুসারে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।'[৩]

৯.১০. শিক্ষালাভের অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা

ধারা-২৬: প্রত্যেকেরই শিক্ষার অধিকার আছে। শিক্ষা পরিচালিত হবে মানব ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'পড় তোমার প্রভুর নামে।' [৯৬ :১]

'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?' [৩৯ : ৯]

'কুরআন আমি সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য।' [৫৪ : ১৭]

'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।' [১৭ : ৩৬]

'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরয।'[৪]

---

[১]ইবনে মাজাহ, কিতাবু রাহুন, বাবু আজরিল উজরা।

[২]বায়হাকি, কিতাবুল ইজারা।

[৩]মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

[৪]ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামী শরী'আহ্‌র উৎস

ইসলামী শরী'আহ্‌র উৎস

সর্বসম্মতিক্রমে কুরআন-সুন্নাহ্‌ই ইসলামী শরী'আহ্‌র মূল ও প্রধান উৎস। এ দুটিকে অহিভিত্তিক উৎস বলা হয়। অহি দু' ধরনের। 'অহি মাতলু'(الْوَحْيُ الْمَتْلُوْ) বা আল কুরআন ও 'অহি গায়রে মাতলু' (الْوَحْيُ غَيْرُ مَتْلُوْ) বা হাদিস। এ দুটি ছাড়া আরো অনেক উৎস রয়েছে যেগুলো থেকে ইসলামী আইন প্রণয়ন করা হয়। আল্লামা নাজমুদ্দিন তুফি ১৯টি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার ড. আহমাদ আবদুর রহিম আস্-সায়িহ মোট ৪৫টি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

কুরআন-সুন্নাহ্‌ই ইসলামী শরী'আহ্‌র প্রধান ও মৌলিক উৎস এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এ সম্পর্কে যেসব আয়াত ও হাদিসকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে ক'টি নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. 'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।'[২]

খ. 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।'[৩]

গ. 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।'[৪]

ঘ. 'নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের (জীবনের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।'[৫]

ঙ. 'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত।'[৬]

চ. 'আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।'[৭]

---

[১]নাজমুদ্দিন আত-তুফি, রিসালাতুন ফি রিআয়াতিল মাসলিহা, বিশ্লেষণ : ড. আবদুর রহিম আস-সায়িহ, দারুল মিসরিয়্যাহ লিবানিয়্যাহ, লেবানন, পৃ. ১৩-২১।

[২]আল কুরআন, ৮ : ২০।

[৩]আল কুরআন, ৩৩ : ৭১।

[৪]আল কুরআন, ৮ : ১।

[৫]আল কুরআন, ৩৩ : ২১।

[৬]আল কুরআন, ৪ : ৫৯।

[৭]হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১/১৭১, নং ৩১৮/৩১।

www.pathagar.com

কুরআন ও সুন্নাহ্ ছাড়া ইজতিহাদভিত্তিক আনুষঙ্গিক আরো উৎস রয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে নিত্য-নতুন উদ্ভাবিত সমস্যাদি সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ইজতিহাদ বা বিচারবুদ্ধিজাত গবেষণার মাধ্যমে এসব উৎসের প্রয়োগ করা হয়, যা ইসলামী শরী'আহ্র গতিশীলতা প্রকাশ করে। মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যতিক্রমি ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ আলিম ও ফকিহ্ যেসব উৎসের ব্যাপারে একমত হয়েছেন সেগুলো হলো : কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস। এ ছাড়া আরো যেসব উৎসের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে : ইসতিহসান, মাসালিহ্ মুরসালাহ্, উরফ, সাদ্দুয যারায়ি, ইসতিসহাব, আমালু আহলিল মাদিনা, তা'আমুলুস সাহাবা, শার'উ মান কাবলানা ইত্যাদি। এগুলোকে অহি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিবৃত্তিক উৎস বলা হয়। কুরআন-সুন্নাহ্ হলো অহিভিত্তিক উৎস এবং অন্যগুলো হলো অহিনিয়ন্ত্রিত ইজতিহাদভিত্তিক উৎস। তবে এ সকল উৎসের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে কুরআন-সুন্নাহ্র সমর্থনের ওপর। নিচে ইসলামী শরী'আহ্র প্রধান ও মৌলিক উৎসগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. কুরআন

আল কুরআন বা কিতাবুল্লাহ্ হলো ইসলামী শরী'আহ্র প্রধান উৎস। কুরআন (قُرْآنٌ) শব্দটি আরবি কারউন (قَرْءٌ) শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ পাঠ করা। এ হিসেবে কুরআন শব্দের অর্থ হয় (مَقْرُوْءٌ) পঠিত। পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বিধায় কুরআনকে এ নামে অভিহিত করা হয়। আবার কারো কারো মতে, কুরআন শব্দটি কারনুন (قَرْنٌ) থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ জমা, একত্র বা সংযুক্ত করা। এ হিসেবে কুরআনের অর্থ সংযুক্ত। কুরআনের একটি আয়াতের সাথে অন্যটি সংযুক্ত, কিংবা পূর্ববর্তী সকল আসমানি গ্রন্থ, সকল শরী'আহ্ ও সকল নবী-রাসূলের শিক্ষার সারসংক্ষেপ হওয়ার কারণে কুরআনকে এ নামে অভিহিত করা হয়।

কুরআনের সংজ্ঞা না দিলেও এর পরিচয় পেতে কারো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবু রীতি পালনার্থে একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো, 'কুরআন আল্লাহ্র বাণী, যা আমাদের নেতা মুহাম্মদ স.-এর ওপর আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ও তার পাঠ ইবাদত হিসেবে গণ্য; যা সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু হয়ে সূরা নাস দিয়ে সমাপ্ত।'[১]

---

[১]ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলি, আল-ওযাজিয ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী, দারুল খাইর, দামেশক, ২০০৩, পৃ. ১৩৯।

www.pathagar.com

কুরআনের সংজ্ঞায় আরো একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, শুধু পাঠ বা text (নাজম)-এর নাম যেমন কুরআন নয় তেমনি শুধু অর্থের নামও কুরআন নয়। এ ব্যাপারে উসূলবিদগণ একমত যে, অর্থ ও পাঠ উভয়ের সমষ্টিই কুরআন।

বিভিন্ন হিসাবে দেখা গেছে, কুরআনের প্রায় ৫০০টি আয়াতে আইনসংক্রান্ত বিধিবিধান বিবৃত হয়েছে। এ সকল বিধি-বিধানের মধ্যে রয়েছে সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্ব, হত্যা, সুদ, জুয়া, ক্ষতিপূরণ, দান, শপথ, বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, মোহর, ভরণপোষণ, শিশুর প্রতিপালন, দুধপান, পিতৃত্ব, উত্তরাধিকার, হেবা, ক্রয়, বিক্রয়, ধার, বন্ধক, ধনী গরিবের মাঝে সম্পর্ক, ন্যায়বিচার, সাক্ষ্য, যুদ্ধ, শান্তি ইত্যাদি।

২. সুন্নাহ্

সুন্নাহ্ ইসলামী শরী'আহ্র দ্বিতীয় উৎস, আল কুরআনের পরই যার স্থান। সুন্নাহ্ (سُنَّةٌ) শব্দের অর্থ হলো পথ, পদ্ধতি, রীতি-নীতি, নিয়ম ইত্যাদি।

পরিভাষায় কুরআন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ স. থেকে যা এসেছে যথা তাঁর বক্তব্য, কাজ ও নীরব সম্মতির সমষ্টিই সুন্নাহ্।[১] ব্যাপক পরিসরে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর 'ইশারা-ইঙ্গিত, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, সন্ধি অথবা তিনি যেসব কাজ করার সুযোগ পেয়েও পরিত্যাগ করেছেন এর সবকিছুই সুন্নাহ্র অন্তর্ভুক্ত।'[২]

সুন্নাহ্ হলো আল কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। যেমন, সালাত, যাকাত, হজ্ব, সুদ, লেনদেন এরূপ আরো অসংখ্য বিষয়ের অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান ও স্পষ্টতর করে সুন্নাহ্। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ নিজেই ভিত্তিমূলক, যাকে আস্-সুন্নাহ্ আল মুআস্‌সাসা (السُّنَّةُ الْمُؤَسِّسَةُ) বলা হয়। অর্থাৎ, যে বিধান সুন্নাহ্তেই কেবল রয়েছে। যেমন, স্ত্রীর খালা ও ফুফুকে একত্রে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা অথবা সম্পত্তির প্রাক ক্রয়ের অধিকার (শুফা) ইত্যাদির উল্লেখ কেবল সুন্নাহ্তে রয়েছে। সুন্নাহ্ যেহেতু কুরআনের বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ, তাই উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে অবশ্যই কুরআন প্রাধান্য পাবে ও সে বিধানই কার্যকর হবে।

২.১. সুন্নাহ্ থেকে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয়

কোনো হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে হলে প্রথমেই তা সহিহ কিনা দেখতে হবে। কিন্তু সব সহিহ হাদিসই সর্বক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গ্রহণীয় কিনা, এ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে। এখানে সে অবতারণার সুযোগ নেই। তবে ড. ইউসুফ

---

[১]আবদুল করিম যায়দান, আল-মাদখাল লি-দিরাসাতিশ শারইয়্যা আল-ইসলামিয়া, খ. ১৪, পৃ. ১৬০।
[২]আশ্-শাওকানি, ইরশাদুল ফুহুল, খ. ১, পৃ. ১৮৬।

www.pathagar.com

আল কারযাভি তাঁর ‘ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন’ শীর্ষক গ্রন্থে সুন্নাহ্ থেকে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব নির্দেশিকা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে থেকে কয়েকটি হলো :

ক. যেসব হাদিস কোনো সাময়িক কারণের সাথে সম্পৃক্ত, উক্ত কারণ দূরীভূত হলে ঐ হাদিসের হুকুমও দূরীভূত হয়ে যায়।

খ. যেসব হাদিস কোনো সুনির্দিষ্ট প্রথার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, পরে সে প্রথার পরিবর্তন হলে ঐ হাদিসের হুকুম সে ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য হবে না।

গ. যেসব কাজ ও কথা রাসূলুল্লাহ্ স. রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে করেছেন বা বলেছেন আর যেসব কাজ ও কথা ফতোয়া কিংবা দীনের তাবলিগ হিসেবে করেছেন বা বলেছেন তার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

ঘ. যেসব হাদিস কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসেছে আর যেসব হাদিস সাধারণ ও চিরন্তন শরী'আহ্ হিসেবে এসেছে তার মধ্যে পার্থক্য করে দলিল গ্রহণ করতে হবে।

৩. ইজমা

কুরআন-সুন্নাহ্‌র পর ইজমাকে ইসলামী শরী'আহ্‌র তৃতীয় উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আরবি ইজমা (إِجْمَاعٌ) শব্দের অর্থ হলো ঐকমত্য পোষণ করা, একতাবদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্র করা ইত্যাদি। পরিভাষায়, মহানবী স.-এর ওফাতের পর বিভিন্ন যুগে শরী'আহ্‌র কোনো বিধানের ব্যাপারে তাঁর উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।[১]

৩.১. ইজমার উদাহরণ

ইমাম ইবনে হাযম র. তাঁর ‘মারাতিবুল ইজমা’ গ্রন্থে ইজমার বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তার একটি হলো পানি বিষয়ে সংঘটিত ইজমা। বলা হয়েছে যে, স্থির পানির পরিমাণ যদি এতো বেশি হয় যে, তার মাঝখানে নাড়া দিলে কিনারার পানি নড়ে না, তবে উক্ত পানিতে কোনো কিছু পতিত হলেও পানির স্বাদ, গন্ধ, বা রঙ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তাকে অপবিত্র হিসেবে গণ্য করা যাবে না।[২]

ড. ইফসুফ আল কারযাভি অবশ্য বলেছেন, ফিকাহ শাস্ত্রে এমন কিছু ইজতিহাদি আহকাম রয়েছে যার ভিত্তি ইজমা। কিন্তু এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এ সম্পর্কে অনেক মতদ্বন্দ্ব রয়েছে এবং অনেক কথা বলা হয়েছে। গভীর

---

[১]ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, খ. ১, পৃ. ৪৬৯।
[২]ইবনে হাযম র., মারাতিবুল ইজমা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, পৃ. ১৭।

www.pathagar.com

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে কোনো ইজমাই সংঘটিত হয়নি।[১] কাজেই ইজমা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে।

৩.২. ইজমার প্রামাণিকতা

ইসলামী শরী'আহ্‌র উৎস হিসেবে ইজমাকে গ্রহণ করার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ্‌তে বহু ইঙ্গিতমূলক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন, আল কুরআনের বাণী : 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজে আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দেবে।'[২] এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মুজতাহিদগণের আদেশ-নিষেধ মুসলিম জাতির জন্য দলিল এবং তাঁদের ইজমা শরী'আহ্‌র উৎস হিসেবে গণ্য হবে।[৩]

ইজমার আরো একটি দলিল হলো, 'যদি তারা তা রাসূল ও তাদের নেতৃস্থানীয়দের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা এর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।'[৪] অনুরূপভাবে আল কুরআনের (২ : ১৪৩), (৩ : ১১০), (৭ : ১৮১) ও (৪ : ১১৫) আয়াতকে ইজমার দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ইজমার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী- 'আমার উম্মত ভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না। অতএব যখন মতবিরোধ দেখবে তখন তোমাদের উচিত হবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে থাকা।'[৫] 'মুসলমানগণ যা ভালো মনে করে আল্লাহ্‌র কাছে তা ভালো, আর তারা যা খারাপ মনে করে আল্লাহ্‌র কাছে তা খারাপ'[৬] ইত্যাদিসহ প্রায় দশটি হাদিসকে ইজমার ইঙ্গিতবাহী দলিল হিসেবে মনে করা হয়।

ইমাম গাযালি র. ইজমার দলিল হিসেবে উপস্থাপিত সকল আয়াতকে ইজমা প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইঙ্গিতপূর্ণ, তবে চূড়ান্ত নয় বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম সুয়ুতির ব্যাখ্যাও অনুরূপ। অন্য দিকে আহমাদ হাসানের পর্যবেক্ষণ হলো ইজমার স্বপক্ষে এ সকল হাদিস অকাট্য নয়।[৭]

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।
[২]আল কুরআন, ৩ : ১১০।
[৩]আস সারাখসি, উসূল আস সারাখসি, খ. ১, পৃ. ২৯৬।
[৪]আল কুরআন, ৪ : ৮৩।
[৫]ইবনে মাজাহ।
[৬]মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদ আল-মুকাসসিরিন মিনাস সাহাবাহ, মুসনাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ।
[৭]শাহ আবদুল হান্নান, উসূলুল ফিকহ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১১, পৃ. ৩৩-৩৪।

www.pathagar.com

৩.৩. ইজমার ভিত্তি

জমহুরে উলামায়ে কিরামের মতে, ইজমার আইনি ভিত্তি হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ্র নস কিংবা কিয়াস অবশ্যই থাকতে হবে। ইবনে হাযমের মতে, নসের ভিত্তি ছাড়া ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

কিয়াস ইজমার ভিত্তি হতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, ইজমার ভিত্তি অকাট্য দলিল তথা কুরআন, মুতাওয়াতির হাদিস এবং ধারণাপ্রসূত দলিল তথা খবরে আহাদ ও কিয়াস উভয় হতে পারে, কিন্তু যাহিরি ও শিয়াগণ এবং ইমাম তাবারির মতে, অকাট্য দলিল ছাড়া ইজমার ভিত্তি হতে পারে না। অতএব খবরে আহাদ ও কিয়াস ইজমার ভিত্তি নয়।[২]

৩.৪. ইজমার প্রকারভেদ

সাধারণত ইজমা দু'ধরনের। 'ইজমা আস সরিহ' (إِجْمَاعُ الصَّرِيْحُ) বা প্রকাশ্য ঐকমত্য এবং 'ইজমা আস সুকুতি' (إِجْمَاعُ السُّكُوْتِي) বা মৌন ঐকমত্য। মুজতাহিদগণ যখন শরী'আহ্র কোনো বিধানের ওপর প্রকাশ্যভাবে তাদের অভিমত ঘোষণার মাধ্যমে একমত হন তখন তাকে প্রকাশ্য ইজমা বলা হয়। আর কোনো যুগের এক বা একাধিক মুজতাহিদ কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করলে এবং অন্যান্য মুজতাহিদ বিরোধিতার শক্তি, সুযোগ ও পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও স্পষ্টভাবে উক্ত অভিমতের বিরোধিতা না করলে আবার তাতে সম্মতিও না জানালে বা নীরব থাকলে তাকে মৌন ইজমা বলা হয়।

৪. কিয়াস

ইসলামী শরী'আহ্র চারটি প্রধান উৎসের একটি কিয়াস। আরবি কিয়াস (قِيَاسٌ) শব্দের অর্থ পরিমাপ করা, তুলনা করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, দুটি বস্তুকে পরস্পর তুল্য সাব্যস্ত করা, কোনো বস্তুকে তার সমকক্ষ বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় কিয়াস হলো, যে নতুন বা শাখা বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার দলিল নেই সেই বিষয়টিকে এমন একটি মৌলিক বা আসল বিষয়ের সাথে তুলনা করা, যে বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার দলিল রয়েছে। এক্ষেত্রে আসল বিষয়ে শরী'আহ্র যে হুকুম রয়েছে তার অনুরূপ হুকুম নতুন বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়।

বিচারপতি শহিদ আবদুল কাদির আওদাহ র. বলেন, যে বিষয় সম্পর্কে শরী'আহ্র নস (text) বিদ্যমান নেই সেই বিষয়কে কারণসমূহের অভিন্নতার

---

[১]ইবনে হাযম র., আল-ইহকাম, খ. ৪, পৃ. ৪৯৫।

[২]ইমাম গাযালি র., আল-মুসতাসফা, খ. ১, পৃ. ১২৩।

www.pathagar.com

ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা যে সম্পর্কে শরী'আহ্‌র নসভিত্তিক বিধান রয়েছে।[1]

৪.১. কিয়াসের উদাহরণ

মদপান সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ

অর্থাৎ, 'হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[২]

উক্ত আয়াতে 'খাম্‌র' (خَمْرٌ) বা আঙুর রস থেকে তৈরী মদ হারাম করা হয়েছে। খাম্‌র হারাম হওয়ার 'ইল্লত' বা কারণ হলো মাদকতা, যার মধ্যে নানা ধরনের অনিষ্টকারী উপাদান রয়েছে। কিন্তু 'খাম্‌র' ছাড়াও আরো অনেক বস্তু রয়েছে যা মাদকতা সৃষ্টি করে। তাহলে সেগুলো হারাম হবে কি হবে না তা কুরআনের উক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তাই মুজতাহিদগণ 'খাম্‌র' হারাম হওয়ার ইল্লত 'মাদকতা'র ওপর কিয়াস করে সকল ধরনের মাদকতা সৃষ্টিকারী জিনিসকে হারাম করেছেন।

কিয়াস সম্পাদনের বেলায় নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয় :

আসল বা মূল	: খাম্‌র বা মদপান, যাকে মাকিস আলাইহি বলা হয়।
ফার'উ বা শাখা	: অন্যান্য মাদকতা সৃষ্টিকারী বস্তু, যাকে মাকিস বলা হয়।
ইল্লাত বা কারণ	: মাদকতা, যাকে ইল্লাত বলা হয়।
হুকুম বা রায়	: হারাম, যাকে আল হুরমাহ্‌ বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, মাদক দ্রব্য হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল কুরআনের উক্ত আয়াত থেকে কিয়াসের মাধ্যমে নির্ণীত বিধান ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা একই। অর্থাৎ, সকল মাদকতা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদিস রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্‌ স. বলেছেন, সকল মাদক দ্রব্যই 'খাম্‌র'। আর সব খাম্‌রই হারাম।[৩]

---

[১] বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ র., আত তাশরীউল জিনাইল ইসলামী, মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ্‌, বৈরুত, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ১৮২; ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১, খ. ১, পৃ. ৯৮।

[২] আল কুরআন, ৫ : ৯০।

[৩] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবাহ্‌, বাবু বায়ানি আন্না কুল্লা মুসকিরিন খাম্‌র ওয়া আন্না কুল্লা খামরিন হারাম।।

www.pathagar.com

আবার 'খাম্‌র'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে উমর রা. মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'নিশ্চয় মদ হারাম সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তা তৈরী হয় পাঁচটি জিনিস থেকে : আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু থেকে। আর যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে, তাই খাম্‌র।'[১]

কিয়াসের আরো একটি উদাহরণ হলো, জুমু'আর দিনে আযানের সময় সালাত থেকে বিরত রাখে এমন সকল কাজ মাকরুহ হওয়ার বিধান। এ সম্পর্কিত কিয়াসের মূল দলিল হলো মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ -

অর্থাৎ, 'জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ত্যাগ করো।'[২]

উক্ত আয়াতে জুমু'আর আযানের সময় শুধু বেচাকেনা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য কোনো কাজ যা সালাত থেকে মানুষকে বিরত রাখে সে সম্পর্কে কোনো বিধান দেয়া হয়নি। তাই মুজতাহিদগণ কুরআনের উক্ত আয়াত থেকে কিয়াস করে ইজারা, ধারকর্জসহ সকল কাজ মাকরুহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলো মানুষকে জুমু'আর সালাত থেকে বিরত রাখে। কিয়াসের প্রক্রিয়ায় মুজতাহিদগণ বলেন যে, জুমু'আর আযানের পর বেচাকেনা মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো, তা মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখে। অতএব সকল কাজ যা মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখে তার সবই উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪.২. কিয়াসের প্রামাণিকতা

কিয়াসকে ইসলামী শরী'আহ্‌র উৎস হিসেবে গণ্যকারীগণ তাদের মতের পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও যুক্তির দলিল পেশ করে থাকেন। আল কুরআনের বাণী : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ —'অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[৩] এবং মু'আয ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত হাদিসটি ইজতিহাদ ও কিয়াস উভয়ের দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া কিয়াসের দলিল হিসেবে ব্যবহৃত আরো একটি হাদিস হলো, খাছআম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে এসে বললেন, 'আমার পিতার ওপর হজ্ব ফরয হয়েছে কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, তার পক্ষে হজ্ব পালন করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি যদি তার পক্ষ

---

[১]সহিহ আল বুখারি ও সহিহ মুসলিম, কিতাবুত তাফসির, বাবু ফি নুযুলি তাহরিমিল খাম্‌র।
[২]আল কুরআন, ৬২ : ৯।
[৩]আল কুরআন, ৫৯ : ২।

www.pathagar.com

থেকে হজ্ব আদায় করি তবে কি তাতে তার কোনো লাভ হবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মনে কর যে, তোমার পিতার যদি ঋণ থাকে আর তা যদি তুমি পরিশোধ করে দাও, তাতে কি তার লাভ হবে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, তাহলে আল্লাহ্র ঋণ পরিশোধ করা আরো অধিক আবশ্যক।[১]

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ স. আল্লাহ্র ঋণকে বান্দাহর ঋণের সাথে কিয়াস বা তুলনা করে অনাদায়ী হজ্ব আদায়ের ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করেছেন।

৪.৩. কিয়াসের প্রকারভেদ

শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে কিয়াস দু' প্রকার : কিয়াসে জলি (قِيَاس جَلِي) বা প্রকাশ্য কিয়াস ও কিয়াসে খফি (قِيَاس خَفِي) বা গোপন বা অপ্রকাশ্য কিয়াস।

৪.৩.১. কিয়াসে জলি : যে কিয়াসের কার্যকারণ সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে অতি দ্রুত মানুষের মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে এবং তা অনুধাবনে সহযোগিতা করে, তাকে কিয়াসে জলি বা প্রকাশ্য কিয়াস বলা হয়।

৪.৩.২. কিয়াসে খফি : যে কিয়াসের কার্যকারণ অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়, তাকে কিয়াসে খফি বা অপ্রকাশ্য কিয়াস বলা হয়।

৫. ইসতিহ্সান

ইসতিহ্সান (اِسْتِحْسَانٌ) শব্দটি হুসনুন (حُسْنٌ) শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ হলো উত্তম, ভালো, সুন্দর, যা খারাপের বিপরীত। এ হিসেবে ইসতিহ্সান শব্দের অর্থ হলো কোনো কাজ বা বিষয়কে কল্যাণকর বা উপকারী করা। আর পরিভাষায়, 'কোনো বিষয়ের দুটি দিকের মধ্যে কোনো একটি দিককে যুক্তিসঙ্গত দলিলের ভিত্তিতে অপর দিকের ওপর অগ্রাধিকার প্রদানকে ইসতিহ্সান বলা হয়।'[২]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়াস দু' প্রকার। কিয়াসে জলি ও কিয়াসে খফি। কিয়াসে খফিকে আবার 'ইসতিহ্সান'-ও বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, কিয়াসে জলি একটি বিষয় কামনা করে, অন্য দিকে হাদিস, ইজমা, গোপন কিয়াস ও জরুরত অন্য বিষয় কামনা করে, তখন কিয়াসে জলি বর্জন করে তার বিপরীত আমল করাকে ইসতিহ্সান বলে।[৩] আরো সহজে বলা যায়, কিয়াস

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল মানাসিক, বাবু উজুবুল হজ্ব ওয়া ফাদলিহি; নাসা'ঈ, কিতাবুল হজ্ব, বাবু তাশবিহু কাদাউল হজ্ব বিকাদাই দাইন, খ. ২, পৃ. ৩২৪।

[২]বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ২০।

[৩]মুল্লা জিউন র., নূরুল আনওয়ার, সাঈদ কোম্পানি, কুতুবখানা, রশীদিয়া, দিল্লি, পৃ. ৭।

www.pathagar.com

পরিত্যাগ করে জনগণের কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থা গ্রহণকেই 'ইসতিহ্সান' বলা হয়।[১] আল্লামা মুল্লা জিউন বলেন, যে দলিল বাহ্যত কিয়াসের বিপরীত তাকে ইসতিহ্সান বলে।[২]

ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, যুক্তি ও বাস্তব চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কিয়াসকে তদপেক্ষা শক্তিশালী আরেকটি কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে ইসতিহ্সান বলা হয়।[৩] ইমাম বাযদুভি র. বলেন, ঐ কিয়াসকে ইসতিহ্সান বলা হয় যে কিয়াসের তাৎপর্য অধিক শক্তিশালী, যদিও তা সূক্ষ্ম হোক না কেন।[৪] ইমাম শাতিবি র. বলেন, সামগ্রিক দলিলের বিপরীতে আংশিক জনস্বার্থে বা কল্যাণ গ্রহণ করাই ইসতিহ্সান।[৫]

৫.১. ইসতিহ্সানের উদাহরণ

ইসতিহ্সানের একটি উদাহরণ হলো, পরিবহণ মালিককে পণ্য নষ্ট হওয়ার জন্য এবং খাদ্য বহনকারীকে খাদ্য নষ্ট হওয়ার জন্য জরিমানা করা। শরী'আহ্‌র একটি সাধারণ মূলনীতি হলো, 'আমানতদারকে আমানতকৃত জিনিসের জন্য দায়ী করা যায় না।' এ কারণে চুক্তি অনুযায়ী পরিবহণ মালিক ও খাদ্য বহনকারী আমানতদার হিসেবে গণ্য। ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পদ নষ্ট না করলে তারা জরিমানা দিতে বাধ্য নয়, কিন্তু মাসলাহা বা জনকল্যাণার্থে ইসতিহ্সানের ভিত্তিতে তাদেরকে দায়ী করে জরিমানা করা যায়।[৬] এ রকম বিধান না রাখা হলে তারা আমানতকৃত সম্পদের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে।

৫.২. ইসতিহ্সানের প্রামাণিকতা

কুরআন-সুন্নাহ্‌তে ইসতিহ্সানের সমর্থনে অকাট্য কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। তবে এর সমর্থনে ইঙ্গিতবাহী অনেক দলিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু বকর আল জাসসাস র. বলেন, যেসব বিষয়ে হানাফি ফকিহ্গণ ইসতিহ্সানের সমর্থক, তার সবই যুক্তি ও শরী'আহ্‌র মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর কোনোটির মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিগত ঝোঁকপ্রবণতা ও লালসার লেশমাত্র নেই।[৭]

---

[১]মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ, ১৩৩।

[২]উসূলুল ফিকহ, আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৯, পৃ. ৩২।

[৩]প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

[৪]প্রাগুক্ত।

[৫]ইমাম শাতিবি র., আল-মুওয়াফাকাত ফি উসুলিশ শরী'আহ, বিশ্লেষণ : শায়খ আব্দুল্লাহ দিরাজ, মিশর, আল-মাকতাবাহ আত-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, খ. ৪, পৃ. ২০৬।

[৬]ইমাম শাতিবি র., আল-ইতিসাম, খ. ২, পৃ. ১২১। উদ্ধৃত : মুহাম্মদ রুহুল আমিন, ইসলামী আইনের উৎস, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩, পৃ. ১৪৭।

[৭]ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

www.pathagar.com

ইসতিহসানের সমর্থনে যেসব দলিল পেশ করা হয় তা হলো : মহান আল্লাহ্র বাণী : 'অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাহ্দের, (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ) যারা মনোযোগসহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) তা গ্রহণ করে।'[১] وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ—'তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। সচ্ছল তার সাধ্যমতে এবং অসচ্ছল তার সামর্থ্যানুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে। এটি সৎকর্মশীলদের ওপর দায়িত্ব।'[২] وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ—'এবং তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি।'[৩] وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا—'এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণের নির্দেশ দাও।'[৪]

ইসতিহসানের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী : 'মুসলিমগণ যা উত্তম বিবেচনা করে তা আল্লাহ্র নিকট উত্তম এবং মুসলিমগণ যা মন্দ বিবেচনা করে তা আল্লাহ্র নিকটও মন্দ।'[৫]

৫.৩. ইসলামী শরী'আহ্র উৎস হিসেবে ইসতিহসান

ইসতিহসান ইসলামী শরী'আহ্র একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয়তার চাহিদা মেটানোর জন্য ইসতিহসানকে আইনের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা র., মালিক র. ও আহমদ ইবনে হাম্বল র. কোনো বিধান প্রণয়নের জন্য ইসতিহসানকে শরী'আহ্র দলিল মনে করেন। তবে শাফি'ঈ, যাহিরি ও শি'আ মাযহাবের নিকট ইসতিহসান স্বীকৃত নয়।

৬. মাসালিহ্ মুরসালাহ্

মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা জনকল্যাণ ইসলামী শরী'আহ্র একটি উৎস। এখানে দুটি শব্দ রয়েছে। মাসালিহ্ ও মুরসালাহ্। আরবি মাসলাহা (مَصْلَحَةٌ) শব্দের বহুবচন 'মাসালিহ্' (مَصَالِحُ)। মাসলাহা অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, স্বার্থ ইত্যাদি। আর মুরসালাহ্

---

[১]আল কুরআন, ৩৯ : ১৭-১৮।

[২]আল কুরআন, ২ : ২৩৬।

[৩]আল কুরআন, ২২ : ৭৮।

[৪]আল কুরআন, ৭ : ১৪৫।

[৫]মুসনাদে আহমাদ।

www.pathagar.com

অর্থ মুতলাক বা মুক্ত বা সাধারণ। অতএব মাসালিহ্ মুরসালাহ্ অর্থ সাধারণ কল্যাণ। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে শব্দটি জনকল্যাণ, জনস্বার্থ, কল্যাণের চিন্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সহজে বলা যায়, মাসালিহ্ মুরসালাহ্র অর্থ হলো অবারিত জনস্বার্থ।

পরিভাষায় মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বলতে এমন কল্যাণকে বুঝায় যা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে শরী'আহ্ প্রণেতার পক্ষ হতে এমন কোনো অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল নেই এবং যার এমন কোনো মূলও নেই, যার ওপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণ ও গণ্য করা হলে তাতে কোনো-না-কোনো উপকার অর্জন বা ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায়।

ইমাম শাতিবি র. বলেন, 'মাসালিহ্ মুরসালাহ্ হলো এমন সব বিষয় যার পক্ষে শরী'আহ্র কোনো মূলনীতি সাক্ষ্য দেয় না এবং যাকে বাতিল করার পক্ষেও কোনো সাক্ষ্য দেয় না অথচ সুস্থ বিবেক বিষয়গুলো গ্রহণ করে।'[১]

৭. উরফ

'উরফ' (عُرْفٌ) শব্দের অর্থ প্রচলিত রীতি, প্রথা বা রেওয়াজ। উরফের অনুরূপ শব্দ হলো আদাহ বা অভ্যাস এবং তা'আমুল বা অভ্যাসগত কাজ। পরিভাষায় উরফ হলো 'কথা ও কাজে বিপুল সংখ্যক মানুষের অভ্যাস।'[২] ড. যুহাইলি বলেন, উরফ হলো সেসব বিষয়, কর্মকাণ্ড ও শব্দার্থ, যেসব বিষয় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বা প্রচলিত যেসব কর্মকাণ্ডে তারা অভ্যস্ত হয়েছে বা যেসব শব্দ প্রকৃত অর্থের বিপরীতে বিশেষ অর্থ প্রদানের জন্য তারা ব্যবহার করে।[৩]

'কয়েক ব্যক্তি বা কয়েক শ্রেণির মানুষ বা কয়েক মহল্লার মানুষ যে আচরণ করে আইনের দৃষ্টিতে তা উরফ বা প্রথা নয়। একটি গ্রামের মানুষ বা একটি শহরের আচরণও প্রথা হতে পারে না। মাঝে মাঝে মানুষ যা করে তা প্রথা নয়। সমগ্র দেশ বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সকল মানুষের মধ্যে সর্বজন স্বীকৃতভাবে যে অভ্যাস প্রচলিত থাকে তাকে প্রথা গণ্য করা যায়।[৪] উরফকে তখনি শরী'আহ্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যায়, যখন তা কুরআন-সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। সাংঘর্ষিক হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

---

[১]ইমাম শাতিবি র., আল-মুওয়াফাকাত, খ. ১, পৃ. ৩৯।

[২]মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৫০।

[৩]ড, ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, খ. ২, পৃ. ১০৪।

[৪]বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ২৯।

www.pathagar.com

৭.১. উরফের উদাহরণ

নবী করিম স. মদিনায় গিয়ে দেখলেন, লোকেরা খেজুর গাছে ‘তাবির’ (খেজুর গাছে নরপাপড়ি সংযোজন) করছে। নবী স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এরূপ করছ কেন? তারা বলল, আমরা এরূপ করে আসছি। তিনি বললেন, এরূপ না করলে সম্ভবত ভালো হতো। সেমতে তারা তাবির করা ছেড়ে দিল। কিন্তু পরের বছর খেজুরের ফলন কমে গেলে বিষয়টি তারা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে আলোচনা করল। তখন তিনি বললেন, আমি একজন মানুষ মাত্র। কাজেই আমি যখন দীনি কোনো বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেই তখন তোমরা তা অবলম্বন করো। আর আমার নিজের পক্ষ থেকে যখন কোনো নির্দেশ দেই, তবে আমি একজন মানুষ মাত্র।[১]

উরফের আরো একটি উদাহরণ হলো, দিয়াত বা রক্তপণের পরিমাণ ১০০ উট। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব জনৈক মহিলার প্রস্তাব অনুযায়ী রক্তপণের এই সংখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়িগণের যুগে এই বিধান প্রচলিত ছিল।[২]

৭.২. উরফের প্রামাণিকতা

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সময় আরব সমাজে অনেক প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এগুলোর মধ্যে তিনি অনেক প্রথাকে সরাসরি নিষিদ্ধ করেননি। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে বহু মুসলিম এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব এলাকায় প্রচলিত কোনো প্রথা যদি ইসলামী শরী‘আহ্‌র পরিপন্থি না হতো তাহলে জনগণকে তদনুযায়ী আমলে বাধা দেয়া হতো না।

উরফের প্রামাণিকতায় মহান আল্লাহ্‌র বাণী : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ—‘আর ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, সৎকাজের (উরফের) নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলো।’[৩] وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ—‘আর জনকের কর্তব্য হলো প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের ভরণপোষণ করা।’[৪] আল্লাহ্‌র রাসূলের বাণী : ‘তোমরা ও তোমার সন্তানের জন্য প্রথামাফিক যা প্রয়োজন গ্রহণ করো।’[৫]

---

[১]সহিহ আল বুখারি ও সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, বাবু উজুবি ইমতিসালি মা কালাহু শারআন...।

[২]মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

[৩]আল কুরআন, ৭ : ১৯৯।

[৪]আল কুরআন, ২ : ২৩৩।

[৫]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুন নাফাকাত, বাবু ইজা লাম ইয়ুনফিকুর রাজুলু ফালিল ইমরাতি আন তা‘খুজা বিগাইরি ইলমিহি মাইয়াকফিহা ওয়া ওলাদাহা বিল মা‘আরুফ।

www.pathagar.com

৮. সাদ্দুয যারায়ি

আরবি 'সাদ্দ' (سَدّ) শব্দের অর্থ বাধা, প্রতিবন্ধকতা আর 'যারায়ি' (ذَرَائِع) শব্দের অর্থ মাধ্যম, অসিলা বা পন্থা-পদ্ধতি। অতএব 'সাদ্দুয যারায়ি'-এর অর্থ দাঁড়ায় 'উপায়-উপকরণ বা কোনো কাজের মাধ্যমকে প্রতিহতকরণ'।

পরিভাষায় সাদ্দুয যারায়ি হলো, যখন কোনো বৈধ মাধ্যম দ্বারা অবৈধ ফলাফলের আশঙ্কা দেখা দেয় তখন ঐ বৈধ মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা। ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ বলেন, সাদ্দুয যারায়ি বলা হয়, 'এমন বৈধ উপায়-উপকরণ বন্ধ করা, যা দ্বারা অকল্যাণ সংঘটিত হতে পারে আবার নাও পারে। তবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং তার মাঝে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই প্রাধান্য পায়।'[১]

সারকথা হলো, কোনো উপায়-উপকরণ মূলগতভাবে বৈধ হলেও তা দিয়ে যদি অকল্যাণ সংঘটনের আশঙ্কা দেখা দেয় তবে ঐ উপায়-উপকরণ নিষিদ্ধ করাই সাদ্দুয যারায়ি।

৮.১.সাদ্দুয যারায়ির উদাহরণ

সাদ্দুয যারায়ির একটি উদাহরণ হলো, ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে উপহার নিতে বারণ করা। এই বারণের কারণ হলো, এটা সুদ গ্রহণের দিকে প্ররোচিত করতে পারে। আবার বিদ্রোহী ও ডাকাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা বৈধ নয়। কারণ তারা আরো শক্তিশালী হয়ে জনগণের ক্ষতি করতে পারে।

৮.২. সাদ্দুয যারায়ির প্রামাণিকতা

যারা সাদ্দুয যারায়িকে শরী'আহ্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন তারা এর পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবিদের কর্মকাণ্ডকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ র. এর সমর্থনে ৩০টি এবং ইবনুল কাইয়্যিম ৯৯টি দলিল পেশ করেছেন। এখানে এর ক'টি উল্লেখ করা হলো : মহান আল্লাহ্র বাণী, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ—'আল্লাহ্কে ছেড়ে তারা যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদের গালি দিও না। তাহলে তারা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্কে গালি দেবে।'[২] এ আয়াতে মুশরিকদের প্রতিমাকে গালি দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও প্রতিমাকে গালি দেয়ার যুক্তি বিদ্যমান কিন্তু তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্কে গালি দিতে পারে এই আশঙ্কায় প্রতিমাকে গালি দেয়া বৈধ নয়।

---

[১]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, লেবানন, খ. ৩, পৃ. ১০২।

[২]আল কুরআন, ৬ : ১০৮।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ — 'তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।'[১] মূলগতভাবে পায়ে অলঙ্কার পরে জোরে পদচারণা করা বৈধ কিন্তু পায়ের আওয়াজ তাদের প্রতি পুরুষদের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে এই আশঙ্কায় তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।[২]

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর আমল ও বাণী থেকেও সাদ্দুয যারায়ির প্রমাণ পাওয়া। যেমন মুনাফিকদের হত্যা করা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ স. তা থেকে বিরত থেকেছেন এই আশঙ্কায় যে, লোকেরা বলাবলি করবে : 'মুহাম্মদ স. তাঁর সঙ্গীসাথীদের হত্যা করে।'[৩] অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মনে ইসলাম ও মুহাম্মদ স. সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কার কারণে রাসূল স. বৈধ এ কাজ থেকে দূরে থেকেছেন।

সাহাবিগণের কর্মকাণ্ড থেকেও সাদ্দুয যারায়ির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সফরে সালাত কসর করতে হয়। কিন্তু উসমান রা. একবার সফরে সালাত কসর করা থেকে বিরত থাকলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি কি রাসূল স.-এর পেছনে সালাত কসর করেননি। তিনি বললেন, অবশ্যই, কিন্তু আমি এখানে বেদুঈন ও গ্রাম্য লোকজনের সামনে দুই রাকআত সালাত আদায় করলে তারা মনে করবে, সালাত এভাবেই অর্থাৎ দুই রাকআত ফরয করা হয়েছে। তিনি দীনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশঙ্কায় এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।[৪]

৯. ইসতিসহাব

আরবি ইসতিসহাব শব্দটি সাহবুন (صَحْبٌ) থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো সাহচর্য, সঙ্গে থাকা, কোনো বিষয় বা অবস্থাকে স্থায়ী করতে চাওয়া। পরিভাষায় অতীতে যা প্রমাণিত হয়েছিল, বর্তমান ও ভবিষ্যতে তাকে সেই অবস্থায় স্থিত রাখার নীতিকে ইসতিসহাবে হাল বলা হয়।

ইবনে হাযম র. বলেন, 'নস-এর ভিত্তিতে সাব্যস্ত মূল বিধান ততক্ষণ স্থায়ী রাখা, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার নসভিত্তিক কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়।'[৫]

---

[১]আল কুরআন, ২৪ : ৩১।

[২]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫।

[৩]সহিহ্ আল বুখারি, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা ইয়ানহা মিন দাওয়া আল-জাহিলিয়্যাহ্।

[৪]ইমাম শাতিবি র., আল-ইতিসাম, খ. ১, পৃ. ৫০৪।

[৫]ইবনুল হাযম র., আল-ইহকাম, খ. ৫, পৃ. ৩।

www.pathagar.com

সরলভাবে বলা যায়, ইসতিসহাবে হাল হলো, ইসলামী শরী'আহ্‌র কোনো হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর ও স্থায়ী বলে গণ্য করা যতক্ষণ না এমন কোনো দলিল পাওয়া যায় যা উক্ত হুকুমকে বদলে দেয় কিংবা রদ করে দেয়।

৯.১. ইসতিসহাবে হাল এর উদাহরণ

ইসতিহাবে হাল থেকে যে সব নিয়মনীতির উদ্ভব হয় তার একটি হলো : 'সবকিছু পূর্বাবস্থায় থাকাটাই তার মৌলিকত্ব।' যেমন, প্রত্যেক মানুষের মৌলিকত্ব হলো অঋণগ্রস্ত হওয়া। কাজেই কেউ যদি অপর কারো কাছে কোনো পাওনা দাবি করে, আর যার কাছে পাওনা দাবি করা হয়েছে সে যদি নিজেকে ঋণী হিসেবে স্বীকার না করে তাহলে তাকে ঋণমুক্তই ধরে নিতে হবে। কেননা প্রত্যেক মানুষের মৌলিকত্ব হলো ঋণমুক্ত হওয়া। তবে ঋণদাতা তার দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করলে ভিন্ন কথা। অনুরূপভাবে, প্রমাণ ছাড়া কোনো মেয়েকে কুমারিত্বহীন বলা যাবে না। যেমন, এক ব্যক্তি কোনো যুবতী মেয়েকে বিয়ে করল এই কথা জেনে নিয়ে যে সে কুমারী, পরে স্বামী যৌন মিলনকালে যদি দাবি করে যে, মেয়েটি কুমারী নয়, তা হলে তার এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না সে তার পক্ষে কোনো অকাট্য প্রমাণ পেশ করবে। কেননা, পূর্ব থেকে জানা ছিল যে, মেয়েটি কুমারী। ফলে এই জানা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ না এর বিপরীত কোনো প্রমাণ মেলে।[১]

৯.২. ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা

ইসতিসহাবের দলিল-প্রমাণ হিসেবে যেসব কুরআন-সুন্নাহ্‌র উদ্ধৃতি পেশ করা হয় তার ক'টি তুলে ধরা হলো :

মহান আল্লাহ্‌র বাণী : فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ— 'অতঃপর যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার। আর তার বিষয় আল্লাহ্‌র ওপর।'[২] 'আর আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তিনি কোনো জাতিকে একবার হেদায়াত দান করার পর তাদেরকে পদভ্রষ্ট করবেন, যতক্ষণ না তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার।'[৩]

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী : 'কেউ যেন কোনো শব্দ বা গন্ধ পাওয়া ছাড়া সালাত পরিত্যাগ না করে।'[৪] এ হাদিসে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া ওযুর ব্যাপারে সন্দেহ হলে

---

[১]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম র., ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

[২]আল কুরআন, ২ : ২৭৫।

[৩]আল কুরআন, ৯ : ১১৫।

[৪]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল অযু, বাবু লা ইতাওয়াদ্দা মিনাশ শাক্কি হাত্তা ইয়াসতাইকিনা।

www.pathagar.com

নতুন ওযুর প্রয়োজন নেই। এটাই মূলত ইসতিসহাবে হালের দাবি। আরো একটি প্রমাণ হলো, 'যদি তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে সন্দিহান হয়ে যায় যে, সে কত রাক'আত আদায় করেছে, তিন রাক'আত নাকি চার রাক'আত, তখন সে যেন তার সন্দেহ ছুড়ে ফেলে দেয় এবং দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করে। অতঃপর সালাম ফিরানোর আগে দুটি সেজদাহ্ আদায় করে। সে যদি পাঁচ রাক'আত আদায় করে থাকে তাহলে এ দু' সাজদাহ্ দ্বারা তার সালাতের জোড়া পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি পূর্ণ চার রাক'আত আদায় করে তবে সেজদাহ্ দুটি হবে শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল।'[১]

১০. তা'আমুলুস সাহাবা

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাহাবিগণের আমল ও ফতোয়া ইসলামী শরী'আহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শরী'আহ্সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবিদের ফতোয়া সর্বোচ্চ বিবেচনার দাবি রাখে। কেননা, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট থেকে সরাসরি কোনো বিষয়ের সমাধান জেনে নিতেন। আবার বিপুল সংখ্যক সাহাবি ইসলামী শরী'আহ্ সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের পারদর্শিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ স. নিজে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। ফলে তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে এমন সব সাধারণ ও আইনসম্মত বিধান নিহিত রয়েছে যা দ্বারা নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

সাহাবিদের কথা সাধারণত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এ ভাগগুলোর জন্য পৃথক পৃথক হুকুম রয়েছে :

- ক. সাহাবিগণের ইজমা সর্বসম্মতিক্রমে হুজ্জত বা দলিল হবে এবং গোটা উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ হিসেবে গণ্য হবে।[২]
- খ. সাহাবিদের ব্যক্তিগত কথা ও গবেষণালব্ধ ফয়সালা যদি কুরআন-সুন্নাহ্র খেলাফ হয় তাহলে তা গোটা উম্মতের সম্মিলিত মতানুযায়ী দলিল হিসেবে অনুসরণযোগ্য নয়; বরং সর্বসম্মতিক্রমে তা পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।[৩]
- গ. কোনো ব্যাপারে সাহাবিদের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদ প্রসিদ্ধি লাভ করলে এবং কেউ সে ব্যাপারে বিরোধিতা না করলে এবং সকলেই মৌনতা অবলম্বন করলে তখন তাঁদের এ কথা ও ইজতিহাদটি হুজ্জত হবে কিনা তা নিয়ে আলেমগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

---

[১]সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাবুস সাহু ফিস সালাত ওয়াস সুজুদ লাহু।

[২]মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, আধুনিক প্রকাশনী, খ. ১, পৃ. ১৮৫।

[৩]প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্

১. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পরিচিতি

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ইসলামী আইন-দর্শনের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটি ইসলামী আইনের একটি উৎসও। সময়ের আবর্তনে মানুষের জীবনে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হয়। এ নতুন আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া আইনটি কেন প্রণয়ন করা হচ্ছে, এর উদ্দেশ্য কী, আইনটি দিয়ে মানুষের কী কল্যাণ সাধিত হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। একইভাবে উক্ত আইনটির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্তে যে নির্দেশনা রয়েছে তার উদ্দেশ্যও বিবেচনা করা হয়। তাই বলা যায়, যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামী শরী'আহ্র বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করাই মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র মূল আলোচ্য বিষয়।

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র আলোচনায় জাসের আওদা (Jasser Auda) বলেন, হিজরি পঞ্চম শতক পর্যন্ত ইসলামী আইনের যেসব পদ্ধতি বিকশিত হয়েছিল সেগুলো পরিবর্তনশীল সভ্যতার জটিল পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলতে অনেকটা সীমিত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা জনস্বার্থ পরিভাষাটি বিকশিত হয়েছিল, নস-এ উল্লেখ নেই এমনসব ক্ষেত্রকেও যা অতিক্রম করতে এবং কিয়াসের সীমাবদ্ধতার ক্ষতিপূরণ করতে পারে। কিয়াস নতুন অবস্থাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। কেননা এটি কতগুলো যথার্থতার শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা জনস্বার্থ পরিভাষাটি সে শূন্যতাকে পূরণ করতে পারে, আর এটিই ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্কে বিকশিত করেছে।[১]

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ আরবি দুটি শব্দ 'মাকাসিদ' (مَقَاصِد) ও 'শরী'আহ্' (شَرِيعَة)-এর সমন্বয়ে গঠিত। 'মাকাসিদ' শব্দটি 'মাকসাদ' বা 'মাকসিদ' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গন্তব্য, তাৎপর্য, মর্ম, বক্তব্য

---

[১]Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, The International Institute of Islamic Thought, London, 2008, p. 16-17.

www.pathagar.com

ইত্যাদি। এসবের মধ্যে প্রধানতম অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। আর শরী'আহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ দীন, পথ, জীবনব্যবস্থা, নিয়মনীতি ইত্যাদি। সুতরাং মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্'র অর্থ করা যায়–শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আরবিতে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য 'হাদাফ (هَدَفٌ) শব্দটিও ব্যবহার করা হয়, যার বহুবচন আহদাফ। এর অর্থ উদ্দেশ্য বা সুউচ্চ ভিত্তিভূমি বা বালিয়াড়ির শীর্ষদেশ বা পর্বতের চূড়া।

মাকসাদ-এর মূল 'কাসদ' ধাতু থেকে নির্গত শব্দগুলো যেসব অর্থে আল কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো :

ক. ন্যায়বিচার, মধ্যমপন্থা বা দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অবস্থান : যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে, (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) 'পদচারণায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।'[১] (وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) 'তাদের কেউ মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী।'[২]

খ. সঠিক বা সরল পথ: যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে, (وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) 'সরল পথ আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায়।'[৩]

গ. সহজ বা হালকা : যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে, (لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ) 'আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করত।'[৪]

ঘ. কোনো উদ্দেশ্যে কারো কাছে যাওয়া : যেমন হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, (فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ) 'উসমান রা. যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন তখন আমি তার নিকট গেলাম।'[৫]

২. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ক'টি প্রামাণ্য সংজ্ঞা

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ হলো সেই সকল কল্যাণমুখী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যর সমষ্টি, শর'ঈ হুকুম মেনে চলার মাধ্যমে বান্দাহ্দের জন্য যা অর্জিত হওয়ার ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা করেন।[৬] মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ক'টি প্রামাণ্য সংজ্ঞা হলো :

---

[১]আল কুরআন, ৩১ : ১৯।
[২]আল কুরআন, ৩৫ : ৩২।
[৩]আল কুরআন, ১৬ : ০৯।
[৪]আল কুরআন, ০৯ : ৪২।
[৫]সহিহ আল বুখারি, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, বাবু মানাকিবি উসমান বিন আফ্ফান...।
[৬]ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, ইসলামী শরী'আহ্ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী আইন ও বিচার, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৭, পৃ. ১৪।

www.pathagar.com

এক. ইমাম আবু হামিদ আল গাযালি র. বলেন,

The very objective of the Shari`ah is to promote the well-being of the people, which lies in safeguarding their faith, their lives, their intellect, their posterity and their wealth. Whatever ensures the safeguarding of these five serves public interest and is desirable, and whatever hurts them is against public interest and its removal is desirable.[১]

অর্থাৎ, 'শরী'আহ্র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের আকিদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করা। যা কিছু এই পাঁচটি জিনিসের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে তা-ই জনকল্যাণকর ও কাম্য। অপরদিকে যা এগুলোর ক্ষতি করে তা অকল্যাণকর এবং এর দূরীকরণই কাম্য।'

দুই. ইমাম আবু ইসহাক শাতিবি র. বলেন,

The primary goal of the Shari`ah is to free man from the grip of his own whims, so that he may be the servant of Allah by choice, just as he is His slave no choice.[২]

অর্থাৎ, 'শরী'আহ্র প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে তার খেয়ালখুশির বন্ধন থেকে মুক্ত করা, যাতে সে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র বান্দাহ্য় পরিণত হতে পারে, যেভাবে সে বাধ্যগতভাবে তাঁর বান্দাহ্ হয়ে আছে।'

তিন. তিউনিসিয়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত ইবনে আশুর বলেন,

The overall objective of Islamic legislation is to preserve the social order of the community and insure its healthy progress by promoting the well-being and virtue of the human being. The well-being *(Salah)* of human beings consists of the soundness of their intellects and the righteousness of their deeds, as well as the goodness of the things of the world in which they live that are put at their disposal.[৩]

অর্থাৎ, 'ইসলামী শরী'আহ্র সার্বিক উদ্দেশ্য হলো মানবসমাজের শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করা এবং মানবজাতির কল্যাণ ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তাদের

---

[১] Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustasfa min `Ilm al-Usul, Al-Maktabah Al-Tijariyyah, Cairo, 1973, v-1, p. 139-140.

[২] Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of the Islamic Law: The Methodology of Ijtihad, The Other Press, Kuala Lumpur, 2002, p. 235.

[৩] Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, Treatise on Maqasid al-Shari`ah, trans. and annotated by Muhammad El-Tahir El-Misawi, The International Institute of Islamic Thought, Washington, 2006, p. 91.

www.pathagar.com

সার্বজনীন ও সার্বক্ষণিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। মানুষের কল্যাণ গঠিত হয় তাদের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা, কর্মের যথার্থতা এবং যেখানে সে বসবাস করে সেখানকার পার্থিব বস্তুনিচয়ের উত্তমতার দ্বারা।'

চার. ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, 'মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা এবং ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করা।'[১]

পাঁচ. ড. মুহাম্মদ সা'দ আল ইয়ুবি বলেন, 'মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ হলো সেই উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও হিকমত, যা শরী'আহ্ প্রণয়নকালে শরী'আহ্ প্রণেতা লক্ষ্য রেখেছেন।[২]

ছয়. প্রফেসর ড. আহমাদ রাইসুনি বলেন, 'সকল মানুষের কল্যাণার্থে যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শরী'আহ্ প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোই হলো মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্।'[৩]

৩. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ক্রমবিকাশ

হিজরি প্রথম তিন শতকে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো আলোচনা নজরে পড়ে না। এ সময় মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র তাত্ত্বিক দিকটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত না হলেও রাসূলুল্লাহ্ স., তাঁর সাহাবি ও তাবেয়িগণের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে তাঁদের কার্যক্রমে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

পূর্ববর্তী মুসলিম পণ্ডিতগণ মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র কোনো সূক্ষ্ম পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান না করলেও বিষয়টি তাঁদের জানা ছিল। তাঁরা মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র বিভিন্ন বিষয়, যেমন হিকমত বা প্রজ্ঞা, ইল্লত বা কার্যকারণ, মাসালিহ্ বা কল্যাণ, মাফাসিদ বা অকল্যাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।[৪] কিয়াস, ইসতিহসান, মাসলাহা ইত্যাদির মাধ্যমে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে তাঁরা মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ব্যবহার করেছেন।

হিজরি চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে আবু আবদিল্লাহ আত-তিরমিযি আল হাকিম (মৃ. ২৯৬ হি./৯০৮ খৃ.) তাঁর স্বরচিত 'আস সালাহ্ ওয়া মাকাসিদুহা' (সালাত এবং তার উদ্দেশ্য) শীর্ষক গ্রন্থে মাকাসিদ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। তিনি হজ্বের উদ্দেশ্য নিয়ে অনুরূপ আরো একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার নাম ছিল 'আল-হজ্ব ওয়া আসরারুহ্'।

---

[১] জহিরউদ্দিন ইবনে আবদির রহমান, মাকাসিদুশ শরী'আহ্ ফি আহকামিল বুয়ু', ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি প্রেস, মালয়েশিয়া, ২০১১, পৃ. ১৩।

[২] ড. মুহাম্মদ সা'দ আল ইয়ুবি, মাকাসিদুশ শরী'আহ্ আল ইসলামিয়াহ্, পৃ. ২৭।

[৩] ড. আহমদ রাইসুনি, নাযরিয়াতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশ শাতিবি, আইআইআইটি, ওয়াশিংটন, পৃ. ৭।

[৪] ড. মুহাম্মদ সা'দ আল ইয়ুবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

www.pathagar.com

আবু যায়েদ আল বলখি (মৃ. ৩২২ হি./৯৩৩ খৃ.) মু'আমালাহ্‌সংক্রান্ত বিষয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম ছিল 'আল ইবানাহ্ 'আন 'ইলাল আল-দিয়ানাহ্' (Revealing Purposes in Religious Practices)। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামের বিচারসংক্রান্ত বিধিবিধানের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি অবশ্য মাসলাহা বা কল্যাণসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অন্য আরো একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার নাম ছিল 'মাসালিহ্ আল আবদান ওয়া আল আনফাস (শরীর ও আত্মার কল্যাণ)। এ গ্রন্থে ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধানের অনুশীলন কীভাবে মানুষের স্বাস্থ্য, শরীর ও মানসিকতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্‌কে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন ইমামুল হারামাইন আবু আল-মা'আলি আল-জুয়াইনি (মৃ. ৪৭৮ হি./১০৮৫ খৃ.)। সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর 'আল বুরহান ফি উসূল আল ফিকহ' গ্রন্থে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্‌র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'প্রয়োজনীয়তার স্তর' (levels of necessity)-কে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। ভাগগুলো হলো, জরুরিয়াত, হাজিয়াত ও তাহসিনিয়াত। তাঁর এ শ্রেণিবিন্যাস বর্তমান যুগের পণ্ডিতগণের নিকটও গুরুত্বের সাথে গৃহীত হচ্ছে। তিনি ইসলামী শরী'আহ্‌র পাঁচটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো, মানুষের বিশ্বাস, জীবন, বিবেক, বংশ ও সম্পদ রক্ষা করা।[১]

ইমাম আবু হামিদ আল গাযালি (মৃ. ৫০৫ হি./১১১১ খৃ.) তাঁর শিক্ষক আল জুয়াইনি'র তত্ত্বের উন্নতি বিধানে প্রচুর লেখালেখি করেন। তিনি তাঁর 'আল মুসতাশফা' ও 'শিফা আল গালিল' গ্রন্থে মাসলাহা বা জনস্বার্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি মাসলাহা বা জনকল্যাণকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে, শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই কেবল মাসলাহাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তিনি তাঁর শিক্ষক আল-জুয়াইনির মতোই পূর্বোক্ত পাঁচটি বিষয়কে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্‌র অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পরবর্তীকালে বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিতগণের মধ্যে আল ইয্য ইবনে আবদুস সালাম (মৃ. ৬৬০ হি./১২০৯ খৃ.) তাঁর 'কাওয়াইদ আল আহকাম ফি মাসালিহ্ আল আনাম', শিহাব আল-দীন আল-কারাফি (মৃ. ৬৮৪ হি./১২৮৫ খৃ.) তাঁর 'আল ফুরুক' (The Differences), শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম (মৃ. ৭৮৪ হি./১৩৪৭ খৃ.) তাঁর 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন', আবু ইসহাক আল শাতিবি (মৃ.

---

[১]Al-Juwayny, al-burhan, vol.2, p. 621, 22, 747; Jasser Auda, Ibid, p.17.

www.pathagar.com

৭৯০ হি./১৩৮৮ খৃ.) তাঁর 'আল-মুওয়াফাকাত ফি উসূল আশ্ শরী'আহ্' গ্রন্থে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্কে অতীব গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন।

আধুনিক ইসলামী স্কলারদের মধ্যে রশিদ রিদা (মৃ. ১৯৩৫ খৃ.), আত তাহির ইবনে আশুর (মৃ. ১৯০৭ খৃ.), মুহাম্মদ আল গাযালি (মৃ. ১৯৯৬), ড. ইউসুফ আল কারযাভি (১৯২৬ খৃ.), ত্বহা আল আওয়ানি (১৯৩৫ খৃ.) প্রমুখ পণ্ডিতগণ মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি করেছেন।

৪. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র প্রামাণিকতা

মহান আল্লাহ্ প্রজ্ঞাবান। তাঁর কোনো সৃষ্টিই উদ্দেশ্য ও অর্থহীন নয়। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে, وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِينَ—'আমি আসমান ও যমিন এবং এদের মধ্যবর্তী কোনো জিনিসই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' مَا خَلَقْنٰهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ —'আমি এ দুটিকে যথাযথ উদ্দেশ্যে ছাড়া সৃষ্টি করিনি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।'[১] ইসলামী শরী'আহ্ও আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি তাই নিঃসন্দেহে এরও কতগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে। নিচে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ্র আরো কিছু দলিল-প্রমাণ তুলে ধরা হলো :

৪.১. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পক্ষে কুরআনের দলিল

৪.১.১. কল্যাণ সাধন ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য : মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের জন্যই প্রণীত হয়েছে ইসলামী শরী'আহ্। এর একটি বড় প্রমাণ হলো শরী'আহ্র মূল উৎস কুরআন ও এর উপস্থাপক নবী করিম স.-কে রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করা। যেমন, শরী'আহ্র মূল উৎস আল কুরআন ও প্রধান উপস্থাপক মুহাম্মদ স.-কে রহমত হিসেবে উল্লেখ করে আল কুরআনে বলা হয়েছে, قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ —'তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মু'মিনের জন্য হিদায়াত ও রহমত।'[২]

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ—'আমি তো তোমাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।'[৩]

আল কুরআনে উল্লিখিত প্রথম আয়াতে কুরআন ও দ্বিতীয় আয়াতে মহানবী স.-কে 'রহমত' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর রহমতের ভিত্তি হলো, কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতির প্রতিরোধ করা।

---

[১]আল কুরআন, ৪৪ : ৩৮-৩৯।

[২]আল কুরআন, ১০ : ৫৭।

[৩]আল কুরআন, ২১ : ১০৭।

www.pathagar.com

৪.১.২. মুসলিম জাতি প্রেরণের উদ্দেশ্য : মুসলিম জাতিকে প্রেরণ করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ—'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান করবে কল্যাণের দিকে এবং আদেশ দেবে ভালো কাজের ও নিষেধ করবে অন্যায় কাজের, আর তারাই হবে সফলকাম।'[১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ—'তোমরাই হলে উত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা ভালো কাজের আদেশ করো এবং খারাপ কাজের নিষেধ করো।'[২]

৪.১.৩. সংকীর্ণতা দূরা করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য : ইসলামী শরী'আহ্র একটি উদ্দেশ্য হলো সংকীর্ণতা দূর করা। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ—'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে।'[৩]

৪.১.৪. কঠোরতা পরিহার করার উদ্দেশ্য : ইসলামী শরী'আহ্র একটি উদ্দেশ্য হলো কঠোরতা পরিহার করা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ—'আল্লাহ্ তোমাদের সাথে কোমল নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না।'[৪]

৪.২. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পক্ষে সুন্নাহ্র দলিল

৪.২.১. উপকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রিয় : মানুষের কল্যাণ সাধন করা শরী'আহ্র একটি উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের ইঙ্গিত রয়েছে হাদিসে। যেমন বলা হয়েছে, الخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ— অর্থাৎ, 'সমস্ত মাখলুক আল্লাহ্র পরিবার, তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট অধিক

---

[১]আল কুরআন, ৩ : ১০৪।
[২]আল কুরআন, ৩ : ১১০।
[৩]আল কুরআন, ৫ : ৬।
[৪]আল কুরআন, ২ : ১৮৫।

www.pathagar.com

প্রিয় সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের অধিক উপকারকারী।'[১] এ হাদিসে বান্দাহ্‌র উপকার সাধন ও সেবা করাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা ও তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৪.২.২. কষ্ট দূর করা ঈমানের অংশ : কষ্ট দূর করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُونَ شُعْبَةً ، أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ-

অর্থাৎ, 'ঈমানের সত্তরেরও বেশি শাখা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাখা হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালিমার সাক্ষ্য দেয়া, আর সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো।'[২] এ হাদিসে দীনের দুটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো তাওহিদ। এটি ঈমানের সূচনা বিন্দু। আর দ্বিতীয়টি হলো সৃষ্টিকুলের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া। তিনি আরো বলেন,

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

অর্থাৎ, 'মানুষের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের অস্তিত্ব তার জন্য সাদকাহ্‌স্বরূপ। নিত্য দিনের সূর্যোদয়ে দুই জিনিসের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সাদকাহ্। কোনো ব্যক্তিকে মালপত্র তার বাহনে ওঠানো-নামানোর ব্যাপারে সহায়তা দান করা সাদকাহ্। ভালো কথা বলা সাদকাহ্। সালাতের উদ্দেশ্যে পথচলার প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকাহ্। পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সাদকাহ্।'[৩]

৪.২.৩. মানুষের কল্যাণ কামনা দীন : মানুষের কল্যাণ সাধন প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, الدِّينُ النَّصِيحَةُ —দীন হলো কল্যাণ কামনা করা।'[৪]

৪.২.৪. ক্ষতি দূর করা শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য : ক্ষতি দূর করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ—'ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং ক্ষতি করো না।'[৫]

---

[১]কানযুল উম্মাল, ফাতহুল কাদির, জামে সগির।

[২]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি আদাদিল ঈমান ওয়া আফদালিহা ওয়া আদনাহা... ও সুনানু আবি দাউদ, ইবনে মাজাহ ও নাসাঈ।

[৩]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার, বাবু মান আখজা বিররিকাবি ওয়া নাহবি এবং কিতাবুস সুলহি, বাবু ফাজলিল ইসলাহি... ও সহিহ মুসলিম।

[৪]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল ঈমান, বাবু কাওলিন নাবী আদদীনু আন্নাসিহাহ।

[৫]ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আহকাম, বাবু মান বানা ফি হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বি জারিহি।

www.pathagar.com

৪.২.৫. কষ্ট দূরা করার নীতি : রাসূলুল্লাহ্ স. মুসলমানদের সকল কষ্ট ও বিপর্যয়ের পথ বন্ধ করে দিতে চান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِي لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ-

অর্থাৎ, 'আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে যদি এই আশঙ্কা না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।'[১]

৪.৩. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পক্ষে ইজমার দলিল

ইসলামী শরী'আহ্র যেসব রীতিনীতির ওপর ঐকমত্য বা ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ভিত্তিতে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র দলিল-প্রমাণ গ্রহণ করা যায়। এসব রীতিনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। আর শরী'আহ্র উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা। এ ক্ষেত্রে সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম তাঁর 'আল মাকাসিদুল আম্মাতু লিশ্ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ্' ও মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূলে ফিকহের শিক্ষক ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল 'আতি মুহাম্মদ 'আলী, তাঁর 'আল মাকাসিদুশ্ শারী'আহ্ ওয়া আসারুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী' গ্রন্থে এ বিষয়ে কতগুলো নিয়ম তুলে ধরেছেন। তা থেকে দুটি নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো :

৪.৩.১. প্রথম নিয়ম : শরী'আহ্ প্রণেতা কর্তৃক নিষিদ্ধ পাপ কাজগুলোকে সগিরা ও কবিরা নামে ভাগ করা হয়েছে। আর এ শ্রেণিকরণ পাপের মাত্রা ও তারতম্য অনুসারে করা হয়ে থাকে। এ শ্রেণিকরণ অধিকাংশ আলিমের কাছেই স্বীকৃত ও গৃহীত।

এ কথা আল কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং সহিহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, গোনাহ্ বা পাপকাজের শ্রেণিকরণ পাপকারীর ওপর পাপের অনিষ্টকর প্রভাবের তারতম্য অনুযায়ী নির্ণীত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নবী করিম স. কর্তৃক চিহ্নিত সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের কথা বলা যায়। তিনি বলেছেন : 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে দূরে থাকো। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সেগুলো কি? তিনি বললেন : আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা।'[২]

---

[১]সহিহ্ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস্‌সিওয়াক।
[২]সহিহ্ আল বুখারি, কিতাবুল ওসায়া, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা ইন্নাল্লাজিনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা জুলমান।

www.pathagar.com

উল্লিখিত মাত্রার পাপগুলো ছাড়া অন্যান্য পাপকে আল কুরআন 'সাইয়্যিয়াত' তথা ছোট গোনাহ্ এবং 'লামাম' বা সামান্য অপরাধ নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে : إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا—'তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।'[১]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন : الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ—'যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে ছোটখাট অপরাধ করলেও তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম।'[২]

আল কুরআন ও হাদিসে যেসব গোনাহের উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে আলিমগণ গোনাহের মাত্রা ও তারতম্য অনুযায়ী সকল গোনাহকে কবিরা ও সগিরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা হাদিসে বর্ণিত সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের অনুরূপ এমন কতিপয় অপরাধের কথা বর্ণনা করেছেন যেগুলো সগিরা হওয়া সত্ত্বেও প্রমাণিত কবিরা গোনাহের নিকটবর্তী করে দেয়। যেমন ইয্য ইবনে আবদুস সালাম তাঁর 'কাওয়ায়েদুল আহকাম' গ্রন্থে বলেছেন : কবিরা ও সগিরার মধ্যে পার্থক্য জানতে হলে দলিল দ্বারা প্রমাণিত কবিরা গোনাহের ক্ষতিকর বিষয় ও বিপর্যয়গুলো তুলে ধরতে হবে। কোনো গোনাহের ক্ষতিকর প্রভাব কবিরা গোনাহের প্রভাবের চেয়ে কম হলে তা সগিরা আর কবিরা গোনাহের ন্যূনতম ক্ষতির সমান হলে কিংবা তার চেয়ে বেশি হলে তা কবিরা গোনাহ্ হিসাবে গণ্য হবে। তিনি আরো বলেন : আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূলকে গালি দেয়া, রাসূলের অবমাননা করা কিংবা আল্লাহ্ ও রাসূলের মধ্যে কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, কাবাঘরকে দুর্গন্ধময় করা অথবা আবর্জনার স্তূপে কুরআন নিক্ষেপ করা ইত্যাকার কাজ সবচেয়ে বড় গোনাহ্। অথচ শরী'আহ্ প্রণেতা সুস্পষ্টভাবে এগুলোকে কবিরা গোনাহ্ হওয়ার কথা বলেননি। এমনিভাবে একজন সতী-সাধ্বী মহিলাকে ধর্ষণের জন্য আটকে রাখা কিংবা হত্যার উদ্দেশ্যে কোনো মুসলমানকে আটকের ক্ষতিকর পরিণতি এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার চেয়েও ভয়াবহ। কিন্তু এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করাকে কবিরা গোনাহ্ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও অন্যগুলোকে সুস্পষ্টভাবে কবিরা গোনাহ্ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপভাবে কাফিররা যদি মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে

---

[১]আল কুরআন, ৪ : ৩১।
[২]আল কুরআন, ৫৩ : ৩২।

www.pathagar.com

উৎখাত করে, তাদের সকলকে গালিগালাজ করে, তাদের ধনসম্পদ লুট করে, তাদের মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, তাহলে তাদের এ ধরনের অপতৎপরতার ক্ষতিকর পরিণতি যুদ্ধের মাঠ থেকে বিনা কারণে পলায়ন করার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর, যদিও যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা কবিরা গোনাহ্।[১]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পাপ কাজের ক্ষতিকর পরিণতি ও ভয়াবহতার মাত্রানুসারে পাপকাজকে কবিরা ও সগিরা গোনাহের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও সে কাজটি কুরআন-সুন্নাহ্তে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকে। অনুরূপভাবে সৎ ও নেক কাজের পরিণতির ভিত্তিতেই সে কাজের মান ও স্তর নির্ণীত হয়ে থাকে। কোনো ভালো কাজের পরিণতি কল্যাণমুখী হলে তার গুণগত মানের তারতম্য অনুসারে তাকে উত্তম ও সর্বোত্তম দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

পাপ কাজের এ ধরনের বিভক্তিকরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য কল্যাণ ও অকল্যাণের ছোটবড়'র তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই যখন কাজের কল্যাণ ব্যাপক হয় তখন তা অর্জন করার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং তা অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিরর্থক ঘোরাফেরা করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মানব কল্যাণের হিফাযত এবং আসন্ন বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য শরী'আহ্র আগমন ঘটেছে।

৪.৩.২. দ্বিতীয় নিয়ম : লেনদেন ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রণীত বিভিন্ন হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে ইজমার ভিত্তিতে বিভিন্ন শর্তের কথা বলা হয়েছে। আর এসব শর্ত ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন কল্যাণ সাধনের জন্য করা হয়েছে। যেমন, ইজারাদারি, পশুপালন ও চাষাবাদের চুক্তি করলে মেয়াদ নির্দিষ্ট করতে হয় এবং বিবাহের ক্ষেত্রে তালাকের অবকাশ রাখতে হয়। কারণ, এ ধরনের চুক্তির মাধ্যমে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য মেয়াদ নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। বিপরীত পক্ষে বৈবাহিক চুক্তির ক্ষেত্রে সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করা ক্ষতিকর। কারণ, বৈবাহিক চুক্তির লক্ষ্য হলো বংশ সংরক্ষণ করা। অন্য দিকে অস্তিত্বহীন বস্তুর বেচাকেনা ও ইজারা দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ এ ধরনের লেনদেন ও চুক্তির মধ্যে প্রতারণা ও ফাসাদের আশঙ্কা রয়েছে। এভাবে চুক্তির বিভিন্নতার ফলে শর্তাবলি বিভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেক চুক্তির উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট কল্যাণ সাধন করা।[২]

---

[১]ইয্য ইবনে আবদুস সালাম, কাওয়ায়েদুল আহকাম, খ. ২, পৃ. ১৪৩।

[২]ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, আল-মাকাসিদুল আম্মা লিশ-শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ। আরো দেখুন, ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, ২০০৬, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

৪.৪. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পক্ষে আকলি বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল

মহাবিশ্বের কোনোকিছুই লক্ষ্যহীন নয়। এমনকি মানুষ যা করে তার পেছনেও রয়েছে কোনো-না-কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইসলামী শরী'আহ্ মহান আল্লাহ্র বিধান, কাজেই এরও রয়েছে কতগুলো মহৎ উদ্দেশ্য। যেমন ইসলামী শরী'আহ্র প্রধান উৎস আল কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ—'এ গ্রন্থ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।'[১] ফলে প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্র বিধান কখনই অর্থহীন হতে পারে না।

ইসলামী শরী'আহ্ আল্লাহ্প্রদত্ত বিধান হওয়ার কারণে এটি অবশ্যই হিকমতপূর্ণ ও কল্যাণকর। ইসলামের আগমনের পূর্বেও আরব-জাহানে নানা ধরনের আইন, বিধিবিধান ও রেওয়াজ প্রচলিত ছিলো। যদি সেগুলো দিয়েই মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা যেত, তাহলে ইসলামের প্রয়োজন হতো না। প্রকৃতপক্ষে সেগুলো মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে ইসলামী শরী'আহ্ এসেছে সেই ব্যর্থতা দূর করে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করার জন্য।

৫. ইসলামী শরী'আহ্র বিভিন্ন বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও কল্যাণ

মহান আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং অনুগ্রহ করে তাদেরকে শরী'আহ্ নামের এক মহান জীবনবিধান দান করেছেন। এ বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়া। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে আবাদ করার জন্য মানুষকে পৃথিবীতে খলিফা করে পাঠিয়েছেন। খলিফা বা প্রতিনিধির গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তাকে দেয়া হয়েছে শর'ঈ বিধান। যে ব্যক্তি এ বিধিবিধান মেনে চলবে সে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ করে চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'যে আমার সৎপথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। আর যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।'[২]

এখানে ইসলামী শরী'আহ্র বিধানাবলি থেকে ক'টির উদ্দেশ্য-লক্ষ্য আলোচনা করা হলো :

৫.১. সালাতের উদ্দেশ্য : সালাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। সালাত আদায়ের মাধ্যমে বান্দাহ্ আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি শারীরিক পবিত্রতা ও সুস্থতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, নেতা নির্বাচন, নেতার আনুগত্য প্রদর্শন, উম্মাহ্র ঐক্য ইত্যাদি অর্জন করতে পারে।

---

[১]আল কুরআন, ৪৫ : ২।

[২]আল কুরআন, ২০ : ১২৩-১২৪।

www.pathagar.com

সালাতের যে আকৃতি ও রূপ রয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের একত্রে হাজির হওয়ার যে বিধান রয়েছে, এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের পরিশুদ্ধ হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। সালাতের মধ্যে নিহিত বহুবিধ কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ্ বলেন : إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ —'নিশ্চয় সালাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[১]

জুমু'আর সালাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'যখন জুমু'আর আযান দেয়া হয় তখন তোমরা সালাতের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বন্ধ করে দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, অবশ্য যদি তোমারা উপলব্ধি করো।'[২]

সালাত তার আদায়কারীকে সময়সচেতন, আনুগত্যশীল করে তোলে। অনেক সময় সামরিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও সালাতের মতো এতো সময়সচেতনতা ও শৃঙ্খলা লক্ষ করা যায় না। সালাতের জামা'আতের বাহ্যিক দৃশ্য দেখেও অনেকটা সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মতোই মনে হবে। এ কারণেই কাদিসিয়ার যুদ্ধের সময় কতক অগ্রবর্তী পারসিক সৈন্যদের নেতা দূরে সালাত আদায়রত মুসলিম সৈন্যদের দেখে বলে উঠেছিলেন, 'ঐ দেখ, মুসলিমরা তাদের সামরিক রুটিন পালন করছে।'[৩]

সালাত বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী। জীবনের প্রয়োজনে মানুষকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় কিন্তু সালাত তাদেরকে আবার একত্র করে। সালাতের জামা'আত সামাজিক সম্প্রীতির এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করে। সালাত সমঝোতা, সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাঠশালা হিসেবে কাজ করে থাকে। জুমু'আ ও ঈদের সালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খুৎবা বা ভাষণ, এটি মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহ তৈরি করতে পারে। জনগণকে সচেতনপূর্বক জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এই ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণসংযোগের বিষয়টি উঠে আসে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর ঈদের মাঠে যাতায়াতের বর্ণনা থেকে। তিনি ঈদের মাঠে এক রাস্তা দিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। অন্যান্য দিন উট কিংবা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করলেও ঈদের দিন পায়ে হেঁটে যেতেন। এর প্রধান কারণ ছিলো মানুষের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এবং তারা যাতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারে সে সুযোগ সৃষ্টি করা।

---

[১]আল কুরআন, ২৯ : ৪৫।

[২]আল কুরআন, ৬২: ৯।

[৩]আলিয়া আলি ইজেতবেগোভিচ, সাবেক প্রেসিডেন্ট, বসনিয়া হারজেগোভিনা, ইসলামী রাজনীতি, দৈনিক সংগ্রাম, জানুয়ারি ২০০৮।

www.pathagar.com

৫.২. সিয়াম বা রোযার উদ্দেশ্য : সিয়াম বা রোযা একটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। এর মধ্যেও রয়েছে মানুষের ব্যাপক কল্যাণ। সিয়াম ফরয করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মুত্তাকি করে তোলা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তোমাদের ওপর সিয়াম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।'[১] সিয়ামের মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে আরো বলা হয়েছে, 'যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। (وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ) আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে।'[২]

সিয়াম পালনকারী এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি পার্থিব কল্যাণও অর্জন করে থাকে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'যে সাওম মানুষকে খারাপ কথা ও কাজ থেকে দূরে রাখতে পারে না সে সাওমের কোনো মূল্য নেই আল্লাহ্র কাছে।'[৩] এ হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই মুসলমানগণ সাওম পালন করে থাকে কিন্তু এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ে মানুষের সামাজিক জীবনের ওপরে। তাই বলা যায়, সিয়াম মানুষের সামগ্রিক পরিশুদ্ধিরই নিয়ামক।

সিয়ামের মধ্যে নিহিত কল্যাণ সম্পর্কে ইমাম গাযালি র. বলেছেন, 'রূহানি রোগের চিকিৎসা করে এক আল্লাহ্র সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি তাক্বওয়ামণ্ডিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যই সিয়াম ফরয করা হয়েছে।'[৪]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. সিয়ামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, 'সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক অভ্যাস থেকে মুক্ত করা এবং জৈবিক চাহিদাসমূহের মধ্যে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করা। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন করে, চিরন্তন জীবনের অনন্ত সফলতার স্বর্ণ-শিখরে আরোহণ করে। পশুত্ব নিস্তেজের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব জাগ্রত

---

[১] আল কুরআন, ২ : ১৮৩।

[২] আল কুরআন, ২ : ১৮৪।

[৩] সহিহ আল বুখারি, কিতাবুস সাওম, বাবু মান লাম ইয়াদা'আ কাওলায যুরি ওয়াল আমালা বিহি ফিস সাওম।

[৪] ইমাম গাযালি র., এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, খ. ১, পৃ. ২১১। উদ্ধৃত : এ. কে. এম. ফজলুল হক, রোযার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য, সিয়াম ও রমযান শীর্ষক অগ্রপথিক সংকলন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৫, পৃ. ১২২।

www.pathagar.com

করে। দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। সিয়াম মানুষের শারীরিক ও আত্মিক শক্তির উন্নতি সাধন করে। পাশবিক চাহিদার প্রাবল্য, যা মানুষের স্বাস্থ্য ধ্বংস করে তা থেকে মুক্তিদান করে।'[১]

৫.৩. যাকাতের উদ্দেশ্য : যাকাত ইসলামের এক অনন্য মৌলিক বিষয়। আল কুরআনে সালাত ও যাকাতকে আটাশ স্থানে এবং হাদিসে এ দুটিকে কমপক্ষে দশ-দশটি স্থানে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতে ইবাদতের ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তাতে একটা মানবিক কল্যাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে আছে। এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিককেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় যেমন, তেমনি নয় নিছক সামষ্টিক। তার অনেকগুলো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রতিভাত হয়, সে যাকাতদাতা হোক কি গ্রহীতা। আবার তার অনেকগুলো ভাবধারা মুসলিম সমাজে প্রতিফলিত হয় তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে, কল্যাণময় দায়িত্বের সম্প্রসারণে এবং তার সমস্যাসমূহ সুষ্ঠু সমাধানে।[২] যাকাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আরো ক'টি হলো :

৫.৩.১. দারিদ্র্য বিমোচন ও অভাবীদের চাহিদা পূরণ : এ ক্ষেত্রে যাকাতকে ইতিহাসের প্রথম উদ্যোগ বলে মনে করেন ইতিহাসবিদগণ। ইসলামের আগমনের পূর্বেও ভিক্ষাবৃত্তির প্রচলন ছিলো কিন্তু দরিদ্র মানুষের অভাব মোচনের জন্য যাকাতের মতো বাধ্যতামূলক কোনো ব্যবস্থার প্রচলন ছিলো না। ইসলামে যাকাত আদায় ও বণ্টনের যে নির্দেশনা রয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, দারিদ্র্যের অভাব মোচনের জন্য যাকাত ফরয করা হয়েছে।

ফকির, মিসকিন, এতিম, বিধবা, বয়সের ভারে বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, অন্ধ, অসুস্থ ও অসহায়-অক্ষমদের কথা ইসলাম ভুলে যায়নি। আল্লাহ্ তাদের জন্য ধনীদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট হক বা অধিকার প্রদান করেছেন। তাই বলা যায়, যাকাতের প্রধান লক্ষ্য হলো দরিদ্রকে সচ্ছল করে দেয়া। ফকির ও মিসকিন হলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের প্রধান খাত। মহানবী স. কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল এ খাতটির কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রথমত এটিই যাকাতের উদ্দেশ্য।[৩] যেমন তিনি বলেছেন, 'ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তা ফকিরদের মাঝে ফিরিয়ে দাও।'[৪]

---

[১]আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র., যাদুল মা'আদ, খ. ১, পৃ. ১৫২।

[২]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামের যাকাত বিধান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯৩।

[৩]ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৯৯।

[৪]নাইলুল আওতার, খ. ২, পৃ. ১৬১।

www.pathagar.com

৫.৩.২. ধনীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সম্পদের পবিত্রতা বিধান : যাকাতের একটি উদ্দেশ্য হলো, যাকাতদাতার ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তার ধনসম্পদ পবিত্র করণ ও আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا—'তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ আদায় করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।'[১]

৫.৩.৩. সামাজিক সহযোগিতা ও সম্পর্দের আবর্তন : যাকাতের উদ্দেশ্যের আরো কতক দিক হলো ধনী ও গরিবের মাঝে সামাজিক সহযোগিতা সৃষ্টি করা, আয়বৈষম্য হ্রাস করা ও সম্পদের আবর্তন স্বাভাবিক রাখা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ—'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।'[২]

৫.৩.৪. সামষ্টিক কল্যাণ বৃদ্ধি : যাকাত উৎপাদন ও উন্নয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে সকলের সমগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. বলেন, 'সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ তার সামাজিক বৃহত্তর কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজনের কাছে যে অর্থ আছে তা যদি অন্য এক ভাইয়ের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয় তবে এ অর্থই আবর্তিত হয়ে অভাবিতপূর্ব কল্যাণ নিয়ে পুনরায় তার হাতেই ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে যদি সে তা নিজের কাছেই সঞ্চয় করে রাখে, কিংবা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থজনিত কাজে ব্যয় করে, তবে ফলত সে অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি এতিম শিশুকে যদি লালন-পালন করা হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে উপার্জনাক্ষম করা হয়, তবে তাতে সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয় করে এ কাজ করেছে সে তা থেকে অংশ লাভ করতে পারবে। কারণ, উভয় ব্যক্তিই একই সমাজের লোক।[৩]

৫.৪. হজ্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য : হজ্বের মধ্যে অসংখ্য ধর্মীয় উপকারিতার পাশাপাশি পার্থিব উপকারিতাও রয়েছে। হজ্বের উপকারিতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর লোকদেরকে হজ্ব করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানাও—তারা যেন তোমার কাছে আসে, পায়ে হেঁটে আসুক কিংবা দূরবর্তী স্থান থেকে

---

[১]আল কুরআন, ৯ : ১০৩।

[২]আল কুরআন, ৫৯ : ৭।

[৩]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

www.pathagar.com

কৃশ উটের পিঠে চড়ে আসুক। (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের দীন-দুনিয়ার কল্যাণের কত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে।'[১]

হজ্বের উপকারিতার আরো একটি হলো, 'যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্ব করে এবং এ ব্যাপারে সকল প্রকার লালসা এবং ফাসেকি থেকে দূরে থাকে সে সদ্যজাত শিশুর মতোই (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে।'[২]

হজ্ব মুসলিমদের জন্য এক বিশ্বসম্মেলন। হজ্বে এসে হাজ্বিগণ যেমন আল্লাহ্র প্রেমে উদ্ভাসিত হওয়ার সুযোগ পায়, তেমনি আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাহ্দের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে নিজেকে খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার প্রেরণা পায়। এ ছাড়া হজ্ব মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করে এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রেরণা যোগায়।

৫.৫. ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য : ইসলামী শরী'আহ্ প্রবর্তিত হয়েছে মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য। তাই শাস্তি আইনের মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দেয়া শরী'আহ্র উদ্দেশ্য নয়; বরং শাস্তিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য। আর সে কল্যাণ শুধু সে ব্যক্তির জন্য নয় যে অপরাধ করেছে; বরং তা গোটা মানবসমাজের জন্য। এ কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় মহান আল্লাহ্র বাণী থেকে। কিসাসের মধ্যে নিহিত কল্যাণ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ— 'কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন।'[৩]

মদপান, জুয়া খেলা, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য নির্ধারণের উপায়াদি নিষিদ্ধ করার মধ্যে নিহিত কল্যাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য পরীক্ষার উপায়াদি গ্রহণ শয়তানি কাজ। তোমরা সকলে এগুলো পরিহার করো। আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।'[৪]
ইসলামী শাস্তিবিধানের কতিপয় উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

৫.৫.১. মানুষের মৌলিক বিষয়সমূহের হিফাযত : জীবন, দীন, বংশ, বিবেক-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযত করার জন্যই মূলত ইসলামী শরী'আহ্র শাস্তিবিধান প্রবর্তিত হয়েছে। এগুলোর সংরক্ষণ ব্যতীত সমাজের সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করা যায় না। তাই এগুলোর ওপর কোনোরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপকে ইসলামী দণ্ডবিধিতে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে গণ্য করা

---

[১]আল কুরআন, ২২ : ২৭-২৮।
[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল হাজ্ব, বাবু ফাদলিল হাজ্জিল মাবরুর।
[৩]আল কুরআন, ২ : ১৭৯।
[৪]আল কুরআন, ৫ : ৯০।

www.pathagar.com

হয়েছে। মানুষের জন্য জরুরি এ বিষয়গুলো যাতে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকে এবং এর কোনো একটিও যাতে নষ্ট না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই ইসলামী শরী'আহ্‌র শাস্তিবিধান প্রণীত হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি এগুলোর ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করতে উদ্যত হবে, তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এমন কাজ করতে সাহস না পায়।

৫.৫.২. সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন : ইসলামী শাস্তি আইনের একটি উদ্দেশ্য হলো সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। এ কল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অন্যায়-জুলুমের বিস্তার ও ব্যাপকতা প্রতিরোধ এবং আইন অমান্য করার প্রবণতা রুদ্ধকরণ। কারো প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন বা কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ আদৌ শরী'আহ্‌র লক্ষ্য নয়। বস্তুত এ শাস্তি হচ্ছে রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ঔষধের মতো। জীবন রক্ষার জন্য যেমন পচে যাওয়া অঙ্গ কেটে ফেলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সমাজকে রক্ষার জন্য অপরাধীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়াও ঠিক তেমনি।[১]

অন্য দিকে কেউ অপরাধের শিকার হলে তার নফস অপরাধীর ওপর অসন্তুষ্ট থাকে। এ কারণে সমাজে বিরাজমান উত্তেজনা ও অপরাধ যেন আর শেষ হয় না। কাজেই অপরাধীর ওপর শাস্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অপরাধের শিকার ব্যক্তির মনসন্তুষ্টির মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৫.৫.৩. অপরাধীকে পবিত্রকরণ : ইসলামী শরী'আহ্‌তে অপরাধীর ওপর কোনোরূপ প্রতিহিংসা কিংবা শত্রুতা পোষণ করা হয় না; বরং শাস্তি কার্যকর করার পরও তাকে অত্যন্ত দয়া-অনুগ্রহ ও সম্মানের চোখে দেখা হয়। শাস্তি কার্যকরের পর তাকে অপরাধের দোষ থেকে মুক্ত করে ইসলামী শরী'আহ্ মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাকে এমন পরিবেশে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে সে স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হতে পারবে, মনে করতে পারবে যে, সে মনুষ্যত্বের মান থেকে নীচে নেমে যায়নি, সে সাময়িকভাবে ভুল করেছিল মাত্র এবং সে ভুলটা নিতান্তই মানবিক কারণে।

অধিকন্তু, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের যে শাস্তি দেয়া হয়, তা অপরাধীকে পরিশুদ্ধ করে, তার পাপ ধুয়ে-মুছে ফেলে এবং তাকে পরকালীন আযাব থেকে রক্ষা করে। এ কারণে অপরাধী শাস্তি ভোগ করার পরও নিজের মধ্যে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে। সমাজের প্রতি তার মনে কোনোরূপ আক্রোশ জাগে না। কেননা সে জানতে পারে যে, এ শাস্তি কারো মনগড়া নয়; তা আল্লাহ্‌র বিধান।

---

[১]ড. আহমদ আলী, ইসলামের শাস্তি আইন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

মানব রচিত আইনে প্রদত্ত শাস্তি এবং আল্লাহ্র আইনে প্রদত্ত শাস্তির মধ্যে এটাই পার্থক্য। মানুষের আইনে দণ্ডিত ব্যক্তির মনে সমাজ-সমষ্টির প্রতি প্রতিহিংসা জেগে ওঠে। আর আল্লাহ্র আইনে দণ্ডিত ব্যক্তির মনে আত্মোপলব্ধির সঞ্চার হয়।[১]

৫.৫.৪. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ : অপরাধীর ওপর শাস্তি বাস্তবায়ন করা হলে সে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে আর কোনো অপরাধ সংঘটিত করা থেকে দূরে থাকে। আর শাস্তিবিধান কার্যকর করা হলে প্রত্যক্ষদর্শীরা সচেতন হয় এবং অপরাধের অনুসারীরা তা করা থেকে বিরত থাকে।

৬. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র শ্রেণিবিভাগ

ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি ভাগের আবার উপ-বিভাগ রয়েছে। সাধারণত শরী'আহ্র উদ্দেশ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. মৌলিকত্বের দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য
খ. ব্যাপকতার দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য
গ. অকাট্যতার দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য

৬.১. মৌলিকত্বের দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য

মৌলিকত্বের দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য দু' প্রকার :

৬.১.১. মৌলিক উদ্দেশ্য (المَقَاصِدُ الأَصْلِيَّةُ) : শরী'আহ্র বিধিবিধান দ্বারা শরী'আহ্ প্রণেতা মূলগতভাবে যে উদ্দেশ্য বুঝিয়েছেন তাকে মৌলিক উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন, দীন, নফস, আকল, বংশ ও সম্পদ সংরক্ষণ করা ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

৬.১.২. অনুগামী বা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য (المَقَاصِدُ التَّبَعِيَّةُ): মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তাকারী উদ্দেশ্যকে আনুষঙ্গিক, অনুগামী বা গৌণ উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি করা। আর এক্ষেত্রে অনুগামী উদ্দেশ্য হলো, ভালোবাসা, বাসস্থান ও ইহকালীন-পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৬.২. ব্যাপকতা বা সার্বজনীনতার দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য

ব্যাপকতার দিক থেকে ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য দুই প্রকার :

---

[১]ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

৬.২.১. সার্বজনীন উদ্দেশ্য (المَقَاصِدُ العَامَّةُ) : সার্বিকভাবে যে সকল উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী শরী'আহ্ প্রণীত হয়েছে সেগুলোকে সার্বজনীন উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন, মানবতার কল্যাণ সাধন করা এবং অকল্যাণ, ক্ষতি ও কঠোরতা দূরীকরণ ইত্যাদি।

৬.২.২. বিশেষ উদ্দেশ্য (المَقَاصِدُ الخَاصَّةُ) : কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য যে উদ্দেশ্য রয়েছে তাকে বিশেষ উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্বের উদ্দেশ্য।

৬.৩. অকাট্যতার দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য

অকাট্যতার দিক থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য তিন প্রকার :

৬.৩.১. অকাট্য উদ্দেশ্য (المَقصَدُ القَطعِيُّ) : আল কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত উদ্দেশ্যকে অকাট্য উদ্দেশ্য বলা হয়। এর একটি উদাহরণ হলো মহান আল্লাহ্র বাণী : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ—'আল্লাহ্ তোমাদের সাথে কোমল নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না।'[১]

৬.৩.২. অকাট্য দলিলের নিকটতম (الظَّنِّيُّ قَرِيبٌ مِنَ القَطعِ) : সুন্নাহ্র মাধ্যমে প্রাপ্ত উদ্দেশ্যকে অকাট্য দলিলের নিকটতম উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং ক্ষতি করো না।'[২] এটি আল কুরআনের সমর্থনে অকাট্যতার নিকটবর্তী।

৬.৩.৩. ধারণামূলক উদ্দেশ্য (المَقصَدُ الظَّنِّيُّ) : অনুসন্ধান বা গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত উদ্দেশ্যকে ধারণামূলক উদ্দেশ্য বলা হয়। কেননা অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত উদ্দেশ্য অকাট্যতার মধ্যে শামিল নয়। যেমন, মদ হারাম হওয়ার ইল্লত বা কারণ হলো আকলকে হিফাযত করা। আর এটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করা হয়েছে বলে তা অকাট্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

৭. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র বিভিন্ন স্তর

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র তিনটি স্তর রয়েছে। যেখানে শেষ দুটি প্রথমটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। স্তরগুলো হলো : ক. জরুরিয়াত, খ. হাজিয়াত ও গ. তাহসিনিয়াত।

---

[১]আল কুরআন, ২ : ১৮৫।

[২]ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আহ্কাম, বাবু মান বানা ফি হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বি জারিহি।

www.pathagar.com

চিত্র-১

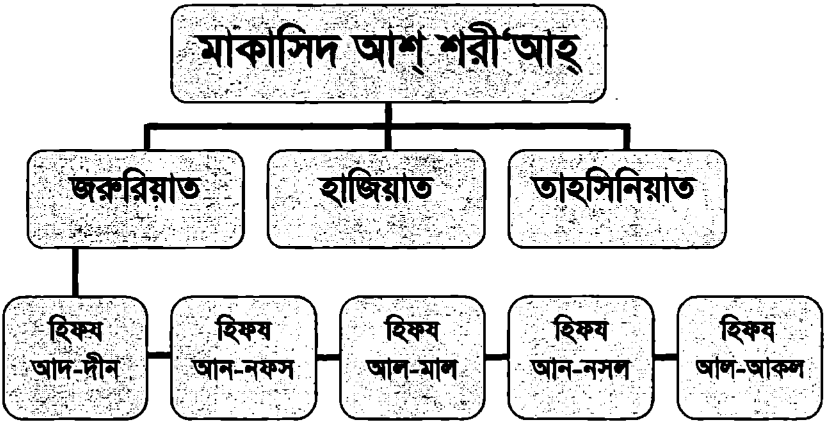

৭.১. জরুরিয়াত (الضَّرُوْرِيَاتُ) বা আবশ্যকীয়

আরবি 'জরুরিয়াত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো প্রয়োজনসমূহ, জরুরি বিষয়াদি, আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ইত্যাদি। দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ অর্জনের জন্য মানুষের জীবন যেসব আবশ্যকীয় বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং যেগুলো ছাড়া তাদের জীবন ধ্বংস, বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত হয়ে যায় সেগুলোকে ইসলামী শরী'আহ্‌র পরিভাষায় জরুরিয়াত বলা হয়।

মূলত দীন, নফস, আকল, সম্পদ ও বংশ এই পাঁচটি বিষয় হিফাযত করার জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন এবং এর জন্য শরী'আহ্ যেসব বিধান প্রবর্তন করেছে সেগুলো জরুরিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, নফসের জন্য জরুরি বিষয় হলো জীবন বাঁচানো এবং বিভিন্ন অঙ্গ ও বিষয়, যেগুলো ব্যতীত জীবন চলে না। সম্পদের দৃষ্টিতে জরুরি বিষয় হলো, যা ব্যতীত সম্পদ রক্ষা করা যায় না। ইসলামী শরী'আহ্ বিষয়ে অভিজ্ঞ ফকিহগণ বিভিন্নভাবে জরুরিয়াতকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এখানে তার ক'টি তুলে ধরা হলো :

ইমাম শাতিবি র. বলেছেন, জরুরিয়াত হচ্ছে সে সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, যেগুলোর অনুপস্থিতিতে দুনিয়ায় কল্যাণের সঠিক পথ ও গতিধারা ব্যাহত হয় এবং দেখা দেয় বিপর্যয়, সীমাহীন ক্ষতি ও প্রাণ হারানোর ঘটনা। আর আখিরাতে নাজাত ও নেয়ামাত হয় সুদূরপরাহত এবং ক্ষতি হওয়া অবধারিত হয়ে যায়।'[১]

---

[১]ইমাম শাতিবি র., আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ৮।

www.pathagar.com

আল্লামা ইবনে আশুর র. বলেছেন, 'জরুরিয়াত হলো এমন কতগুলো বিষয় যেগুলো একক কিংবা সম্মিলিতভাবে অর্জন করা কোনো সম্প্রদায়ের জন্য অপরিহার্য। আর এগুলোর মাঝে ত্রুটি দেখা দিলে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা যথার্থভাবে কার্যকর থাকবে না।'[১]

আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ বলেছেন, 'জরুরিয়াত বলতে এমন বিষয়কে বুঝায়, যার ওপর মানবজীবন দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের কল্যাণ ঠিক রাখার জন্য এ জাতীয় জিনিস অপরিহার্য। আর যদি এটি হারিয়ে যায় তাহলে তাদের জীবনের শৃঙ্খলায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়।'[২]

ইমাম শাতিবি র. ৫টি জিনিসকে জরুরিয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে শনাক্ত করেছেন।[৩] সেগুলো হলো :

ক. দীনের সংরক্ষণ করা (protection of faith)
খ. জীবন সংরক্ষণ করা (protection of life)
গ. বিবেকবুদ্ধি সংরক্ষণ করা (protection of intellect)
ঘ. বংশধারা সংরক্ষণ করা (protection of posterity)
ঙ. সম্পদ সংরক্ষণ করা (protection of wealth)

ইসলামী শরী'আহ্‌র উক্ত পাঁচটি মৌলিক ও চিরন্তন জরুরি বিষয় আল কুরআন থেকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের বর্ণনাটি হলো :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ-

অর্থাৎ, 'হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, এমন অপবাদ দেবে না যা তারা উদ্ভাবন করে তাদের হাত ও পায়ের মাঝখানে (জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আগত সন্তান বলে অপবাদ রটাবে না) এবং ভালো কাজে আপনার আবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'[৪]

---

[১]Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shariah, The International Institute of Islamic Thought, London, 2006, p. 118.

[২]উসূলুল ফিকহ, আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৯, পৃ. ৪৩।

[৩]ইমাম শাতিবি র., আল-মুওয়াফাকাত; ড. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইয়ুবি, মাকাসিদুশ-শরী'আহ্, পৃ. ১৮৩ ও ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

[৪]আল কুরআন, ৬০ : ১২।

www.pathagar.com

উক্ত আয়াতে কারিমা ছাড়াও এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্‌র বহু নির্দেশনা রয়েছে যেখানে উল্লিখিত পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে সংরক্ষণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এগুলোর একটি হলো মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

'আপনি বলুন, এসো আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। (সেগুলো হলো:) তোমরা তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাকে হত্যা করবে না।'[১]

উক্ত পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইমাম শাতিবি দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। প্রথমটি হলো উক্ত পাঁচটি জরুরি বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়টি হলো এর জন্য ক্ষতিকর সবকিছুকে কিছু পরিহার করা।[২] অর্থাৎ, মৌলিক পাঁচটি বিষয় রক্ষার জন্য ইতিবাচক বা positive ও নেতিবাচক বা negative দুটি দিক রয়েছে। ইতিবাচক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সালাত, সাওম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নেতিবাচক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে হত্যা, হানাহানি, ব্যভিচার ইত্যাদি পরিহার করা।

৭.২. হাজিয়াত (الحَاجِيَاتُ) বা প্রয়োজনীয়

আরবি 'হাজিয়াত' শব্দের অর্থ হলো প্রয়োজন। হাজিয়াত হলো সেসব জিনিস যেগুলো ইসলামী শরী'আহ্‌র জরুরি বিষয়গুলোর পর্যায়ভুক্ত নয় বরং মানুষের কষ্ট ও সমস্যা দূর করা কিংবা পাঁচটি জরুরি বিষয় সংরক্ষণে সহায়ক ও সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। মানুষের স্বাভাবিক, সহজ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন এবং যেগুলোর অভাবে তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যা ও দুঃখকষ্টের মোকাবেলা করতে হয় সেগুলোকে হাজিয়াত বলা হয়। জরুরিয়াত ও হাজিয়াতের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো : যেসব জিনিসের অভাবে সমাজের সকলে ক্ষতিগ্রস্ত ও সমস্যার সম্মুখীন তাকে জরুরিয়াত এবং যেসবের অভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষ কিংবা কিছুসংখ্যক মানুষ ক্ষতি ও সমস্যার সম্মুখীন হয় তাকে হাজিয়াত বলা হয়।[৩]

---

[১]আল কুরআন, ৬ : ১৫১।

[২]Dr. Ahcene Lahsasna, Maqasid Al-Sharia`h in Islamic Finance, IBFIM, Kuala Lampuy, 2013, p. 20.

[৩]ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল 'আতি মুহাম্মদ 'আলী, আল মাকাসিদুশ্ শারী'আহ্ ওয়া আসারুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৭, পৃ. ১৯১।

www.pathagar.com

হাজিয়াতের সংজ্ঞায় ইমাম শাতিবি র. বলেছেন, 'তা হলো সেসব বিষয়, যেগুলো মানবজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে এবং কঠোরতা, সমস্যা ও অসুবিধা দূর করে। এগুলো উপেক্ষিত হলে মানুষকে নানাবিধ অসুবিধা ও দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়, কিন্তু এগুলোর প্রতি উপেক্ষার কারণে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে না।'[১]

ইবনে আশুর বলেন, 'হাজিয়াত হলো সেসব জিনিস যেগুলো সমাজের স্বার্থ অর্জন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন এবং যেগুলো ছাড়া সামাজিক শৃঙ্খলা শুধু ধ্বসেই পড়ে না বরং অকার্যকর হয়ে যায় কিন্তু সেসব জিনিস জরুরিয়াতের পর্যায়ভুক্ত নয়।'[২]

হাজিয়াতের উদাহরণ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্র ওপর সালাত ও সাওম ফরয করেছেন। এগুলোকে নির্দিষ্ট সময় ও পরিমাণে আদায় করাই জরুরি। কিন্তু কিছুসংখ্যক মানুষের কষ্ট দূর করার প্রয়োজনে শরী'আহ্র বিধান অনেক ক্ষেত্রে সহজ করা হয়েছে। যেমন সাওম বা রোযা নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট সংখ্যায় ফরয করা হয়েছে। কিন্তু অসুস্থ, মুসাফির, বয়স্ক ব্যক্তি, স্তন্যদানকারী ও গর্ভবতী নারীর জন্য রমযান মাসে রোযা না রেখে পরবর্তীতে রাখা কিংবা ফিদিয়ার বিনিময়ে না রাখার অনুমতি শরী'আহ্তে রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা সফরে থাকে, তা হলে অন্য সময়ে সে পরিমাণ সাওম পূরণ করে নেবে। আর এটি যাদের ওপর একান্ত কষ্টদায়ক হবে, তাদের জন্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া থাকবে (এবং তা হচ্ছে) একজন মিসকিনকে খাদ্যদান করা।'[৩]

অনুরূপভাবে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো পণ্য বিক্রির পূর্বে তার অস্তিত্ব থাকা জরুরি। কিন্তু কিছু মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বাই' সালাম বা অগ্রিম ক্রয় শরী'আহ্তে বৈধ। যদিও এক্ষত্রে পণ্যের অস্তিত্ব না থাকে। যেমন ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রাসূল স. মদিনায় আগমন করলে লোকেরা এক বছর ও দুই বছরের জন্য সালাফ (বাই' সালাম) করত। রাসূল স. বললেন, খেজুরের ক্ষেত্রে কেউ সালাম করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের মধ্যে করে।[৪]

---

[১]ইমাম শাতিবি র., প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১।

[২]Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, Ibid, p.123.

[৩]আল কুরআন, ২ : ১৮৪।

[৪]সহিহ আল বুখারি ও মুসলিম।

www.pathagar.com

৭.৩. তাহসিনিয়াত (التَّحْسِيْنِيَاتُ) বা সৌন্দর্যবর্ধক

আরবি 'তাহসিনিয়াত' শব্দের অর্থ শোভা বা সৌন্দর্যবর্ধন। তাহসিনিয়াতকে তাকমিলাতও বলা হয়। তাকমিলাতের অর্থ পরিপূরক। শোভাবর্ধনকারী বিষয়গুলো মানবজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক বা প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু এগুলো মানুষের রুচি, আচার-আচরণ, ভদ্রতা-শিষ্টাচার ও আরাম-আয়েশ বা সুন্দর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন।

তাহসিনিয়াতের সংজ্ঞায় ইমাম শাতিবি র. বলেছেন, 'যা উত্তম বলে বিবেচিত তা গ্রহণ করা এবং সুস্থ বিবেক যেগুলো ঘৃণা করে এমন সব নিকৃষ্ট জিনিস পরিহার করা।'[১]

ইবনে আশুর বলেন, 'তাহসিনিয়াত হলো সেসব জিনিস যেগুলো সমাজের অবস্থা ও সামাজিক শৃঙ্খলাকে সর্বোচ্চ পূর্ণতায় উন্নীত করে যাতে একটি সমাজের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং অন্য জাতির চোখে তাদের জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা এবং সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারে।'[২]

তাহসিনিয়াতের উদহারণ

ক. সুস্বাদু খাবার গ্রহণ ও উত্তম পোশাক পরিধান।
খ. শরীর ও পোশাক হতে নাপাক, ময়লা ইত্যাদি দূর করা।
গ. সকল প্রকার শিষ্টাচার।
ঘ. হালাল ও বৈধ বিলাসী জিনিস ব্যবহার।

৮. ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্য চেনার পদ্ধতি

ইসলামী শরী'আহ্র প্রতিটি হুকুম-আহকামের মধ্যে যে উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নিহিত রয়েছে তার কোনো-কোনোটি খুব সহজেই আবার কোনো-কোনোটি গবেষণাপূর্বক জানা সম্ভব হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরী'আহ্ প্রণেতার বক্তব্য থেকে সরাসরি উদ্দেশ্যসমূহ অবগত হওয়া যায়। যেমন সালাত, সিয়াম, কিসাস ইত্যাদির উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার বাণী থেকে সরাসরি অবগত হওয়া যায়। আবার কখনো গবেষণা-অনুসন্ধানের মাধ্যমে শরী'আহ্ প্রণেতার নির্দেশের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানা যায়।

শরী'আহ্র উদ্দেশ্য বুঝার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হলো : যেমন কেউ বলল, আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ঢাকায় যাচ্ছি। এখানে ঢাকায় যাওয়ার উদ্দেশ্য বক্তার বক্তব্য থেকে সরাসরি জানা যাচ্ছে। কিন্তু সে যদি শুধু বলে, 'আমি ঢাকায় যাচ্ছি'। এ বক্তব্যে তার ঢাকায় যাওয়ার উদ্দেশ্য অজ্ঞাত। এখানে ঢাকায় যাওয়ার উদ্দেশ্য জানতে হলে তার অভ্যাস ও আচরণ বিশ্লেষণ করতে হয়।

---

[১]ইমাম শাতিবি র., প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

[২]Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, Ibid, p. 124.

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ করে জানা যেতে পারে যে সে সাধারণত তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতেই ঢাকা যায়।

প্রকৃতপক্ষে শরী'আহ্ প্রণেতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ণয় করা খুব সহজ বিষয় নয়। এ জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ নিয়ম-নীতি অনুসরণপূর্বক গভীর অনুসন্ধান। সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম তাঁর 'আল মাকাসিদুল আম্মাতু লিশ্ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ্' গ্রন্থে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র উদ্দেশ্য অবগত হওয়ার তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।[১] ড. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইয়ুবি তাঁর 'মাকাসিদুশ শরী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্' গ্রন্থে পাঁচটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।[২]

নিচে শরী'আহর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অবগত হওয়ার কতগুলো পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

৮.১. শরী'আহ্ প্রণেতার সুস্পষ্ট বর্ণনা : শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্য জানার প্রধান উপায় হলো কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট বর্ণনা। শরী'আহ্ প্রণেতা নিজেই তাঁর উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।'[৩]

'আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে।'[৪]

৮.২. কারণভিত্তিক সুস্পষ্ট দলিল (النَّصُّ الصَّرِيْحُ الْمُعَلَّلُ) : শরী'আহ্ প্রণেতার নির্দেশনার মধ্যেই উক্ত নির্দেশনা বা বিধানের ইল্লত বা কারণ উল্লেখ থাকে। সে কারণ থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ শরী'আহ্ প্রণেতা বিধান বর্ণনার সাথে সাথে তার কারণও বলে দিয়েছেন। যেমন, শরী'আহ্ প্রণেতার নির্দেশ হলো বিবাহ করা। আর বিবাহের ইল্লত বা কারণ হলো, বংশধারা রক্ষা করা। ইল্লত বা কার্যকারণ সম্পৃক্ত আহকাম থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য বের করার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে তুলে ধরা হলো হলো :

আল কুরআনের বাণী

ক. وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ—'আর তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি,

---

[১]ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায়, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৩. সংখ্যা ১০, ২০০৭, পৃ. ৪৭।

[২]ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, ইসলামী শরী'আহ্-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, ২০০৭, পৃ. ১৭।

[৩]আল কুরআন, ২ : ১৮৫।

[৪]আল কুরআন, ৪ : ২৬।

www.pathagar.com

সাজ-সরঞ্জাম ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে আর তাদের ছাড়া অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা চেন না।'[১] এ আয়াতে মুমিনদেরকে শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখার নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার করা।

খ. 'হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) তবে পর-পুরুষদের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে লোক লালসা করতে পারে।'[২] এ আয়াতে নবী-পত্নী তথা মু'মিন নারীদের কোমলকণ্ঠে কথা বলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের উদ্দেশ্য হলো দুষ্ট লোকদের মনে যেন কোনো ধরনের লালসা সৃষ্টি হতে না পারে।

গ. 'আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্, রাসূল, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য। (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই শুধু আবর্তিত হতে না থাকে।'[৩] এ আয়াতে সকলের মাঝে সম্পদ বণ্টনের নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো সম্পদ যেন শুধু ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। কারণ শুধু ধনীদের মাঝে সম্পদ আবর্তিত হলে তা অভাবগ্রস্তদের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

সুন্নাহ্‌র বাণী

যুক্তিসঙ্গত সময়ে জামা'আতের সালাত সমাপ্ত করার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'তোমাদের কেউ লোকদের সালাতের ইমামতি করলে সে যেন সালাতকে সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে ছোট শিশু, দুর্বল ও অসুস্থ লোক থাকতে পারে।'[৪] সালাতে দীর্ঘ কিরাআত পড়া বৈধ কিন্তু এই দীর্ঘ কিরাআত কারো কারো জন্য কষ্টকর বিধায় রাসূলুল্লাহ্ স. তা করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। এমনকি যারা জামাআতের সালাতকে খুব দীর্ঘ করত রাসূলুল্লাহ্ স. তাদের ওপর রাগান্বিত হতেন। যেমন আবু মাসউদ রা. বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে নসিহত করতে গিয়ে সে দিনের ন্যায় এতো অধিক রাগান্বিত হতে আর কোনো দিন দেখিনি। তিনি বলেন, 'তোমাদের মাঝে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে।

[১]আল কুরআন, ৮ : ৬০।

[২]আল কুরআন, ৩৩ : ৩২।

[৩]আল কুরআন, ৫৯ : ৭।

[৪]সহিহ আত-তিরমিযি, তাহকিক, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, কিতাবু মাওয়াকিতিস সালাত আন রাসূলিল্লাহ্ স., বাবু মা জায়া ইযা আম্মা আহাদুকুমুন্নাসা ফালইয়ুখাফ্‌ফিফ।

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্য লোক নিয়ে সালাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা লোকও থাকে।'[১] হাদিসটিতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, দীনের ভিত্তি হলো সহজতার ওপর। সৎকাজ যখন কল্যাণ বিনষ্টকারী হয় তখন তা শরী'আহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যায়। কারণ এ ধরনের কাজ ত্রুটি, অলসতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।[২]

রাসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম তার বিয়ে করা উচিত। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে আনত করে এবং গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করে। আর যে সক্ষম নয় তার সাওম পালন করা উচিত। কারণ সাওম তার জন্য হাতিয়ার।'[৩] এ হাদিসে বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। আর তা হলো দৃষ্টি ও গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করা।

৮.৩. শরী'আহ্ প্রণেতার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য : শরী'আহ্ প্রণেতার নির্দেশ (اَلْأَمْرُ) ও নিষেধাজ্ঞার (اَلنَّهْيُ) মাধ্যমে শরী'আহ্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝা যায়। তাঁর নির্দেশ দ্বারা কোনো কাজ করা আর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা কোনো কাজ থেকে বিরত থাকাই শরী'আহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্য। শরী'আহ্ প্রণেতার হুকুম অনুযায়ী কাজের বাস্তবায়ন করা আর নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা শরী'আহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্য। কেউ যদি তার নির্দেশ বাস্তবায়ন না করে এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত না হয় তাহলে সে শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করল।

৮.৪. শরী'আহ্র দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান : গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য জানা যেতে পারে। শরী'আহ্র বিভিন্ন বিধিবিধান অনুসন্ধানপূর্বক তার কারণ জানা যায় এবং উক্ত কারণ থেকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নির্ণয় করা যায়। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী থেকে গবেষণার মাধ্যমে মুযাবানা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধের কারণ জানা যায়। এ সম্পর্কিত হাদিস হলো : এক ব্যক্তি শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা যায় কি না জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'তাজা খেজুর শুকালে তা কমে যায় কি না?' লোকটি বলল, 'হাঁ।' রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'তাহলে অনুমতি নেই।'[৪] এ হাদিস থেকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুযাবানা পদ্ধতির বেচাকেনা হারাম হওয়ার

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আযান, বাবু তাখফিফিল ইমামি ফিল কিয়াম ওয়া ইতমামির রুকুয়ি ওয়াস সুজূদ।

[২]ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায়, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৩. সংখ্যা ১০, ২০০৭, পৃ. ৪৭।

[৩]সহিহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ইজতিজাবিন নিকাহ লিমান তাকাতা...।

[৪]ইবনে মাজাহ; মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, কিতুবুল বুয়ু ফিত তিযারাতি ওয়াস সালাম।

www.pathagar.com

কারণ জানা যায়। আর তা হলো, শুকানোর পর কাঁচা খেজুর কমে যায়। এই কমে যাওয়ার পরিমাণ অজ্ঞাত।

এ রকম আরো একটি উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে বললেন যে, 'আমি বেচাকেনায় ধোঁকা খাই।' তখন রাসূলুল্লাহ্ স. তাকে বললেন, যখন তুমি বেচাকেনা করবে তখন বলবে, 'কোনো প্রকার ধোঁকা চলবে না'।[১] এ হাদিস থেকে আমরা একটি কারণ নির্ণয় করতে পারি তা হলো, বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রতারণা বৈধ নয়। অতএব উক্ত হাদিস দুটি থেকে গবেষণা ও অনুসন্ধানপূর্বক জানা যায় যে, 'লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি দূর করা শরী'আহ্র একটি মৌলিক উদ্দেশ্য।'[২]

গবেষণার মাধ্যমে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য জানার আরো একটি পদ্ধতি হলো, কোনো আহকামের ব্যাপারে বিভিন্ন নস থাকলে সে সকল নসের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ রাখলে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। যেমন, গোলামের ব্যাপারে অসংখ্য দলিল রয়েছে যেখানে গোলাম আযাদ করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এ থেকে সহজে অনুমেয় যে, ইসলামী শরী'আহ্ গোলামের মুক্তি কামনা করে।

দাসদাসী মুক্ত করা সংবলিত অধিকাংশ দলিল এ কথার ওপর ইঙ্গিত করে যে, শরী'আহ্র মূল লক্ষ্য হলো গোটা মানবসমাজ মুক্ত ও অবাধ জীবনযাপন করবে। শরী'আহ্প্রণেতার এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের বিরাট অংশ স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা স্বাধীনতাকে দাসত্ব ও অধীনতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ মানুষ মূলগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। দাসত্ব ও অধীনতা সমসাময়িক বা অনন্যোপায় অবস্থার একটি ব্যবস্থা মাত্র।[৩]

৮.৫. সাহাবিগণের অনুসরণ করা (الِاقْتِدَاءُ بِالصَّحَابَةِ) : সাহাবিগণ ছিলেন ইসলামী শরী'আহ্র প্রত্যক্ষ দর্শক। তাঁরা আহকামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন। চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন অগ্রগণ্য।

'আহকাম ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহের পরিচয় লাভ করা একটি সূক্ষ্ম কাজ। তীক্ষ্ণ মেধা ও দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া এগুলোর রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। সাহাবিগণের মধ্যে যাঁরা ফকিহ ছিলেন তাঁরা সৎকাজ এবং আরবের মুশরিক, ইহুদি, নাসারাদের মতো জাতীয় ঐকমত্যভিত্তিক বদকাজের কারণগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম বস্তুর সাথে পরিচয় লাভের প্রয়োজনীয়তা তাদের দেখা দেয়নি। অবশ্য তাঁরা দীনের হুকুম-আহকাম বিধি-নিষেধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।'[৪] ফলে সাহাবিগণের কর্মকাণ্ড অনুসন্ধান ও তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আহ্র লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল বুয়ু, বাবু মা ইয়ুকরাহু মিনা খিদায়ে ফিল বাই।

[২]Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, Ibid p. 16.

[৩]তাফসির আল ফখরুর রাযি, খ. ৩, পৃ. ২৮৮।

[৪]শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, পৃ. ১৩৬।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান নির্ণয় ও মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্

১. শরী'আহ্ অভিযোজন ও সাম্প্রতিক বিষয়

সাম্প্রতিক বা নবোদ্ভাবিত কোনো বিষয় বা সমস্যাকে শরী'আহ্সম্মত ও শরী'আহ্বান্ধব করার প্রয়াসকে শরী'আহ্ অভিযোজন (Shariah Adaptation) বলা হয়। ড. ইউসুফ আল কারযাভি উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর শর'ঈ নস প্রয়োগ করাকে শরী'আহ্ অভিযোজন হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১]

সাম্প্রতিক বিষয় বলতে এমনসব বিষয়কে বুঝানো হয় যেসবের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্তে সরাসরি কোনো নস নেই আবার সরাসরি কোনো ইজতিহাদও নেই। কিন্তু একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামী নীতিমালার আলোকে উক্ত বিষয়গুলোর সমাধান নির্ণয় প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বিষয়ের সংজ্ঞায় প্রফেসর আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেন, 'এটি এমন অবস্থা ও বিষয়–ইসলামী ফিকহের আলোকে যার বিধান বিশ্লেষণের দাবি রাখে।'[২]

শায়খ সালমান আওদাহ্ বলেন, 'সাম্প্রতিক বিষয় হলো এমন নতুন বিষয় যার অধিকাংশ দিক আধুনিক যুগের অনুগামী এবং যার শর'ঈ বিধান জটিলতা ও দুর্বোধ্যতায় আচ্ছাদিত।'[৩]

২. শরী'আহ্ অভিযোজন বা সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান নির্ণয়ের গুরুত্ব

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিত্য-নতুন বিষয়াদির উদ্ভব হয়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক যতই বৃদ্ধি পায় নতুন বিষয় ও সমস্যাদিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই নবোদ্ভাবিত সমস্যাদির শরী'আহ্সম্মত সমাধান প্রয়োজন।

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, আল-ফাতওয়া বাইনাল ইনদিবাত ওয়াত তাসাইয়ুব, দারুল কালাম, কুয়েত, পৃ. ৭২।

[২]আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ্, ফিকহুন নাওয়াযিল, মাজাল্লাতুল হক, আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মরক্কো, স. ২৪, হি. ১৪০২, পৃ. ৪২।

[৩]মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সাম্প্রতিক বিষয় : ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের গবেষণা পদ্ধতি, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৭, ২০১১, পৃ. ৮৯।

www.pathagar.com

কুরআন-সুন্নাহ্‌তে কিছু বিষয়ের সুস্পষ্ট ও অকাট্য সমাধান রয়েছে আবার কিছু সমস্যা সমাধানের মূলনীতি রয়েছে, কিন্তু মানুষের সকল সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা সেখানে স্থান পায়নি। এ ছাড়া শরী'আহ্‌র অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল সীমাবদ্ধ; কিন্তু ঘটনা ও সমস্যাদি সীমাহীন ও পরিবর্তনশীল। অপর দিকে কুরআন-সুন্নাহ্ অপরিবর্তনীয়। এমতাবস্থায় নবোদ্ভাবিত কোনো সমস্যা সমাধানের অকাট্য ও সুস্পষ্ট নস পাওয়া না গেলেও তার কোনো-না-কোনো সমাধান অবশ্যই নির্ণয় করতে হয়। সময়ের পরিবর্তনে উদ্ভাবিত নতুন, কঠিন ও জটিল সমস্যাকে যদি কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বাস্তবানুগ সমাধান না দেয়া হয় কিংবা সমাধান না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হয়, তাহলে ইসলামী শরী'আহ্ থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাই সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত বিষয়ের সমাধান অবশ্যই দিতে হবে।

সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান নির্ণয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম র.-এর বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন, মুজতাহিদের উচিত হবে বিকল্প পথ বলে দেয়া যদি তিনি কোনো সমাধান প্রত্যাশীকে কোনো জরুরি বা প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেন।[১]

৩. ইজতিহাদ সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান নির্ণয়ের প্রধান হাতিয়ার

ইজতিহাদ (اِجْتِهَادٌ) শব্দের অর্থ হলো, যথাসাধ্য চেষ্টা করা, সাধনা করা, গবেষণা করা, শরী'আহ্‌র বিধান জানার জন্য স্বীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করা, সম্যক ও সমন্বিত সামগ্রিক প্রয়াস ইত্যাদি। পরিভাষায় কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে হুকুম-আহকাম নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞ আলিমগণের অবিরাম প্রচেষ্টা ও গবেষণামূলক বিচার-বুদ্ধির সাধ্যানুগ প্রয়োগকে ইজতিহাদ বলা হয়।[২]

ইবনে হাজার আসকালানি র. বলেন, 'শর'ঈ হুকুম নিরূপণের প্রচেষ্টাকেই মূলত ইজতিহাদ বলা হয়।'[৩] আর যিনি ইজতিহাদ করেন তাকে বলা হয় 'মুজতাহিদ'।

সহজে বলা যায়, কুরআন-সুন্নাহ্‌তে কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নস না পাওয়া গেলে সেই বিষয়ে সঠিক বিধান নির্ণয়ের জন্য মুজতাহিদের প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য নিয়োগের প্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ বলা হয়।

---

[১]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, লেবানন, হি. ১৪০৮, খ. ১, পৃ. ৫৪।

[২]মুহাম্মদ ওসমান গনী, আনোয়ারুল মুকাল্লিদীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১, পৃ. ১৬। উদ্ধৃতি : ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ইসলামে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, ২০১০, পৃ. ১০।

[৩]উসূলুল ফিকহ, আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৯, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

ইজতিহাদ আইনের কোনো স্বতন্ত্র উৎস নয়, বরং আইনসম্পর্কিত গবেষণা।[১] কিয়াসের চেয়ে ইজতিহাদের পরিধি ব্যাপক। কিয়াস ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যদিও ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে, এক অর্থে ইজতিহাদ হলো 'অভিমত' এবং অপর অর্থে ইজতিহাদ হলো 'কিয়াস'। তিনি মনে করেন, ইজতিহাদ ও কিয়াস একই বিষয়ের দুটি নাম।[২]

এমন বহু সমস্যা ও ব্যাপার রয়েছে, যে বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্‌তে সুস্পষ্ট করে কোনো কিছু বলা হয়নি। তবে সেখানে এমন বহু ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে বা এমন কিছু পন্থা-পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে, যার আলোকে সেসব সমস্যা ও বিষয়ের ব্যাপারে মীমাংসা করা যায়। তাই সাম্প্রতিক যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেসব ক্ষেত্রে বিধান নির্ণয়ের প্রধান হাতিয়ার হলো ইজতিহাদ। কিয়াস, মাসালিহ মুরসালাহ্‌, ইসতিহসান ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে মুজতাহিদ নতুন বিষয়ের সমাধান পেশ করার জন্য ইজতিহাদ করেন।

ইজতিহাদের মূল উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা করে বিধান উদ্ভাবন করা। যাকে ইস্তিখরাজ (اِسْتِخْرَاج) বা ইস্তিম্বাত (اِسْتِنْبَاط) বলা হয়।

৩.১. ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবন গতিশীল ও বৈচিত্র্যময়। এই গতি ও বৈচিত্র্যময়তার সর্বাবস্থায় তাকে শরী'আহ্‌র নির্দেশনা মেনে চলতে হয়। কিন্তু পরিবর্তনশীল মানবজীবনের সকল পর্যায় ও সময়ের উপযোগী করে প্রয়োজনীয় সকল আইন-কানুন প্রস্তুত করে রাখা হয়নি। এ জন্য কুরআন-সুন্নাহ্‌ প্রদত্ত নির্দেশনা ও নীতিমালার আলোকে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হলে ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই বলা যায়, ইজতিহাদ হলো ইসলামী শরী'আহ্‌র জীবনীশক্তি। ঝরনাধারা যেমন পানির উৎস তেমনি নতুন আইনের উৎস ইজতিহাদ। পর্বত থেকে পানি নির্গমন বন্ধ হলে যেমন নদী মরে যায়, তেমনি ইজতিহাদ বন্ধ হলে নতুন আইনের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়।'[৩]

ইজতিহাদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ দেহলভি র. বলেছেন, 'আমি বলেছি, প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ ফরয তার কারণ এই যে, ঘটনাবলি অন্তহীন অথচ সে সকল ঘটনা সম্পর্কে শরী'আহ্‌র নির্দেশ কী তা জানা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষেই ফরয। পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ কর্তৃক যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সকল যুগের জন্য যথেষ্ট নয়।[৪]

---

[১]বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, খ. ১, ভাগ ২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ২৯।

[২]ইমাম আশ-শাফিঈ র., আর রিসালাহ, কায়রো, পৃ. ৪৭৬।

[৩]মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

[৪]শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলভি র., আল-মুসাফফা, দিল্লি, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি র. বলেছেন, 'ইজতিহাদের পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে না, কেননা তা ফরযে কিফায়া। কোনো যুগে কেউই যদি এর প্রতি মনোযোগী না হন এবং সবাই তা ছেড়ে দেন তা হলে সবাই গোনাহ্গার হবেন। ইমাম মাওয়ার্দি র., বাগবি র., নববি র. প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণ এটা স্বীকার করেছেন।[১]

আল্লামা সারাখসি র. বলেন, এমন কোনো বিষয় নেই যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বৈধ কিংবা অবৈধ, প্রয়োজনীয় কিংবা অপ্রয়োজনীয় হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আর এটাও স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রত্যেক বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। কেননা কুরআন-সুন্নাহ্র মূল পাঠ সীমিত ও একপর্যায়ে এসে শেষ হতে বাধ্য। কিন্তু চলমান ঘটনাবলি কিয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হতে থাকবে। আর চলমান ঘটনাবলিকে হাদিসে 'হাদিসা' বলার মাধ্যমে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে না।[২] তাই এসব নতুন ঘটনাবলির সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ইজতিহাদ অব্যাহত রাখা একান্ত আবশ্যক।

৩.২. ইজতিহাদের প্রামাণিকতা

ইজতিহাদের সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ্ ও যুক্তিভিত্তিক বহু দলিল রয়েছে।

আল কুরআন

মহান আল্লাহ্ বলেন, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ—'অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[৩] এ আয়াতে 'ই'তিবার' শব্দের অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তিত করা। আর ইজতিহাদের মাধ্যমে কিয়াস করে মূল বিষয়ের অনুরূপ হুকুম শাখা বিষয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তিত করা হয়।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ—'তারা যদি ব্যাপারটা রাসূলুল্লাহ্ ও তাদের মধ্যকার বিজ্ঞজনদের প্রতি ন্যস্ত করত তবে তাদের মধ্যে যারা এটা বুঝার যোগ্যতা রাখে, তারা নিজেরাই তা জানত।'[৪] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'ইসতিমবাত' (اِسْتِنْبَاط) শব্দ

[১]শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি র., মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, অনুবাদ : আব্দুস শহীদ নাসিম, (মূল গ্রন্থের নাম : আল-ইনসাফ ফী বায়ানিল আসবাবিল ইখতিলাফ). বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১, পৃ. ৫৩।

[২]আল্লামা সারাখসি র. উসূল আল সারাখসি, খ. ২, পৃ. ১৩৯।

[৩]আল কুরআন, ৫৯ : ২।

[৪]আল কুরআন, ৪ : ৮৩।

www.pathagar.com

ব্যবহার করেছেন। আর 'ইসতিমবাত'-এর অর্থ হচ্ছে ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনাবলির সঠিক ইল্লত বা কারণ উদ্ঘাটন করা।[১]

আল হাদিস

ইজতিহাদের প্রমাণে বহুসংখ্যক হাদিস রয়েছে। সেগুলো থেকে দুটি হাদিস উল্লেখ করা হলো : মু'আয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ স. যখন তাঁকে ইয়ামানে পাঠাতে মনস্থ করলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমার কাছে কোনো বিষয়ে ফয়সালা জানতে চাওয়া হলে তুমি কীভাবে তা ফয়সালা করবে? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তিনি বললেন, তাতেও যদি সমাধান না পাও? তিনি বললেন, তবে রাসূলের সুন্নাহ্ অনুযায়ী। তিনি বললেন, তাতেও যদি সমাধান না পাও? তিনি বললেন, তাহলে আমি আমার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করবো। তখন মু'আয রা.-এর বুকে হাত রেখে রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সে কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন যা তিনি পছন্দ করেন।'[২]

সুনান নাসাঈতে বর্ণিত একটি হাদিসকে ইজতিহাদের দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, 'যদি তোমার সামনে এমন কোনো ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়, যার সুস্পষ্ট নির্দেশ কুরআনে উল্লেখ নেই আর রাসূলুল্লাহ্ স.-ও কোনো সমাধান দিয়ে যাননি, তবে 'সালফে সালেহিন' (পূর্ব যুগের অভিজ্ঞ আল্লাহ্ভীরু আলিমগণ) যেভাবে সমাধান দিয়েছেন, সেভাবেই তার সমাধান দিতে হবে। যদি এমন কোনো ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়, যা আল কুরআনে নেই, রাসূলুল্লাহ্ স.-ও তার সমাধান দেননি, তবে নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইজতিহাদ করবে এবং এ কথা বলবে না যে, আমি ভয় করছি। কেননা, হালাল সুস্পষ্ট আর হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুটির মাঝখানে কিছু সংশয় উদ্রেককারী জিনিস রয়েছে। এ জন্য যা কিছু সংশয়ের উদ্রেক করে, তা ছেড়ে দিয়ে যা সংশয় উদ্রেক করে না, তা ধারণ করো।'[৩] ইমাম নাসাঈ র. বলেন, এ হাদিসটি অতি উত্তম। আর এ ধরনের হাদিস উমর রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে।'[৪]

৩.৩. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ওপর ইজতিহাদের নির্ভরতা

আল্লামা ইমাম শাতিবি র. তাঁর 'আল মুওয়াফাকাত ফি উসূলিশ শরী'আহ্' গ্রন্থে ইজতিহাদের শর্তাবলি আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, মুজতাহিদকে অবশ্যই শরী'আহ্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝতে হবে। তাঁর মতে, কেবল ঐসব পণ্ডিতই

---

[১]আল্লামা সারাখসি, উসূল আল সারাখসি, ভারত, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, খ. ২, পৃ. ১২৮।

[২]সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুল কা'যা, বাবু ইজতিহাদির রায় ফিল-কা'যা।

[৩]সুনানু নাসাঈ, বাবু আল-হুকম বি ইত্তিফাক-আহল আল-ইলম।

[৪]ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ইসলামে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছতে পারেন যারা শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হন এবং নিজের বুঝ অনুযায়ী তা থেকে আহকাম উদ্ভাবন করতে পারেন।[১]

মুজতাহিদকে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাঁকে জানতে হবে কোন প্রেক্ষাপটে এবং কোন উদ্দেশ্যে কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, তার কোনটি চিরস্থায়ী সাধারণ বিধান হিসেবে আগত আর কোনটি সাময়িক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে কিংবা সুনির্দিষ্ট কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত।

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্কে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হবে। আল কুরআনের কোনো একটি আয়াত কিংবা হাদিসগ্রন্থ থেকে কোনো একটি হাদিস নিয়ে পৃথকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ কুরআনের আলোকে, সমস্ত সহিহ্ হাদিসের আলোকে কিংবা রাসূলুল্লাহ্ স. ও খোলাফায়ে রাশেদার জীবনাদর্শের সাথে এবং ইসলামী শরী'আহ্র সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাতে ভুলের আশঙ্কা কম থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ্কে বিশ্লেষণপূর্বক কোনো সিদ্ধান্ত বের করতে হলে অবশ্যই ইসলামী শরী'আহ্র সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে হবে। যেমন একটি বর্ণনায় রয়েছে, 'ইমাম হবেন কুরাইশি' (الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ)।[২] এ থেকে বুঝা যায় যে, খিলাফাতের ব্যাপারটি কেবল কুরাইশ বংশের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু ইসলামী শরী'আহ্র সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, খিলাফতের ব্যাপারটি কোনো বিশেষ বংশের জন্য নির্ধারিত নয়। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে যে কোনো মুসলিম এ দায়িত্বের জন্য নিযুক্ত হতে পারেন। তাহলে 'ইমাম হবেন কুরাইশি'-এর অর্থ কি? এ অর্থ জানতে প্রয়োজন মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আবু বকর রা.-এর উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেন, যখন তা বলা হয় তখন কুরাইশদের মধ্যে শৌর্যবীর্য বিদ্যমান ছিল। আর এ শৌর্যবীর্যের ওপরই খিলাফত ও রাষ্ট্র টিকে থাকে।[৩] আবু বকর রা.-এর উক্ত বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, খিলাফত নিঃশর্তভাবে কুরাইশদের মধ্যে থাকবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে খিলাফত তাদের হাতে ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ তারা আল্লাহ্র বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও যোগ্যতায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। যদি তারা অপারগ হয় অথবা এ ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে

---

[১]ইমাম শাতিবি র., আল মুওয়াফাকাত ফি উসূলিশ শরী'আহ্, খ. ৪, পৃ. ১০৫-১০৬।

[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল মুহারিবিন ও কিতাবুল আহকাম, বাবুল উমরায়ু মিন কুরাইশ।

[৩]ইবনে খালদুন, মুকাদ্দামা, খ. ২, পৃ. ৬৯৫। উদ্ধৃত : ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

www.pathagar.com

অন্যরা বেশি যোগ্য হয় তাহলে খিলাফত অন্যদের হাতে চলে যাবে। আবু বকর রা.-এর বক্তব্যে উদ্দেশ্যের আলোকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, শৌর্যবীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খিলাফতের জন্য একটি প্রয়োজনীয় যোগ্যতাস্বরূপ।

ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম তাঁর 'আল-মাকাসিদুল আম্মা লিশ্-শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, একজন মুজতাহিদ ইসলামী শরী'আহ্তে পাঁচ ধরনের কাজ করে থাকেন। এ সকল কাজ সম্পাদনের জন্য ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কে মুজতাহিদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ কাজগুলো হলো :

এক. কুরআন-সুন্নাহ্র যেসব শব্দ দলিলরূপে ব্যবহৃত হয় একজন মুজতাহিদ সেগুলোর আভিধানিক অর্থ অনুধাবন করেন এবং ফিকহি দলিলের দাবি অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করেন।

দুই. একজন মুজতাহিদকে গভীরভাবে দেখতে হয় শরী'আহ্গত কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত দলিলগুলো দ্বন্দ্বমূলক কিনা। দ্বন্দ্বমূলক বা সাংঘর্ষিক হলে একটির ওপর অপরটিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলির ওপর মুজতাহিদগণের নির্ভরশীলতা অধিক।

তিন. নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজতে মুজতাহিদকে কিয়াস করতে হয়। আর কিয়াস হলো অবতীর্ণ মূল হুকুমের ওপর অনুমান করা। শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে মূল হুকুমের কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা সহজ নয়।

চার. নতুন উদ্ভাবিত কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্তে কোনো সুস্পষ্ট নস কিংবা অনুমান করার মতো কোনো মূল হুকুমের নজির পাওয়া না গেলে শরী'আহ্র সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি ও জনসাধারণের স্বার্থকে সামনে রেখে নির্দেশনা দিতে হয়। জনগণের কল্যাণের জন্য কোনো হুকুম দিতে গেলে মুজতাহিদকে অবশ্যই শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হয়।

পাঁচ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরী'আহ্র বিধিবদ্ধ আইনের রহস্য ও তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে মুজতাহিদগণ প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।... এ অবস্থায় নিজের কালের সীমাবদ্ধতা এবং আল্লাহ্র আইনের অসীম ক্ষমতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হওয়ার কথা চিন্তা করে সে হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ এবং নতিস্বীকার করে তাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে হয়।[১] ইসলামী শরী'আহ্র আহকামের মধ্যে এ ধরনের গবেষণার নাম 'তাআব্বুদি' বা সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত ও সমর্পিত হওয়া।

---

[১]ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ, প্রাগুক্ত, বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ২০০৬, পৃ. ৭২।

www.pathagar.com

৩.৪. সম্মিলিত বা সামষ্টিক ইজতিহাদ

সম্মিলিত ইজতিহাদ (الْاِجْتِهَادُ الْجَمَاعِي) একটি আধুনিক ফিকহি পরিভাষা। এটিকে ইজমার পুনর্গঠিত ধারণাও বলা যেতে পারে। পূর্ববর্তী উসূলের গ্রন্থাবলিতে এ বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। বর্তমানে ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইজতিহাদ একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইসলামের প্রথম পর্যায়ের পণ্ডিতগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন বিষয়ে এককভাবে ইজতিহাদ করলেও বর্তমানে ইসলামী পণ্ডিতগণ সমন্বিতভাবে ইজতিহাদ করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ, সকলে মিলে কোনো বিষয়ে সম্মিলিতভাবে ইজতিহাদ করলে তাতে ভুলের আশঙ্কা কম থাকে।

সম্মিলিত বা সামষ্টিক ইজতিহাদ হলো কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুজতাহিদের সামগ্রিক প্রয়াস বা গবেষণা। এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুল মাজিদ শারফি বলেন, সম্মিলিত ইজতিহাদ হলো কোনো বিষয়ের শর'ঈ বিধান নির্ণয়ের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ কর্তৃক চেষ্টা-সাধনা এবং সকলের পরামর্শের পর উক্ত বিধানের ওপর তাঁদের সকলের বা অধিকাংশের ঐকমত্য পোষণ।[১]

ড. আল-আবদু খলিল বলেন, কোনো বিষয়ের শর'ঈ বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো যুগের উম্মতে মুহাম্মাদির সংখ্যাগরিষ্ঠ মুজতাহিদের ঐকমত্যই হলো সম্মিলিত ইজতিহাদ।[২]

৩.৫. সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো বিষয়ে একক ব্যক্তির গবেষণার চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ গবেষকের চিন্তাচেতনা ও গবেষণার ফলাফলই অধিকতর সঠিক। এ কারণেই আল কুরআনে পারস্পরিক পরামর্শ বা শূরা থেকে নির্গত ফলাফল অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, 'কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো, অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তখন আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো।'[৩]

সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করে ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইজতিহাদকে সম্মিলিত

---

[১]ড. আব্দুল মাজিদ শারফি, আল-ইজতিহাদ আল-জামায়ী ফিত তাশরিঈল ইসলামী, কুতুবুল উম্মাহ সিরিজ, মক্কা, হি. ১৪১৮, পৃ. ৪৬।

[২]ড. আল-আব্দুল খলিল, আল-ইজতিহাদ আল-জামায়ী ফি হাযাল আসর, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, সংখ্যা ১০, ১৯৮৭, পৃ. ২১৫।

[৩]আল কুরআন, ৩ : ১৫৯।

www.pathagar.com

ইজতিহাদে উন্নীত করতে হবে। কেননা একক অভিমতের চেয়ে একদল মানুষের চিন্তা-গবেষণা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী।[১]

শায়খ মোস্তফা আল যারকা বলেন, অতীতে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা বরং ক্ষতিকর, যা হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে ভয়ঙ্কররূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাযহাবের ফকিহ্গণ ইজতিহাদের দরজা রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র অবলম্বন ইজতিহাদ। তাই এক্ষেত্রে আমাদেরকে ইজতিহাদের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। আর তা হলো ব্যক্তিগত ইজতিহাদের পরিবর্তে সম্মিলিত ইজতিহাদ এবং এর মাধ্যমে আমরা ইজতিহাদের প্রথম পথ চলা অর্থাৎ আবু বকর ও উমর রা.-এর যুগে ফিরে যাব।[২]

সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরে ক্যামব্রিয়ান কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের শিক্ষক ও বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে:

ক. একক গবেষণার তুলনায় সম্মিলিত গবেষণা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা সমকালীন বড় বড় আলিম, গবেষক, বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে সামগ্রিক দিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্মিলিত ইজতিহাদ সম্পন্ন হয়।

খ. সম্মিলিত ইজতিহাদ ইজতিহাদকে চলমান রাখে এবং তা বন্ধ হওয়া রাস্তা রোধ করে।

গ. সম্মিলিত ইজতিহাদ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের পথ সুগম করে। কারণ এ উম্মাহ্র আলিমগণ একত্র হয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন। জনসাধারণ তাদের নির্ণীত বিধানের সাথে একমত হয়ে তা অনুসরণ করেন। যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ফুটে ওঠে।

৪. সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে করণীয়

সাম্প্রতিক বিষয়ে শর'ঈ বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উদ্ভাবকের জন্য করণীয় বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি বিষয় হলো :

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, আল ইজতিহাদ ফিশ্ শরী'আহ্ আল ইসলামিয়্যাহ, দারুল কলম, কুয়েত, হি. ১৪১০, পৃ. ১৮২।

[২]ড. মুফসির কাহতানি, মানহাজু ইসতিখরাজ আল-আহকাম আল-ফিকহিয়্যাহ লিন নাওয়াযিল আল-মুআসারাহ, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা, ২০০০, খ. ১, পৃ. ২৭৮।

www.pathagar.com

৪.১. বিষয়টি বাস্তবসম্মত ও বিশ্লেষণযোগ্য হওয়া : নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে সমাধান পেশ করার বাস্তবতা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। একবার ইবনে উমর রা.-এর নিকট এক ব্যক্তি কোনো এক বিষয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বললেন, যে বিষয়ের কোনো বাস্তবতা নেই সে সম্পর্কে প্রশ্ন করো না। কেননা আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কর্তৃক ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিতে শুনেছি যে ব্যক্তি অবাস্তব বিষয়ে প্রশ্ন করে।[১]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাহাবিগণ উপকারে আসত এমন বিষয় ছাড়া তাঁরা অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতেন না।[২]

৪.২. সূক্ষ্ম অনুধাবন : সাম্প্রতিক বিষয়ের সমাধান পেশ করা একটি সূক্ষ্ম বিষয়। এ জন্য শরী'আহ্র সকল খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে অনুধাবনের পরই কেবল কোনো নতুন বিষয়ে সমাধান পেশ করা উচিত।

মুকাল্লিদ বা যিনি অন্যের উদ্ভাবিত বিধানের অনুসারী তার জন্য শরী'আহ্র বিশদ ব্যাখ্যামূলক বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়া ততটা জরুরি নয়। কারণ এগুলো একটি জ্ঞানগত সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং আইনসংক্রান্ত বিষয়। এর সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের উচ্চশিখরে পৌঁছে যাওয়া, প্রখর ধীশক্তি ও মেধার অধিকারী হওয়া। তাই যিনি মুজতাহিদ, যাকে শরী'আহ্ অভিযোজন বা সাম্প্রতিক বিষয়াবলির সমাধান পেশ করতে হয়, তাকে কুরআন-সুন্নাহ্র মৌল নির্দেশনা ও শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

৪.৩. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র প্রতি দৃষ্টি রাখা : সাম্প্রতিক বিষয়ে সমাধান পেশ করার ক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদকে পূর্বে সংঘটিত সাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ে শরী'আহ্ প্রণেতার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ অনুসন্ধান করতে হয়। বস্তুত কুরআন-সুন্নাহ্তে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণাপূর্বক শরী'আহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতির পর সেই আলোকে নতুন বিষয়ের সমাধান পেশ করা হয়।

নতুন সমস্যা সমাধানে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা কাজের ক্ষেত্রে উপায়-উপকরণ, নিয়ম-পদ্ধতি ও কর্মকৌশল যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সংশ্লিষ্ট কাজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

---

[১] সুনান দারিমি, বাবু কারাহিয়াতিল ফাতওয়া।
[২] প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৪.৪. সামাজিক প্রথা ও প্রচলনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া : সাম্প্রতিক বিষয়ের সমাধান পেশ করার ক্ষেত্রে মুজতাহিদের উচিত সামাজিক বিভিন্ন প্রথা ও প্রচলনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। এমন কোনো সমাধান পেশ করা উচিত নয় যা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আল্লামা শামি র. বলেছেন, ইসলামী শরী'আহ্র বিধিবিধান দুই প্রকার। প্রথমত, এমনসব বিধিবিধান যা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ দ্বারা কোনো রদবদল করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এমনসব বিধিবিধান যা ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুজতাহিদ যুগের পরিবর্তনের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এমনকি তিনি যদি পরবর্তী যুগে থাকতেন তাহলে তিনিও সমকালীন অবস্থার আলোকে তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের আবশ্যকীয় রদবদল করতেন। এ জন্যই উলামায়ে কিরাম শর্ত দিয়েছেন যে, মুজতাহিদকে তার নিজ নিজ যুগের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে। কেননা, সময়ের পরিবর্তনের কারণে অনেক আহকামের পরিবর্তন হয়ে থাকে। পরিবর্তিত অবস্থাতে যদি পূর্ববর্তী আহকাম বহাল থাকে, তা হলে মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং শরী'আহ্ অনুসরণের ক্ষেত্রে যে সহজ নীতি ও দুনিয়াকে উত্তমরূপে পরিচালনা করার যে মূলনীতি রয়েছে এটা তার বিপরীত হবে। তাই অনেক মুজতাহিদকে পূর্ববর্তী মুজতাহিদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়। তারা মনে করেন যে, পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ যদি এ যুগে জীবিত থাকতেন, তারা পূর্বসিদ্ধান্তের বিপরীত আমাদের মতই সিদ্ধান্ত দিতেন।[১]

৫. সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান উদ্ভাবনের মূলনীতি

সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতি রয়েছে। সাম্প্রতিক বিষয়ে বিধান উদ্ভাবনের মূলনীতির ক'টি হলো :

৫.১. আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি : আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নস বা কুরআন-সুন্নাহ্কেই দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলির পরিচয়, এক, অদ্বিতীয় ও শরিকবিহীন আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, রাসূলগণের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান ইত্যাদি আকিদাসংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত কুরআন-সুন্নাহ্র দলিলের অতিরিক্ত কোনো যোজন-বিয়োজন চলবে না।

---

[১]মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪; ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ইসলামে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

www.pathagar.com

ইবাদতের মূলনীতিও হলো এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল থাকতে হবে। অর্থাৎ, ইবাদতের যাবতীয় বিধিবিধান সপ্রমাণিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সু-স্থির ও অপরিবর্তনীয় এবং অবস্থা ও যুগ বা কালের পরিবর্তনে তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন সূচিত বা সাধিত হতে পারে না। এ পর্যায়ের বিধিবিধানের দৃষ্টান্ত মানবরচিত আইন বিধানে পাওয়া যেতে পারে না।[১]

ইবাদতের দুটি দিক রয়েছে : একটি হলো মৌলিক ইবাদত এবং অপরটি হলো এর উপায়-উপকরণ। মৌলিক ইবাদত প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও কিয়াস অচল। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট দলিল থাকতে হবে। আর কিয়াস হলো শরী'আহ্র যন্নি বা অনুমাননির্ভর দলিল, কাজেই এর মাধ্যমে আকিদা-বিশ্বাস ও মৌলিক ইবাদতের কোনো দলিল গ্রহণ করা যায় না। যেমন, সালাতের প্রতি রাক'আতে একটি রুকু ও দুটি সিজদাহ রয়েছে। এখন কেউ যদি সিজদার ওপর কিয়াস করে বলে, সিজদাহ যেমন আল্লাহ্র ইবাদত তেমনি রুকুও আল্লাহ্র ইবাদত। সিজদাহ যেমন সালাতের রুকন তেমনি রুকুও সালাতের রুকন। কাজেই সিজদাহ যেমন দুটি তেমনি রুকুও দুটি হতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে এ ধরনের কিয়াস গৃহীত হবে না। একইভাবে কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর সালাতের ওপর কিয়াস করে জানাযা ও ঈদের সালাতের জন্য আযান দেয়ার বিধান চালু করে তাও গৃহীত হবে না। কেননা, ইবাদতের ক্ষেত্রে থাকতে হবে কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট বিধান, এখানে কিয়াস অচল। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে কাজ রাসূলুল্লাহ স. এবং তাঁর সাহাবিগণ করেননি সেই কাজ আল্লাহ্র নৈকট্যের মাধ্যম হিসেবে করাই বিদ'আত।[২]

মৌলিক ইবাদতের মূলনীতি সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. প্রমুখ হাদিসবিশারদগণ বলতেন, ইবাদত মূলত ওহির সূত্রে প্রমাণিত হতে হবে। কাজেই এক্ষেত্রে শরী'আহ্র বিধান শুধু তাই, যার পক্ষে নস রয়েছে। যে সম্পর্কে নস-এ তেমন কিছু নেই, তাকে শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত মনে করা আল্লাহ্র ওপরে কর্তৃত্ব করার শামিল। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ—'ওদের জন্য এমন উপাস্য আছে নাকি, যারা ওদের জন্য এমন বিধান রচনা করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?'[৩]

---

[১]মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম র., ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
[২]ইমাম শাতিবি র. আল ইতিসাম, ১/৫০।
[৩]আল কুরআন, ৪২ : ২১।

www.pathagar.com

ইবাদত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম রা. সবসময় কুরআন-সুন্নাহ্‌কেই মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, মেয়েদেরকে রাতে মসজিদে যেতে বাধা দেবে না। তখন ইবনে উমর রা.-এর এক ছেলে বললেন, আমরা মেয়েদেরকে মসজিদে যেতে দেব না; কারণ লোকেরা এটাকে ফ্যাসাদের রূপ দেবে। তখন ইবনে উমর রা. রাগান্বিত হন এবং ছেলেকে গালাগালি করে তার বুকে আঘাত করে বলেন, আমি বলছি রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আর তুমি বলছ আমরা তাদের যেতে দেব না।'[১]

ইবনে উমর রা. বলেন, উমর ফারুক রা. কাবা শরিফ তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদকে সম্বোধন করে বলেন, আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, কোনো রকম কল্যাণ-অকল্যাণের উপকার বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা তোমার নেই। যদি রাসূলুল্লাহ্ স. তোমাকে চুম্বন না করতেন তাহলে কখনোই আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। এরপর তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেন। এরপর তিনি বলেন, তাওয়াফের সময় দৌড়ানোর আর কি প্রয়োজন? আমরা তো মুশরিকদের ভয় দেখানোর জন্য এভাবে তাওয়াফ করেছিলাম। আল্লাহ্ তো মুশরিকদেরকে ধ্বংস করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, একটি কাজ রাসূলুল্লাহ্ স. করেছেন আমরা তা পরিত্যাগ করতে চাই না।'[২]

একজন সিরীয় লোক ইবনে উমর রা.-কে হজ্বের সাথে ওমরা অর্থাৎ তামাত্তু হজ্ব করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে উমর রা. বললেন, 'তা করা বৈধ।' লোকটি বলল, 'আপনার পিতা উমর রা. তো তামাত্তু করা নিষেধ করে দিয়েছেন।' ইবনে উমর রা. বললেন, 'বলুন! আমার পিতা উমর ফারুক রা. যদি নিষেধ করে থাকেন এবং রাসূলুল্লাহ্ স. নিজে এ কাজ করে থাকেন তাহলে কাকে এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে, আমার পিতা উমর রা. না রাসূলুল্লাহ্ স.-কে?' সিরীয় লোকটি বলল, 'রাসূল স.-এর কার্যক্রমই অনুসরণ করতে হবে।' তারপর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ স. তামাত্তু করেছেন।'[৩]

অন্য দিকে ইবাদতের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ও তা সম্পাদনের উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এ ব্যাপার নিয়ে ইজতিহাদ হতে পারে এবং ইবাদতকে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাত পদ্ধতিতে আদায়ের লক্ষ্যে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন

---

[১]সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাবু খুরুজিন নিসায়ি ইলাল মাসাজিদি...।

[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল হজ্ব, বাবুর রামালি ফিল হাজ্জি ওয়াল উমারাহ।

[৩]জামে আত-তিরমিযি, আবওয়াবুল হজ্ব, অনুচ্ছেদ-১২।

www.pathagar.com

আসতে পারে। যেমন সালাতের জাগতিক বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে সতর ঢাকা, পোশাক পরা, মসজিদ নির্মাণ করা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পোশাকের রঙ কিংবা মসজিদের ধরনের বিষয়টি মানুষের প্রয়োজন, অবস্থা ও কল্যাণের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সময় জুমু'আর সালাতের জন্য একটি আযান দেয়া হতো। কিন্তু জুমু'আর সালাতকে সুন্নাহ্র দাবি অনুযায়ী যথার্থভাবে সম্পাদনের জন্য উসমান রা. দুই আযানের প্রচলন করেন।

এ প্রসঙ্গে সায়িব ইবনে ইয়াযিদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স., আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর যুগে জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরে বসতেন, তখন প্রথম আযান দেয়া হতো। উসমান রা.-এর যুগে যখন মদিনায় লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গেল তখন তিনি প্রথমে অতিরিক্ত আরেকটি আযানের ব্যবস্থা করলেন। এই আযানটি মদিনার যাওরা নামক বাজারে দেয়া হতো। পরবর্তী যুগে এভাবেই জুমু'আর আযান উসমান রা.-এর নিয়মেই চালু থাকল।[১]

উসমান রা. জুমু'আর দুই আযানের প্রচলন করলেন যা রাসূলুল্লাহ্ স., আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর যুগে ছিল না। 'আযান হচ্ছে সালাতের উপকরণ। জুমু'আর খুতবা শোনা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর যুগে মদিনা শহর ছিল খুবই ছোট। মসজিদের আশেপাশেই সবার কুটির। ওয়াক্তের আগেই সবাই মসজিদে চলে আসতেন। যারা না আসতেন তারা আযানের সাথে সাথে এসে পুরো খুতবা শুনতে পেতেন। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে গেল। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর যুগের মতো একটি আযান দিলে অনেক মুসলমান খুতবা শোনার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই উসমান রা. জুমু'আর দিনের উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে খুতবা শোনার সুন্নাহ্ পরিপূর্ণভাবে আদায় করার সুযোগ প্রদানের জন্য মসজিদে প্রবেশের পূর্বে একটি আযান বাজারে প্রদানের ব্যবস্থা করলেন।'[২]

৫.২.. মু'আমালাহ্র ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি : মু'আমালাহ্, আদত-অভ্যাস, পার্থিব বা জাগতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো তা বৈধ যতক্ষণ না অবৈধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুআমালাহ্সংক্রান্ত মূলনীতির নির্দেশনা পাওয়া যায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্য থেকে।

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ —'আর তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা বিশদভাবেই তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন।'[৩]

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল জুমু'আহ্, বাবুত তা'আযিনি ইন্দাল খুতবাহ।

[২]ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহ্ইয়াউস সুনান, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন, ঝিনাইদহ, ২০০৬, পৃ. ৯৮-৯৯।

[৩]আল কুরআন, ৬ : ১১৯।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ ، فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

অর্থাৎ, 'আমি যখন তোমাদেরকে দীন সম্পর্কে কোনো আদেশ করি তখন তোমরা তা যত্নসহকারে পালন করো, আর যখন আমার ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা কোনো পরামর্শ দেই, তখন মনে করবে আমি একজন মানুষ।'[১] তিনি আরো বলেছেন, 'তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়ে তোমরাই ভালো জান।'[২]

রাসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন,

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ.

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল আর যা হারাম করেছেন তা হারাম। তিনি যে বিষয়ে চুপ থেকেছেন তা অনুগ্রহ। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গ্রহণ করো।'[৩] এ প্রসঙ্গে সালমান ফারসি রা. আরো একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন : 'রাসূল করিম স.-কে চর্বি, পনির ও কোমল পশুর লোমে তৈরী বস্ত্রাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা হালাল ঘোষণা করেছেন তা হালাল আর যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা সেসব জিনিসের মধ্যে গণ্য যা করলে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।'[৪]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, লেনদেন ও চুক্তির ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে 'আল-ইজনু' (الْإِذْنُ) বা অনুমোদন এবং 'আল-ইবাহাহ্' (الْإِبَاحَةُ) বা বৈধতা। অবশ্য যদি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক কোনো দলিল পাওয়া যায় যা দিয়ে এর অবৈধতা সাব্যস্ত হয় তখন সেখানে এসে ক্ষান্ত হতে হবে। তবে, ইবাদতের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই প্রযোজ্য, এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে নিষিদ্ধ বা অবৈধ হওয়া, যতক্ষণ না বিধানদাতার পক্ষ থেকে কোনো 'নস' বা দলিল (text) প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে করে মানুষ ধর্মীয় বিষয়ে এমন কোনো কিছুই প্রবর্তন না করে যার অনুমতি আল্লাহ্ প্রদান করেননি।[৫]

মু'আমালাহ্‌র মূলনীতি বর্ণনায় ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, 'মৌলিকভাবে সবকিছুই মুবাহ' কথাটি শুধু কতগুলো দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়।

---

[১]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, বাবু ওজুবিল ইমতিছালি মা ক্বালাহু শার'আন...।

[২] প্রাগুক্ত।

[৩]আল হাকিম, মুসতাদরাক।

[৪]দারা কুতনি।

[৫]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, খ. ১, পৃ. ৩৮৫। উদ্ধৃত : ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৩৪।

www.pathagar.com

যাবতীয় কাজকর্ম, হস্তক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি যা ইবাদতের ব্যাপারসমূহে গণ্য নয় সে ক্ষেত্রেও এ মৌলনীতি প্রযোজ্য। এগুলোকে আমরা বলি আদত-অভ্যাস, পারস্পরিক কার্যাদি। এসবের মূল কথা হলো, আসলে তা সবই হারাম নয়, শর্তহীনভাবেই তা হালাল। তবে শরী'আহ্ প্রণেতা যদি কোনো কাজকে হারাম ঘোষণা করে থাকেন এবং কোনো বিষয়ে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তবে তা অবশ্যই হারাম হবে এবং সে শর্ত অবশ্যই মানতে হবে।[১]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মু'আমালাহ্ বা মানুষের জীবনের যাবতীয় পারস্পরিক ও বৈষয়িক বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্তে বিধান এসেছে এ কথা ঠিক; কিন্তু তা অবিস্তৃত ও খুঁটিনাটিমুক্ত। কেননা, এসব বিষয়ে অবস্থা, কাল, পরিবেশ বা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অনেক পার্থক্য বা পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। এরূপ অবস্থায় খুঁটিনাটি বিধান চিরন্তনতা পেতে পারে না। ফলে এসব ক্ষেত্রে অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শরী'আহ্র মৌলিক বিধানের আলোকে খুঁটিনাটি আইন রচিত হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে হবে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ এবং তা অনুসরণ করার মাধ্যমে।[২]

মু'আমালাহ্ বা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান রয়েছে আবার কতগুলো বিষয়ে মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ফলে যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্ নীরব সেসব ক্ষেত্রে মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ বা মানববুদ্ধির মাধ্যমে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে। তবে এই মানববুদ্ধির প্রয়োগ ইসলামের প্রাণশক্তি, মূলনীতি ও মেজাজ-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। দেখতে হবে এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞামূলক কোনোকিছু রয়েছে কিনা। নিষেধাজ্ঞামূলক কিছু থাকলে তাকে বিবেচনায় আনতে হবে।

আবার মু'আমালাহ্র যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নস রয়েছে সেগুলোও দু' ধরনের। প্রথম ধরনের মধ্যে রয়েছে তা কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হতে পারে না। যেমন, মহান আল্লাহ্ সুদ হারাম করেছেন। এখন ইজতিহাদ করে তা কখনই হালাল করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, অবশ্য এখানে এমন কিছু নিষিদ্ধ ক্ষেত্রও রয়েছে যাতে ইজতিহাদের আদৌ কোনো অবকাশ নেই। তা হলো, সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং সমস্ত

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
[২]মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম র., ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

উম্মতে মুসলিমার কাছে যুগে যুগে গৃহীত ও বিশ্বাসযোগ্য আহকামসমূহ। যেমন সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্ব ফরয হওয়া; সুদ ও মদপান হারাম হওয়া, মিরাসের নিসাব, তালাক, মৃতের স্ত্রীর ইদ্দত নির্ধারিত হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং কখনো এসব বিষয়ে এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে বিতর্ক ও মতদ্বন্দ্ব হতে পারে না। অতএব ট্যাক্স বা করের কথা বলে কেউ যাকাত ফরয হওয়াকে বাতিলের জন্যে কিংবা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে তাই রোযা ফরয হওয়াকে বাতিলের জন্য বা পর্যটনকে উৎসাহিত করার নিমিত্তে যেনা-মদপান ইত্যাদি বৈধ করার জন্যে অথবা উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অর্থ যোগানের যুক্তিতে সুদ বৈধ করার জন্যে গবেষণা ও ইজতিহাদ করতে পারে না।[১]

দ্বিতীয় ধরনের মু'আমালাহ্ হচ্ছে সেসব বিষয় যেগুলো স্থান-কাল-অবস্থা ও প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নস থাকা সত্ত্বেও স্থান-কাল-অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হুকুমের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন, ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহ।

দীন প্রতিষ্ঠা করা ফরয। এ জন্য ইমাম বা খলিফা নির্বাচন করাও ফরয। এই মূল ফরয আদায়ের উপায়-উপকরণগুলো বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আবু বকর রা. যেভাবে খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন উমর রা. সেভাবে নির্বাচিত হননি। উভয়ের নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। একইভাবে উসমান ও আলী রা.-এর নির্বাচন পদ্ধতিও ছিল পূর্ববর্তী দু'জনের চেয়ে ভিন্ন। ইসলামে খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি যদি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হতো তাহলে খোলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতিও একই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামে ইকামতে দীনের ক্ষেত্রে খলিফা, আমির বা নেতা নির্বাচনের পন্থা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমকালীন সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করাই ইসলামী বিধান হওয়া স্বাভাবিক। শুধু দেখতে হবে যে, গৃহীত পদ্ধতির মধ্যে ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো উপাদান রয়েছে কিনা। যদি থাকে তা বর্জন করতে হবে। একইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধনীতি, চুক্তিসম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নস থাকার পরও অবস্থার পরিবর্তনের আলোকে হুকুমও পরিবর্তিত হয়। এ বিষয়ের একটি উদাহরণ হলো বেচাকেনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা না করা।

রাসূলুল্লাহ্ স. পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে দিতে নিষেধ করেছেন। হাদিসে বলা হয়েছে, 'লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

বেঁধে দিন। রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মূল্যের গতি নির্ধারণ করেন, তিনিই একমাত্র সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী।'[১] অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, 'তোমরা পণ্যদ্রব্যের মূল্য বেঁধে দিও না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলাই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন।' কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞার পরও তাবেয়িগণ পণ্য-দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, জনগণের লোভ-লালসা বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ার ফলে তাদের কেউ কেউ মূল্যগ্রহণে সীমালঙ্ঘন করে।[২]

পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্টকরণ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, 'নবী করিম স. পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট করে দিতে নিষেধ করেছিলেন এই কারণে যে, তখন তা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। যদি কারণটি তাঁর বর্তমান সময়ে থাকত, তাহলে তিনি অবশ্যই মূল্য নির্দিষ্ট করে দিতেন।

মু'আমালাহ্ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম র. লিখেছেন, এ বিষয়ের হুকুম-আহকাম সর্বতোভাবে মানুষের প্রয়োজন ও কল্যাণ দৃষ্টির ওপর ভিত্তিশীল।...এ কারণে কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ মত প্রকাশ করেছেন, এ পর্যায়ের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান পরিবর্তন করা জায়েয, যদিও তার বিপরীত অকাট্য দলিল কিংবা ইজমা পাওয়া যায়। তবে জমহুর ফিকাহবিদদের অভিমত তাদের বিপরীত। তাদের মতে মু'আমালাহ্র ক্ষেত্রে পরিবর্তন কেবল তখনি মেনে নেয়া হবে যখন তার বিপরীত অকাট্য দলিল ও বিশুদ্ধ ইজমা না থাকবে।[৩]

মু'আমালাহ্র ক্ষেত্রে নস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে হুকুম পরিবর্তনের বহু দৃষ্টান্ত পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৩. আধুনিক যুগে ইবাদত ও মু'আমালাহ্র উপায়-উপকরণ পরিবর্তন : ইবাদত ও মু'আমালাহ্র খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বর্তমানেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন, ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা ফরয। কিন্তু ইলম শিক্ষার উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে নতুনত্ব এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ স. মসজিদে নববীতে অনুসারীগণকে শিক্ষা দিতেন। তখন বর্তমানের ন্যায় মাদ্রাসা ছিল না, বিভিন্ন ক্লাসে ভাগ করে শিক্ষা দেয়া হতো না।

---

[১]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ু (ইজারা), বাবু ফিত তাসয়ির ও তিরমিযি।
[২]মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম র., ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।
[৩]প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

www.pathagar.com

কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণির জন্য পৃথক পৃথক সিলেবাস থাকে। আবার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চতর ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে শিক্ষা দেয়া হয়। এসব নিয়ম-পদ্ধতি নতুন। এগুলোকে বৈধ বলেই মেনে নিয়েছেন আলেমসমাজ। শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক নিয়োগের পন্থা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে নতুনত্ব এসেছে। এই নতুনত্ব গ্রহণ করা ইসলামে বৈধ। একইভাবে ফরয সালাত আদায়ের জন্য আযান দেয়া হয়। আযান যেন দূরবর্তী লোকদের কানে পৌঁছে সে জন্য উঁচু মিনার থেকে আগেকার দিনে আযান দেওয়া হত। কিন্তু মাইক আবিষ্কারের পর এখন আর মসজিদের মিনার থেকে আযান দেয়া হয় না। আযান দেয়া হয় মাইকে।

রাসূলুল্লাহ্ স. বিদায় হজ্বের দিন লক্ষাধিক জনতার সামনে খালি মুখেই ভাষণ দিয়েছিলেন, কোনো যন্ত্র ব্যবহার করেননি। কেননা, তখন কোনো যন্ত্র ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মাইক আবিষ্কার হওয়ার কারণে বেশি লোকের সালাতের জামা'আতে মাইক ব্যবহার করা হয়। এটা বৈধ বলেই ফকিহগণ মত দিয়েছেন।

পেশাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য আগেকার দিনে ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করা হতো কিন্তু বর্তমানে ঢিলা-কুলুপের পরিবর্তে টিস্যু পেপার ব্যবহার করা হয়। এটাকে বৈধ বলে মেনে নিয়েছেন মুজতাহিদগণ।

৬. সাম্প্রতিক বিষয়ে শরী'আহ্র সিদ্ধান্ত বের করার পদ্ধতি

ইসলামী শরী'আহ্র যে কোনো সিদ্ধান্ত নির্ণয় করার পদ্ধতি প্রধানত দু' ধরনের। এক. অহি বা কুরআন-সুন্নাহ্, দুই. ইজতিহাদ বা অহিনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি-বিবেচনাপ্রসূত গবেষণা। ইজতিহাদের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ্, সাদ্দুয যারায়ি, ফিকহি কায়িদা, মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ইত্যাদি।

নবীযুগে কোনো বিষয়ের সমাধান প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অহি মাতলু বা কুরআন এবং অহি গায়রে মাতলু বা সুন্নাহ্। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ স. মু'আমালাহ্সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধবন্দীসংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবিগণের সাথে পরামর্শপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

সাহাবিগণ শরী'আহ্সংক্রান্ত সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমে কুরআন-সুন্নাহ্ তালাশ করতেন। সেখানে না পেলে ইজমা বা সম্মিলিত ইজতিহাদ অনুসন্ধান করতেন। সেখানে না পেলে তাঁরা কিয়াস করতেন। সাহাবিদের যুগে কিয়াসের মাধ্যমে ইসলামী বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি নতুন উৎসকে বিবেচনায় আনা হয়েছিল। তা

www.pathagar.com

হলো, মাসালিহ মুরসালাহ্ ও সাদ্দুয যারায়ি।[১] এ ছাড়া তাঁরা, বিশেষ করে উমর রা. সাহাবিগণের বাণীর ভিত্তিতে নতুন বিষয়ের সমাধান দিতেন। বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁর কাছে কোনো বিষয় উপস্থিত করা হলে তিনি প্রথমে দেখতেন, কুরআন-সুন্নাহ্তে এর কোনো বিধান রয়েছে কিনা। এ দুটিতে না পেলে তিনি সাহাবিগণকে জিজ্ঞেস করতেন, বিশেষ করে আবু বকর রা. সে বিষয়ে কী ফয়সালা করেছেন? যদি তাঁর কোনো ফয়সালা পাওয়া যেত তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন।[২] এ ছাড়া অন্যান্য সাহাবি কোনো ফয়সালার ক্ষেত্রে বড় বড় সাহাবিদের অভিমত অনুসরণ করতেন।

ইমাম আবু হানিফা র. শরী'আহ্র বিধি-বিধান বের করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, 'আমি প্রথমে অগ্রাধিকার দেই আল্লাহ্র কিতাবকে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সুন্নাহ্কে। তারপর সাহাবিগণের ফয়সালাসমূহ তালাশ করি। তাঁদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ফয়সালা পেলে তা গ্রহণ করি। তবে তাঁরা সেক্ষেত্রে মতবিরোধ করলে আমি কিয়াস করি।'[৩] এ ছাড়া তিনি ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইসতিহসান পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, কোনো একটি বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা র.-এর শিষ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন কিয়াস হলে তিনি বলতেন, তোমরা ইসতিহসান করো, তখন কেউ আর বিতর্কে লিপ্ত হতেন না।[৪]

ইমাম মালিক র. কোনো বিষয়ের বিধান বের করার ক্ষেত্রে প্রথমে কিতাবুল্লাহ্ তারপর সুন্নাহ্ তালাশ করতেন। এ দুটিতে না পাওয়া গেলে তিনি সাহাবি ও তাবেয়িগণের মধ্যে যারা ফকিহ ছিলেন, তাঁদের ইজমা পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করতেন। নতুবা কোনো একজনের উক্তি বা মত পাওয়া গেলে তাই গ্রহণ করতেন–অবশ্য বিষয়টি যদি এমন হতো যাতে মানুষের চিন্তা-বিবেচনার কোনো অবকাশ নেই। আর যদি বিষয়টি চিন্তাবিবেচনার উপযুক্ত হতো তাহলে তিনি কিয়াসের আশ্রয় নিতেন।[৫] তিনি নস না পেলে মাসালিহ মুরসালাহ্র আলোকে বিধান উদ্ভাবন করতেন।

---

[১]আল কারাফি, শরহে তানকিহুল ফুসুল ফি ইখতিসারি আল-মাহসুল ফিল উসূল, পৃ. ৪৪৬।

[২]আল বায়হাকি, আস সুনানুল কুবরা, কিতাব আদাবুল কাযি, বাবু মা ইকদি বিহিল কাযি ওয়ামা ইউফতি বিহিল মুফতি, খ. ১০, পৃ. ১১৪।

[৩]আব্দুল ওয়াহহাব আশ্-শারানী, আল মিযানুল কুবরা, পৃ. ৫৩; আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ, আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স, পৃ. ৫।

[৪]ড. শাবান মুহাম্মদ ইসমাইল, আল ইসতিহসান বাইনান নাযরিয়াহ ওয়াত তাতবিক, দারুস সাকাফাহ, দোহা, পৃ. ৩৫।

[৫]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম র., ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

www.pathagar.com

ইমাম শাফিঈ র. বিধান বের করার ক্ষেত্রে প্রথমে কিতাবুল্লাহ্ তারপর হাদিসকে প্রাধান্য দিতেন। এমনকি 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের হাদিসও গ্রহণ করতেন যদি তার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হয়। শাফিঈ মাযহাবে কিয়াস অন্যান্য মাযহাবের ন্যায় ব্যাপকভাবে ও বিপুল প্রশস্ততাসহকারে গৃহীত হয়নি।[১]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. শরী'আহ্র হুকুম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে কিতাবুল্লাহ্ তারপর সুন্নাহ্ থেকে দলিল গ্রহণ করতেন। এ দুটির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে তিনি কিতাবুল্লাহ্কে অগ্রাধিকার দিতেন। এরপর তিনি সাহাবিদের সর্বসম্মত অভিমত ও ফতোয়া গ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে যার অভিমতকে কুরআন-সুন্নাহ্র নিকটবর্তী মনে করতেন তাকে গ্রহণ করতেন। প্রয়োজনে তিনি কিয়াসকে গ্রহণ করতেন।[২]

বর্তমানে শরী'আহ্গত কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত বের করার পদ্ধতি প্রধানত তিন ধরনের:

ক. শর'ঈ দলিল (اَلْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ) বা ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক ও সম্পূরক উৎসসমূহ।
খ. ফিকহি কায়িদা (اَلْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ)।
গ. আল মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ (اَلْمَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ)।

৬.১. শর'ঈ দলিলের মাধ্যমে বিধান নির্ণয় করা

শর'ঈ দলিল বলতে ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক উৎসগুলোকে বুঝানো হয়েছে। এ উৎসগুলো পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.২. ফিকহি কায়িদার মাধ্যমে বিধান নির্ণয়

ফিকহি কায়িদা হলো এমন সব মৌল নীতি যা মুজতাহিদ ইমামগণ শরী'আহ্র অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে রচনা করেছেন। এসব মৌল নীতির আলোকে সাধারণভাবে শরী'আহ্র বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ের সমাধান সহজে দেয়া যায়। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ স.-এর একটি বাণী হলো, (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) 'ক্ষতি স্বীকার করা এবং অন্য কারো ক্ষতি করা দুটিই নিষিদ্ধ।'[৩]

উক্ত হাদিসটির প্রথমাংশ (لَا ضَرَرَ) 'ক্ষতি নেই বা নয়' এর অর্থ ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার পথ বন্ধ করতে হবে যেন ক্ষতি না হতে পারে। আর ক্ষতি হতে থাকলে তাও বন্ধ করতে হবে। হাদিসটির দ্বিতীয় অংশ (وَلَا ضِرَارَ) 'ক্ষতি

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
[৩]ইবনে মাযাহ।

www.pathagar.com

করা যাবে না'-এর অর্থ, কেউ ক্ষতি করলে সেই ক্ষতির প্রতিকাররূপে ক্ষতির কাজ করা যাবে না। মিথ্যা দোষারোপের বদলে মিথ্যা দোষারোপ করা যাবে না, মিথ্যার প্রতিবাদে মিথ্যা বলা যাবে না।[১]

উক্ত হাদিসের ভিত্তিতে একটি ফিকহি কায়িদা হলো, (اَلضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ) 'ক্ষতি রোধ করা যায় না অনুরূপ ক্ষতির কাজ দ্বারা।'[২] এই মৌল নীতির ভিত্তিতে বহু খুঁটিনাটি মাসয়ালার সমাধান দেয়া যায়। যেমন, আবাদি জমির ইজারার মেয়াদ যদি ফসল পাকার আগেই শেষ হয়ে যায়, তখন ক্ষতি দূর করার জন্য ফসল পাকা পর্যন্ত সে জমি ইজারাগ্রহীতার দখলেই থাকবে। অন্য দিকে ইজারাদাতার ক্ষতি দূর করার জন্য ফসল কাটা পর্যন্ত মেয়াদের জন্য তাকে ভাড়া দিতে হবে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের ক্ষতি দূর করাই উদ্দেশ্য।

৬.৩. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়

ইসলামী শরী'আহ্র বিভিন্ন বিধি-বিধানের মধ্যে শরী'আহ্ প্রণেতার যেসব উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে সেসব উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নবোদ্ভাবিত বা সাম্প্রতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেশ করা যায়। এ বিষয়ের ক'টি দৃষ্টান্ত নিচে তুলে ধরা হলো :

৬.৩.১. শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করার কৌশল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ—'আর তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং এমনসব শত্রুকে যাদেরকে তোমরা চেন না।'[৩]

উক্ত আয়াতে শত্রুর মোকাবেলায় সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখার কথা বলা হয়েছে। সে যুগে ঘোড়া ছিল যুদ্ধের শক্তিশালী মাধ্যম। আর ঘোড়া প্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের জান-মাল হিফাযত ও শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করা। বর্তমানে এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামের শত্রু যারা ট্যাংক, ক্ষেপণাস্ত্র, পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় তাদের মোকাবেলায় ঘোড়ার পরিবর্তে উপযুক্ত যুদ্ধাস্ত্র নিয়েই প্রস্তুত থাকতে হবে।

---

[১]মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম র., ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।
[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।
[৩]আল কুরআন, ৮ : ৬০।

www.pathagar.com

একইভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল স. ও তাঁর সাহাবিগণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, ঢাল, তলোয়ার, নেজা, বল্লম ইত্যাদি সে যুগের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত শত্রুদের মোকাবেলার জন্য বর্তমানে সেকেলে অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করাই মাক্বাসিদ আশ্‌ শরী'আহ্‌র দাবি।

৬.৩.২. নগদ অর্থে যাকাতুল ফিতর আদায় : যাকাতুল ফিতর আদায় প্রসঙ্গে যত হাদিস এসেছে, সেখানে খেজুর, গম, বার্লি, কিশমিশ, পনির ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের নাম এসেছে। এখন প্রশ্ন হলো, হাদিসে উল্লেখিত খাদ্যদ্রব্য ছাড়া নগদ অর্থ দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ র. অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, হাদিসে বর্ণিত জিনিসগুলো ছাড়া নগদ অর্থে তা আদায় করা যাবে না। কিন্তু উমর ইবনে আব্দুল আযিয র., হাসান বসরি র., সুফিয়ান সওরি র., আবু হানিফা র. ও তাঁর সঙ্গীগণের মতে নগদ অর্থে যাকাতুল ফিতর আদায় করা বৈধ।[১]

ইবনে আবি শায়বা আউন থেকে বর্ণনা করেছেন, বসরায় অবস্থানরত গভর্নর আদির প্রতি লেখা উমর ইবনে আব্দুল আযিয র.-এর চিঠি পড়তে আমি শুনেছি : 'দিওয়ানভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে তাদের দানসমূহ থেকে অর্ধ দিরহাম গ্রহণ করা হবে।'[২] হাসান বসরি র. বলেছেন, 'সাদাকাতুল ফিতর আদায়ে নগদ মূল্য পরিশোধ করায় কোনো দোষ নেই'।[৩] আবু ইসহাক বলেন, 'আমি লোকদেরকে (সম্ভবত সাহাবিদের) এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তাঁরা রমযানের সাদাকাহ্‌ খাদ্যের মূল্য প্রদান করে আদায় করতেন'।[৪]

যারা নগদ অর্থে যাকাতুল ফিতর আদায় করা বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের চিন্তাধারার মধ্যে মাকাসিদ আশ্‌ শরী'আহ্‌র প্রতিফলন রয়েছে। যাকাতুল ফিতরের একটি উদ্দেশ্য হলো অভাবীদের চাহিদা পূরণ করা ও তাদেরকে সচ্ছল করে দেয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ স. বলেছেন, (أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ) 'এ দিন মিসকিনদেরকে সচ্ছল বানিয়ে দাও'।[৫]

---

[১]ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, ইসলামের যাকাত বিধান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০২-৫০৩।

[২]প্রাগুক্ত; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা।

[৩]প্রাগুক্ত।

[৪]প্রাগুক্ত।

[৫]নাইলুল আওতার, বায়হাকি ও দারা কুতনি।

www.pathagar.com

মিসকিনদের সচ্ছল বানানোর উদ্দেশ্য যেমন খাদ্যবস্তু দিয়ে অর্জিত হয় তেমনি নগদ অর্থ দিয়েও হয়। অনেক সময় যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থ দিয়ে আদায় করাই উত্তম হয়। কেননা, ফিতরা বাবদ পাওয়া বিপুল পরিমাণ খাদ্য ফকির-মিসকিনের কাছে জমা হলে তা বিক্রি করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে অথচ নগদ অর্থ পেলে সে তা দিয়ে প্রয়োজন মতো খাদ্যবস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করতে পারে।

নগদ অর্থে সাদাকাতুল ফিতর আদায় প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর 'ফিকহুয যাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন, নবী করিম স. যাকাতুল ফিতর আদায়ে খাদ্যদ্রব্য নির্ধারণ করে দেয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে : প্রথম, সেই সময় নগদ অর্থ বিরল হওয়ার কারণে খাদ্যবস্তু দেয়াটাই ছিল সহজ। আর দ্বিতীয়, অর্থের ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তনশীল কিন্তু খাদ্য সেরূপ নয়। এ ছাড়া সেকালে খাদ্যশস্য দেয়া যেমন দাতার পক্ষে সহজ ছিল তেমনি তা গ্রহণকারীর পক্ষেও ছিল অধিক উপকারী। কিন্তু আমাদের সময়ে নগদ অর্থে যাকাতুল ফিতর আদায় করাই সহজ ও গরিবের জন্য উপকারী। বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশ ও এলাকাসমূহে তো নগদ পয়সাই হয় বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম। অনেক দেশ, অনেক শহর এবং অনেক সময়ই তা গরিব লোকদের জন্যে খুবই সুবিধাজনক হয়।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, নগদ অর্থে, নাকি হাদিসে বর্ণিত দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করতে হবে–এ দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম, তা নিয়ে হানাফিদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের কেউ বলেছেন, হাদিসে বর্ণিত দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা সর্বাবস্থায়ই উত্তম। তা কঠিন কষ্টের সময় হোক কিংবা অন্য সময়। আবার অন্যরা বলেছেন, সময়টা যদি কষ্টের ও খাদ্যাভাবের হয়, তাহলে তখন মূল খাদ্য দেয়াটাই উত্তম। আর প্রশস্ততা ও সচ্ছলতাকালে মূল্য দেয়া উত্তম। কেননা, তা গরিব মানুষের প্রয়োজন পূরণে অধিক সক্ষম।

এ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের উত্তম পন্থার ভিত্তি হলো গরিবের পক্ষে কোনটা দিলে অধিক সুবিধাজনক হয়, সেটি দেয়াই উত্তম। যদি খাদ্যশস্য দিলে মূল্যের তুলনায় তার পক্ষে অধিক ভালো হয়, তাহলে সেটি দেয়াই উত্তম। যেমন দুর্ভিক্ষ ও কষ্টের সময় তা ভালো। আর নগদ অর্থ পেলে যদি তার বেশি সুবিধা হয়, তাহলে তা দেয়াই উত্তম। কেউ কেউ আবার ফিতরা গ্রহণকারীর পরিবারের প্রতি দৃষ্টি রাখার কথাও বলেছেন। যা দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করলে ফিতরা গ্রহণকারীর পরিবারের উপকার হয় তবে তা দিয়ে ফিতরা আদায় করাই উত্তম।[১]

---

[১] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩-৫০৫।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, শরী'আহ্‌র একটি উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা। ফলে যে বস্তু দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করলে গরিবের বেশি কল্যাণ হয় তা দেয়াই উত্তম।

৬.৩.৪. গনিমতের মাল বণ্টন : রাসূলুল্লাহ্ স. খায়বর বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। কিন্তু উমর রা. ইরাকের পল্লী অঞ্চল বিজয়ের পর তা তা করা সমীচীন মনে করেননি। অনেক সাহাবি তাঁর এ মতের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করেন।

উমর রা. তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনাকারীদের জবাবে বললেন, 'আমি সম্পদকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষের জন্য যথেষ্ট মনে করছি। আপনারা কি চান আগামী প্রজন্ম এমন অবস্থায় পড়ুক যে তাদের জন্য কিছুই রাখা হয়নি?'[১]

আগামী প্রজন্মের কথা ভেবেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, আগামী প্রজন্মকে উপেক্ষা করে কেবল বর্তমান প্রজন্ম যেন বিলাসী জীবনযাপন করতে না পারে। তাঁর এ পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান প্রজন্মকে বিলাসী জীবনযাপন থেকে দূরে রাখা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণ করা।

'মালে-গনিমত' বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত সম্পর্কেও উমর রা.-এর নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল। আবু বকর রা-এর পর তাঁর সময় সিরিয়া ও ইরাক জয় করা হয়। এ সময় জনকল্যাণের জন্য শুধুমাত্র 'খুমস্' (khums) বা এক-পঞ্চমাংশ[২] রেখে বাকি ধন-সম্পত্তি বিজয়ীরা ভাগ করে নিতে চাইলে উমর রা. বলেন, "এ দেশের জমি ও 'উলুজ' (অনারব অমুসলিমরা যে ভূখণ্ডে বসবাস করে) তোমরা যদি ভাগ করে বংশানুক্রমে ভোগ করতে থাক, তাহলে পরবর্তী মুসলমানদের কি উপায় হবে? এটা উচিত আইন নয়।" রসূলুল্লাহ্ স.-এর একজন সম্মানিত সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. তখন জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে যথাযথ পদ্ধতি কি হতে পারে? এ দেশ এবং তার 'উলুজ' আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের দান করেছেন।' উত্তরে উমর রা. বললেন : 'আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু আমি বিষয়টিকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি না। আল্লাহ্‌র কসম, এরপর আর এত বড় বিজয় হবে না, যেখানে এত অধিক লাভবান হওয়া যাবে বরং এর পরববর্তী বিজয়সমূহ মুসলমানদের জন্য বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই এখন যদি সিরিয়া ও ইরাকের 'উলুজ'-সহ

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, দি পাইওনিয়ার, ২০১১, পৃ. ১২৪।
[২]আল কুরআন, ৮ : ৪১।

www.pathagar.com

সমস্ত সম্পত্তি আমরা ভাগাভাগি করে নেই তাহলে বাইজেন্টীয় সীমান্ত ফাঁড়িসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের কি ব্যবস্থা হবে? সিরিয়া ও ইরাকের এ শহর ও অন্য শহরের অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ বংশধর ও বিধবাদের কি উপায় হবে? তবু সাহাবিরা উমর রা.-কে চাপ দিতে থাকেন এবং বলেন : 'যারা যুদ্ধ করেনি বা যুদ্ধ দেখেনি আপনি তাদের ও তাদের সন্তন-সন্ততিকে দেয়ার কথা ভাবছেন অথচ এসব আমরা তলোয়ারের সাহায্যে জয় করেছি এবং আল্লাহ্ আমাদের দান করেছেন?' এ কথার উত্তরে উমর রা. আর কিছু না বলে শুধু মন্তব্য করেন, 'এটা আমার মত।'

হযরত উমর রা.-কে তখন এ ব্যাপারে অন্যদের পরামর্শ নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। তখন তিনি প্রবীণ মুহাজিরদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু কোনো একক সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হতে পারলেন না। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. পুনরায় পরামর্শ দিলেন যে, তাদের অধিকার তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোক। উসমান, আলী, তালহা ও ইবনে উমর র.-এর মত উমর রা.-এর মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উমর রা. তখন আনসারদের মধ্যে থেকে দশজন, আউস গোত্র থেকে পাঁচজন এবং খাযরাজ গোত্র থেকে পাঁচজন বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে ডাকলেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি আপনাদের এজন্য কষ্ট দিলাম যে, আপনারা আমার ওপর যে কাজের ভার দিয়েছেন, তারই কিছুটা ভার আপনারা গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের মতোই একজন। আজ আপনারা যথার্থ সিদ্ধান্ত দেবেন। আপনারা ইচ্ছা করলে আমার মতের সাথে একমত হতে পারেন, আবার নাও হতে পারেন। আমি যা ইচ্ছা করি আপনারাও তাই ইচ্ছা করবেন, এটা আমি আশা করি না। আল্লাহ্র পবিত্র কিতাব আপনাদের কাছে আছে, যেখানে আপনারা সত্য খুঁজে পাবেন। আল্লাহ্র কসম, আমি যা ইচ্ছা করি, তাই বলেছি এবং আমার ইচ্ছা যথার্থ।'

আনসারগণ তখন বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন ! আপনি বলুন, আমরা শুনি।' তিনি তখন তাদের কাছে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে মত প্রদানের আহ্বান জানালে তাঁরা তাঁর মতকেই সমর্থন করলেন। তারপর জমির মালিকদের অধিকারেই জমি রাখার সিদ্ধান্ত হলো এবং সেই ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমি-কর ধার্য করা হলো। ভিন্নমত পোষণকারীগণ তখন উক্ত মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নীরব থাকলেন।

রসূলুল্লাহ্ স.-এর অনুগামী ও উত্তরাধিকারীদের আচরণের এটা একটা অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁদের দূরদর্শিতার দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একটা বড় রকম বিবাদের ফয়সালা হয়ে যায়। উমর রা. আগাগোড়াই এমন অভিমত পোষণ করে আসছিলেন। এরপর থেকে হযরত উমর রা. জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় এমন

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, যা ইসলামে অধিকাংশ জ্ঞানবৃদ্ধ ও বিদ্বান লোক তথা আহ্‌ল-আল-শুরা সমর্থন করতেন।[১]

তাই বলা যায়, জনকল্যাণের পথে ইসলামী শরী'আহ্ কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ শরী'আহ্ এসেছে জনকল্যাণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য।

৬.৩.৫. পর্দার বিধান : 'জিলবাব' পরিধানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশনা, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ—'তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের জিলবাব বা চাদর আবৃত করে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।'[২]

উক্ত আয়াতে নারীদেরকে জিলবাব বা চাদর আবৃত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, নারীদের অঙ্গ ঢেকে রাখা, তাদেরকে সহজে চেনা ও তাদেরকে উত্ত্যক্ত করার সমস্যা দূর করা। বর্তমানে এ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সম্পর্কে ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, জিলবাব মূলত উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো এমন পোশাক পরা যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব অঙ্গ ঢেকে রাখার কথা বলেছেন, তা ঢেকে রাখা যায়। তার নাম ও রূপ যাই হোক না কেন। সময় ও পরিবেশের পরিবর্তনের আলোকে সে পোশাকও পরিবর্তিত হতে পারে।[৩]

৬.৩.৭. শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করা : রাসূলুল্লাহ্ স. نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ—শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন।[৪] কাফিররা কুরআনের অসম্মান ও ক্ষতি করবে এই আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ্ স. এ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। কিন্তু এ আশঙ্কা থেকে মুক্ত হলে শত্রু দেশ সফরের সময় কুরআন সঙ্গে নিয়ে যাওয়াতে কোনো বাধা নেই।

৬.৩.৮. তাৎক্ষণিকভাবে স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ না করা : রাসূলুল্লাহ্ স. মুসাফির পুরুষদেরকে দীর্ঘ সফর হতে ফিরে এসে রাতের বেলা স্ত্রীর বাড়িতে বা ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে : يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا—'রাসূলুল্লাহ্ স. সফর থেকে এসে রাতে ঘরে প্রবেশ করা অপছন্দ করতেন।'[৫] তিনি নিজেও নিজের পরিবারের কাছে রাতে আসতেন না। তাদের কাছে সকাল বা বিকেল বেলা ফিরতেন।

---

[১]আবদুর রহমান আয্‌যম, মহানবী (সা)-এর শাশ্বত পয়গাম, অনুবাদ- আবু জাফর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৭।

[২]আল কুরআন, ৩৩ : ৫৯।

[৩]ড. ইউসুফ আল কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

[৪]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়ার, বাবুস সাফরি বিলমুসাহিফি ইলা আরদিল আদুব্বি।

[৫]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুন নিকাহ, বাবু লা ইয়াতরুক আহলাহু লাইলান ইযা আতালাল গাইবাতা...।

www.pathagar.com

তাৎক্ষণিকভাবে স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ না করা সম্পর্কে মুজতাহিদগণ দুটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে হঠাৎ করে ঘরে প্রবেশ করে তার এমন অপছন্দনীয় কিছু চোখে পড়তে পারে যাতে করে স্ত্রীর প্রতি কুধারণা জন্ম নিতে পারে যা পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রী যেন স্বামীর আগমন সংবাদ জেনে নিতে পারে। যাতে সে সাজগোজ করতে পারে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে স্বামীকে স্বাগত জানাতে পারে।

কিন্তু বর্তমানে মুসাফির পুরুষ রাতে-দিনে যখন খুশি স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতে পারে যদি স্ত্রীকে তার আগমনের সংবাদ আগে পৌঁছানো যায়। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে বর্তমানে মোবাইল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করা যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ স. এরসময় তা সম্ভব ছিল না।

৬.৩.৯. মাহরাম ব্যতীত নারীদের সফর : সহিহ্ হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ—'নারী মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে না।'[১] এ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণপূর্বক ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, নারী একাকী কিংবা পর-পুরুষের সাথে সফর করলে তার ইজ্জত-আবরু বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ কথাটি এমন এক সময় বলা হয়েছিল যখন উট, গাধা ও খচ্চরের পিঠে চড়ে সফর করতে হতো। তাতে মরুভূমি ও উপত্যকা পাড়ি দিতে হতো যেখানে জনবসতি থাকত না। এ জাতীয় সফরে নারীর ইজ্জত-আবরু প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি না হলেও তার সম্বন্ধে জনমনে কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বিমান কিংবা রেলগাড়িতে সফর করলে সে আশঙ্কা অনেকটা কম থাকে। কেননা, সেখানে নারীদের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিমানে ও রেলগাড়িতে বহুসংখ্যক লোক থাকে। ফলে সেখানে নারী একাকী সফর করলেও তার ইজ্জত-আবরু বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তেমন একটা থাকে না। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকলে ট্রেন কিংবা বিমানেও মাহরাম ছাড়া নারীদের সফর শরী'আহ্সম্মত নয়। তাই বলা যায়, নিরাপত্তা থাকলে নারীর একাকী সফর অবৈধ নয়।

নিরাপত্তা থাকলে নারীরা একাকী সফর করতে পারবে–এ সম্পর্কিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, 'এমন একদিন আসবে যে দিন হাওদানশীল কোনো নারী হিরা শহর থেকে বের হয়ে বাইতুল্লাহ্ শরিফ তাওয়াফ করবে। সে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।'[২]

---

[১]সহিহ আল বুখারি ও সহিহ মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু সাফারিন মারায়াতি মা'আ মুহরিম... ।
[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিন নবুওয়াত ফিল ইসলাম।

www.pathagar.com

ড. ইউসুফ আল কারযাভি আরো বলেন, আমরা এমন কিছু ইমাম দেখতে পেয়েছি (ইমাম শাফ'ঈ র. ও ইবনে তাইমিয়া র.) যারা নারীদেরকে মাহরাম ও স্বামী ছাড়াই বিশ্বস্ত মহিলাদের সাথে কিংবা নির্ভরযোগ্য লোকের সাথে হজ্ব করার অনুমতি দিয়েছেন। এভাবেই আয়শা রা.-সহ উম্মাহাতুল মুমিনিনের একটি দল উমর রা.-এর যুগে হজ্ব করেছিলেন তখন তাদের সাথে কোনো মাহরাম ছিল না; বরং তাদের সাথে ছিলেন উসমান ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.।[১]

৭. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ফিকহি রীতিনীতি

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্‌র ভিত্তিতে ফকিহ্‌গণ অনেকগুলো আইনি রীতিনীতি পেশ করেছেন, যার দ্বারা আইন বিষয়ক অনেক বিধান রচনা করা যায়। এ বিষয়ে ইমাম গাযালি র., ইমাম শাতিবি র. ও ইয্য ইবনে আব্দুস সালাম র. রচিত গ্রন্থাদিতে বেশ ক'টি রীতিনীতির উল্লেখ রয়েছে[২] :

এক. যেসব উপায়-উপকরণ পাঁচটি আবশ্যকীয় বিষয় যেমন, দীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য জরুরি তা মাসলাহা বা কল্যাণকর এবং যেসব উপায়-উপকরণ উক্ত পাঁচটি বিষয়ের জন্য ক্ষতিকর তা মাফসাদা বা অকল্যাণকর।

দুই. সমস্যার সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে দীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদের সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এমন কোনো সমাধান পেশ করা যাবে না যাতে করে উক্ত পাঁচটি বিষয়ের ক্ষতি হয়।

তিন. দুটি ক্ষতির মধ্যে একটিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হলে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষতিটি বর্জন করে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিটি গ্রহণ করতে হবে।

চার. কল্যাণ সাধনের আগে অকল্যাণ দূর করা শরী'আহ্ প্রণেতার দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য।

পাঁচ. শরী'আহ্ প্রণেতা কোনো কাজের প্রশংসা করলে কিংবা নির্দেশ দিলে বুঝা যায় যে, তিনি কাজটির বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করেন।

ছয়. শরী'আহ্ প্রণেতা কর্তৃক কোনো কাজ না করার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি চান কাজটি পরিত্যক্ত হোক।

সাত. কোনো বিধান জারি করতে হলে তা যেন অত্যন্ত সহজে পালন করা যায় সে দিকে নজর দিতে হবে।

---

[১] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

[২] ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, ইসলামী শরী'আহ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

www.pathagar.com

৮. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ও অগ্রাধিকার ফিকহ্

মুজতাহিদকে নতুন সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে আকার ও সামর্থ্য, মূল্য ও ফলাফল এবং সহনক্ষমতার আলোকে একটির ওপর অন্যটিকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। ভালো বিষয়গুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন অগ্রাধিকার দিতে হয় তেমনি মন্দ পরিহার করার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দিতে হয়। ইসলামী শরী'আহ্‌র প্রকৃত মর্ম যথার্থভাবে উপলব্ধির পর কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ এই অগ্রাধিকার নীতি গ্রহণ করে থাকেন। প্রচলিত ফিকহে যেমন ফরযকে নফলের ওপর এবং ফরযে আইনকে ফরযে কেফায়ার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়, একইভাবে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্‌তে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদাকে অপরিহার্য (জরুরিয়াত), প্রয়োজনীয় (হাজিয়াত) ও সৌন্দর্যবোধক (তাহসিনিয়াত) এই তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথমে জরুরিয়াত, তারপর হাজিয়াত এবং সর্বশেষে তাহসিনিয়াত গুরুত্ব পাবে। এই তিনটিকে একই সাথে অর্জন করা সম্ভব না হলে জরুরিয়াতকে প্রাধান্য দিতে হয়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরিয়াতের কারণে হারামও বৈধ হয়ে যায়।

সাধারণ মানুষও তাদের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহে এই অগ্রাধিকার ফিকহ্ (ফিকহুল আওলাউইয়্যাত- فِقْهُ الْأَوْلَوِيَّاتِ) ও ভারসাম্য ফিকহ্ (ফিকহুল মুয়াযানাত-فِقْهُ الْمُوَازَنَاتِ) অনুশীলন করে থাকে। এ পৃথিবীতে মানুষ খুব কম সময়ই বেঁচে থাকে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাকে অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু সব কাজ করার সময়, সুযোগ ও সামর্থ্য তার নেই। তাই তার কাজগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস করতে হয় এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আগে সম্পন্ন করতে হয়। একটি কাজকে গুরুত্ব দেয়ার অর্থ এই নয় যে অন্য কাজটির কোনোই গুরুত্ব নেই। বরং ইসলামে যা করতে বলা হয়েছে তার সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ এবং সবকিছুই অর্জন করা মানুষের মূল লক্ষ্য।

একা একা সব কাজ সম্পন্ন করা যায় না তাই মানুষ গঠন করেছে সমাজ। এই সমাজের এক একজন একেকটি কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এই সমাজও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই আগে সম্পন্ন করে থাকে। আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্ স. একজন সাহাবিকে জিহাদের পরিবর্তে তাঁর অসুস্থ মায়ের খিদমতে থাকতে বলেছিলেন। তাঁকে তাঁর মায়ের খেদমতে থাকতে বলার অর্থ এই নয় যে ইসলামে জিহাদের মর্যাদা মায়ের খিদমতের চেয়ে কম। অবশ্যই

www.pathagar.com

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। কিন্তু উক্ত সাহাবি জিহাদে গেলে তাঁর অসুস্থ মায়ের সেবা করার কেউ থাকত না। অন্য দিকে তাঁকে ছাড়াও জিহাদে যাওয়ার জন্য অনেক সাহাবি প্রস্তুত ছিলেন। তাই উক্ত সাহাবিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁর মায়ের সেবা করার জন্য বলা হয়েছিল।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার দৈনন্দিন কার্যাবলিকে গুরুত্বানুসারে তিন ভাগে ভাগ করে নেয়। এ ভাগগুলোকে সংক্ষেপে MSC বলা হয়।

ক. M= Must do অর্থাৎ, অবশ্যই করতে হবে।
খ. S = Should do অর্থাৎ, করা উচিত।
গ. C = Can do অর্থাৎ, করতে পারো।

ড. ইউসুফ আল কারযাভি সামর্থ্য, সময়, ফলাফল ও সহনক্ষমতার ভিত্তিতে কোন কাজটির চেয়ে কোন কাজটি গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শরী'আহ্‌র ফিকহ্ ও বাস্তবতার ফিকহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ওপরও গুরুত্ব দেন। এ বিষয়ে ইমাম গাযালি র. তাঁর 'আল-মুসতাশফা' ও ইমাম শাতিবি র. তাঁর 'আল-মুওআফাত' গ্রন্থে অনেক আগেই আলোচনা করেছেন।

মানুষের কাজ সাধারণত দু' ধরনের। ভালো কাজ ও মন্দ কাজ। ভালো কাজগুলোকে যেমন গুরুত্বানুসারে সাজাতে হবে তেমনি খারাপ কাজগুলো পরিহারের ক্ষেত্রেও সেগুলোকে খারাপের মাত্রার আলোকে সাজাতে হবে। মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্‌র অগ্রাধিকার তত্ত্বে এরকম অনেক রীতিনীতির উল্লেখ রয়েছে। এর ক'টি হলো :

এক. সব ভালো কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তা সম্ভব না হলে ভালো কাজগুলোর মধ্যে কোনোটিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোনোটিকে স্থগিত রাখতে হবে।

দুই. সব মন্দ পরিহার করতে হবে। কিন্তু সব মন্দ পরিহার করা না গেলে মন্দের মাত্রার ভিত্তিতে অধিক মন্দটি আগে পরিহার করতে হবে।

তিন. ভালো ও মন্দ বিষয়গুলো সাংঘর্ষিক হলে ভালো লাভের চেয়ে মন্দকে পরিহারের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

চার. বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত হলে উচ্চতর স্বার্থে নিম্নতর স্বার্থ এবং সামষ্টিক স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থের মালিকের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া উচিত।

পাঁচ. পরস্পর বিরোধী স্বার্থের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি স্বার্থের স্থলে দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ, স্থায়ী স্বার্থ তুচ্ছ স্বার্থের স্থলে এবং অনিশ্চিত স্বার্থের স্থলে সুনিশ্চিত স্বার্থের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

www.pathagar.com

ছয়. আনুষঙ্গিক কল্যাণের ওপর মৌলিক কল্যাণকে প্রাধান্য দিতে হবে।

সাত. দুটি মন্দের মধ্যে যদি একটিকে গ্রহণ করতেই হয় তাহলে যেটি কম ক্ষতিকর তা বেছে নেয়া যেতে পারে।

আট. ছোট ক্ষতি মেনে নেয়া যায় যদি তাতে একটি বড় ক্ষতি পরিহার করা যায়।

নয়. বড় ক্ষতি নির্মূলের স্থলে ছোট ক্ষতির নির্মূলকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত নয়।

দশ. বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তির সামান্য ক্ষতি মেনে নেয়া যেতে পারে।

৮.১. অগ্রাধিকার ফিকহ্'র প্রামাণিকতা

ইসলামে আমলের আগে ঈমানের স্থান। ঈমান হচ্ছে ভিত্তি আর আমল হচ্ছে দেয়াল। একটি সহিহ হাদিসে ঈমানের ৭৭টি শাখার কথা বলা হয়েছে। এর সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'–এই কথার সাক্ষ্য দেয়া আর সর্বনিম্ন স্থান হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। এখানে একটি বিষয়ের ওপর অন্য বিষয়ের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এমনিভাবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্তে অগ্রাধিকার ফিকহ্র (ফিকহুল আওলাউইয়্যাত) বহু দলিল-প্রমাণ রয়েছে। তা থেকে দুটি তুলে ধরা হলো :

এক. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا—'তারা আপনাকে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, উভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কল্যাণও কিছু আছে। আর এ দুটোর মধ্যে কল্যাণ অপেক্ষা পাপই অধিক গুরুতর।'[১] এ আয়াতে সামান্য কল্যাণের ওপর গুরুতর ক্ষতিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

দুই. দুটি ক্ষতির মাঝে কম ক্ষতিকরটিকে বেছে নেয়ার দৃষ্টান্তে দেখা যায় খিজির আ.-এর নৌকা ফুটো করার ঘটনার মধ্যে। ঘটনাটি হলো, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا—'সেই নৌকাটির ব্যাপার ছিল এই যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরিব লোকের, তারা সাগরে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ তাদের পশ্চাতে ছিল এমন এক রাজা, যে প্রত্যেকটি নৌকা জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিত।'[২]

নৌকাটি ফুটো করে দেয়া একটি ক্ষতির কাজ। কিন্তু এ কাজটি করতে হয়েছিল বড় একটি ক্ষতির হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য। ফুটো করে নৌকাটি

---

[১]আল কুরআন, ২ : ২১৯।

[২]আল কুরআন, ১৮ : ৭৯।

www.pathagar.com

ডুবিয়ে দেয়ার মাধ্যমেই জালিম বাদশাহ্‌র কবল থেকে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। এখানে নৌকাটি একেবারে হারানোর চেয়ে ফুটো করে তা রক্ষা করা ছিল কম ক্ষতিকর।

৮.২. রাসূলুল্লাহ্ স.-এর অগ্রাধিকার নীতি

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বিভিন্ন বাণী ও কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বহু ক্ষেত্রেই একটি বিষয়কে অন্য বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা দেখি যে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ স. হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত, মৌলিক ও দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ বিবেচনায় রেখে সন্ধির ক্ষেত্রে অনেকটা ছাড় দিয়েছেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে সাময়িক স্বার্থের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সাধারণ দৃষ্টিতে অনেকের কাছেই তা যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না। তিনি সেদিন এমনসব বিষয় মেনে নিয়েছিলেন যা সাধারণভাবে অনেকের কাছে বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে অন্যায্য ও অবমাননাকর বলে মনে হয়েছিল। সেদিন তিনি 'পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে' বাক্যটির পরিবর্তে 'হে প্রভু তোমার নামে' এবং 'আল্লাহ্‌র রাসূল' কথাটির পরিবর্তে 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্' লিখতে রাজি হয়েছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا—'নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি'[১] আয়াতটি নাযিল হলে এক ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বললেন, এটা কেমন বিজয়। বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে আমাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছে, আমাদের কুরবানির উটগুলোও সামনে অগ্রসর হতে পারেনি, রাসূলুল্লাহ্ স.-কে হুদাইবিয়াতে থামতে হয়েছে এবং সন্ধির ফলেই আমাদের দুই মজলুম ভাই আবু জানদাল ও আবু বাসিরকে জালিমদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এ কথাটি নবী স.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, এটা অত্যন্ত ভুল কথা। প্রকৃতপক্ষে এটা বিরাট বিজয়।[২] পরবর্তীতে সত্যই প্রমাণিত হয়েছিল এ সন্ধির মধ্যেই মুসলমানদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ নিহিত ছিল। তাই মহান আল্লাহ্ এই সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর আমলে অগ্রাধিকার নীতির আরো একটি প্রমাণ হলো তাঁকে 'কোন ইবাদত উত্তম'–এমন প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজকে উত্তম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ

---

[১]আল কুরআন, ৪৮ : ১।

[২]সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী র., তাফহিমুল কুরআন, সুরা আলফাতহ-এর ১নং আয়াতের তাফসির দ্র.।

www.pathagar.com

রা. নবী করিম স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট কোন্ আমল সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়?' তিনি বললেন, 'সময়মতো সালাত আদায় করা।' (আব্দুল্লাহ্) জিজ্ঞেস করলেন : 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন : 'পিতামাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করা।' আব্দুল্লাহ্ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন : 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।' আব্দুল্লাহ্ বললেন : 'নবী করিম স. এগুলো সম্পর্কে আমাকে বলেছেন। আমি যদি তাঁকে আরো বেশি প্রশ্ন করতাম, তিনি আমাকে অধিক জানাতেন।'[১]

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি জিহাদে যাবো?' রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'তোমার পিতামাতা বেঁচে আছেন কি?' লোকটি জবাব দিলেন, 'হাঁ।' তখন তিনি বললেন, 'তাদের দুইজনের মধ্যে জিহাদ করো (খিদমত করো), এটাই তোমার জন্য জিহাদ হবে।'[২]

৮.৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. এর অগ্রাধিকার নীতি

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. একটি অনৈসলামী রাষ্ট্রে কোনো মুসলমানের সরকারি পদ গ্রহণ অনুমোদনযোগ্য বলে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছিলেন, যদি সংশ্লিষ্ট পদাধিকারী ব্যক্তি কিছু কিছু অন্যায়-অবিচার প্রতিকার অথবা অসৎ কাজ ও দুর্নীতি দমনে ইচ্ছুক হন।'[৩] তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বলেছিলেন, হজ্ব সম্পাদনের চেয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ উত্তম। হাম্বলি ফকিহগণও জিহাদকে সর্বোত্তম শারীরিক আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাদিসেও এর ইঙ্গিত রয়েছে। জনৈক সাহাবি একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন–যেখানে একটি মিঠাপানির ঝরনা ছিল। নির্মল-স্বচ্ছ এই ঝরনার পানির স্বাদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল। তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি যদি লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই উপত্যকায় থেকে যেতাম! কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল স.-এর কাছে অনুমতি না নিয়ে আমি এটা করতে পারি না। সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট তাঁর ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ স. তাঁকে বললেন, এরূপ করো না। তোমার ঘরে বসে সত্তর বছর সালাত আদায় করার চেয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অনেক উত্তম।[৪]

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আদাব, বাবুল বিররি ওয়াস্‌সিলাহ।
[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আদাব, বাবু লা ইউজাহিদু ইল্লা বিইজনিল আবাওয়াইনি।
[৩]ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, প্রাগুক্ত, ২০০৩, পৃ. ৪০।
[৪]সহিহ আত-তিরমিযি, তাহকিক, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, কিতাবু ফাদায়িলিল জিহাদ আন রাসূলিল্লাহ্ স., বাবু মা জায়া ফি ফাদলিল গুদূব্বি ওয়াররাওয়াহি ফি সাবিলিল্লাহ।

www.pathagar.com

৮.৪. ইবনুল কাইয়্যিম র. এর অগ্রাধিকার নীতি

ইবনুল কাইয়্যিম র.-কে কোন ইবাদত-বন্দেগি করা উত্তম–এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে একমাত্র পছন্দের ইবাদত বলতে কিছু নেই। তবে কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ইবাদত করা পছন্দনীয় হতে পারে।[১] যেমন দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা সর্বোত্তম কাজ, এতে একজন মুসলমান আল্লাহ্ তা'আলার অধিক নৈকট্য লাভে সক্ষম হতে পারে। তা ছাড়া যখন কোনো কুফুরি শক্তি কোনো মুসলিম দেশ আক্রমণ করে বসে তখন জিহাদ সর্বোত্তম ইবাদত হতে পারে। আবার কোনো আলিম মৃত্যুবরণ করলে যদি তার উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে দীনি জ্ঞান অর্জন করা অধিক উত্তম কাজ।

৮.৫. ইমাম গাযালি র. এর অগ্রাধিকার নীতি

ইমাম গাযালি র. যারা সকল ধরনের সৎকর্মের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবল ইবাদত বন্দেগিতে সন্তুষ্ট থাকেন তাদের সমালোচনায় বলেন, 'আরেক দল নফলের ব্যাপারে যতটা আগ্রহী ফরযের ব্যাপারে ততটা নয়। তারা নফল সম্পন্ন করে যতটা খুশি হন ফরয সম্পন্ন করে ততটা আনন্দ পান না।' তাদের সমালোচনায় তিনি আরো বলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর হাদিসের কথা ভুলে যান। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'আমি যেসব কাজ ফরয করেছি সেগুলো ছাড়া আমার বান্দাহ্র আর কোনো কাজ আমার অধিকতর নৈকট্যলাভের জন্য অধিক উত্তম হবে না।'[২]

ইমাম গাযালি র.-এর অগ্রাধিকার নীতি আলোচনা করতে গিয়ে ড. ইউসুফ আল কারযাভি উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি পিতা-মাতার ব্যয়ভার মেটাতে না পেরেও হজ্ব পালন করতে চায়, তবে সেক্ষেত্রে তার হজ্ব না করাই উচিত। যদি সে হজ্বে যায় তবে সে মূর্খের মতো কাজ করবে। কারণ তার উচিত ছিল পিতামাতার ব্যয়ভার মেটানো। একইভাবে কারো পূর্বনির্ধারিত কাজের সময় যদি জুমু'আর সালাতের ওয়াক্ত হয় তবে তার জামা'আতে শরিক হতে হবে। যদি সে জুমু'আর সালাত ত্যাগ করে পূর্বনির্ধারিত কাজ করে তবে সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল- যদিও প্রতিশ্রুত পূর্বনির্ধারিত কাজটি করা তার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। একইভাবে কেউ তার কাপড়ে নাপাকি দেখে যদি পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ করে তবে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নাপাকি খারাপ ঠিকই কিন্তু এ জন্য পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
[২]সহিহ আল বুখারি।

www.pathagar.com

হতে পারে না। নাপাকি থেকে সাবধান হওয়া উচিত কিন্তু তার চেয়ে বেশি জরুরি হলো পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ না করা।[১]

৮.৬. আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র. এর অগ্রাধিকার নীতি

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. এক সৈন্যশিবির থেকে তার বন্ধু আল ফুজায়েল ইবনে ইয়াদ, যিনি সব সময় পবিত্র মক্কা ও মদিনায় সফর করতেন তাকে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'হে দুই পবিত্র স্থানে ইবাদতকারী, তুমি যদি আমাদেরকে দেখতে, তাহলে জানতে তোমার ইবাদত কেবলি খেলা। কেউ কেউ তাদের অশ্রু দিয়ে গণ্ডদেশ ভেজায়; আর আমরা নিজেদের রক্তে বুক ভেজাই।'[২]

৮.৭. অন্যান্য মনীষীর অগ্রাধিকারনীতি

আধুনিক যুগের মুজতাহিদগণও অগ্রাধিকার ফিকহ্ ও ভারসাম্য ফিকহের আলোকে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে ক'টি দৃষ্টান্ত নিচে তুলে ধরা হলো :

এক. ১৯৯০ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে শায়খ আব্দুল হামিদ আল সায়েহ, শায়খ মুখতার আল সালামি, ড. আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহসহ বিশ্ব খ্যাত কয়েকজন ফকিহ্ ও অর্থনীতিবিদ এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, মুসলিম দেশগুলোতে অনুমোদিত খাতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বেচাকেনা করা শরী'আহ্র দৃষ্টিতে বৈধ। যদিও এরূপ লেনদেনে সুদের সংশ্লিষ্টতার কিঞ্চিত সন্দেহ থাকে। ভারসাম্য ফিকহ্'র আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উক্ত সেমিনারে মত প্রকাশ করা হয় যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর খাত অমুসলিম অথবা অধার্মিক মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা, এ পদক্ষেপ বিশেষত কোনো কোনো দেশে মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তাই শেয়ারহোল্ডারগণ সুদ-সংশ্লিষ্ট লেনদেন থেকে যে লভ্যাংশ পান বলে মনে করেন আনুপাতিকভাবে সেই অংশটি সাদাকাহ্ বা জনহিতকর কাজে দান করার পরামর্শ দেন। অনুরূপভাবে মুসলিম তরুণদেরকে ব্যাংক ও ইন্সুরেন্সের মতো কোম্পানিগুলো থেকে চাকরি ছেড়ে না দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এতে কিছু গোনাহের আশঙ্কা থাকলেও তারা সেখান থেকে যে অভিজ্ঞতা পাবে তা ইসলামী অর্থনীতির বিকাশে কাজে লাগতে পারে।[৩]

---

[১] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

www.pathagar.com

দুই. মিসরের আল আজহারের 'দারুল ইফতা'-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, বারবার 'হজ্ব ও উমরা পালন করা আর অভাবীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা'-এ দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, এক বার হজ্ব ও উমরা পালনের পর বারবার তা পালন করা ফরয নয়। বরং এ দুটি আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য হাসিলের নিমিত্তে ঐচ্ছিক ও নফল ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্দেরকে সৎকাজের নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে শরী'আহ্র মূলনীতি ও হিকমত নির্ধারণ করেছেন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদানের ভিত্তিতে। এই মূলনীতি ও হিকমত অনুসারে প্রশ্নকারী ও তার মতো ব্যক্তিদের উচিত তার অসহায় মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণে এবং তাদের কল্যাণসাধনে অগ্রাধিকার দেয়া। সুতরাং দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগব্যাধির শিকার মুসলিম ভাইদের অসহায় অবস্থায় রেখে এসে কোনো ব্যক্তির কাবাগৃহ তাওয়াফ করার প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নেই। তাই একবার হজ্ব করার পর প্রশ্নকারীর উচিত হবে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ সৎপন্থায় তথা দরিদ্র ও অভাবীদের মাঝে ব্যয় করা।[১]

তিন. অগ্রাধিকার ও ভারসাম্য ফিকহ্ আলোচনা করতে গিয়ে ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, অনেকেই অগ্রাধিকার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না। তারা পিঁপড়ের রক্তপাতের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান কিন্তু ইমাম হোসাইন রা.-এর রক্তপাতের বিষয় নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। রমাযান কিংবা অন্যান্য মাসে লাখ লাখ মানুষ উমরাহ্ পালন করেন এবং কেউ কেউ ১০ বার ২০ বারের বেশি হজ্ব করেন। কিন্তু তাদের কাজে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য সাহায্য কামনা করলে তারা তাতে অংশগ্রহণে আগ্রহী নন। অথচ সেটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনো কখনো তা ফরযও ছিল। কিন্তু উমরা ও অতিরিক্ত হজ্ব আদায় করা ছিল নফল।[২]

৯. অগ্রাধিকার ফিকহ্ অনুসরণের অপরিহার্যতা

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামী শরী'আহ্র সকল বিধিবিধান একই স্তরের নয়। নির্দেশিত কাজের মধ্যে যেমন মুস্তাহাবের ওপর ফরযের প্রাধান্য তেমনি নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে মাকরুহ্-এর ওপর হারামের প্রাধান্য। আবার ব্যক্তি স্বার্থের সাথে জড়িত ফরয কাজের ওপর জাতিগত স্বার্থের সাথে জড়িত ফরযের গুরুত্ব রয়েছে। একইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইবাদতের ওপর সামষ্টিক ইবাদত এবং

---

[১]ইসলামিক ফাইন্যান্স, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ-এর বুলেটিন, সংখ্যা ৬, মে ২০১০, পৃ. ৯।

[২]ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

www.pathagar.com

যে কাজের ফায়দা একক ব্যক্তি লাভ করবে তার ওপর যে কাজের ফায়দা বহু মানুষ লাভ করবে তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য সকল নির্দেশিত কাজ একসাথে সম্পাদন করা সম্ভব না হলে এবং সকল নিষিদ্ধ কাজ এক সাথে বর্জন করা সম্ভব না হলে গুরুত্বানুসারে তা অর্জন ও বর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্‌র অগ্রাধিকার ও ভারসাম্য নীতি অনুসরণ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অগ্রাধিকার নির্ধারণের ব্যর্থতার কারণে ব্যক্তি ও জাতিকে ব্যাপক খেসারত দিতে হতে পারে। উল্লেখ্য যে, একসময় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিকে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করা হতো না। আর এটিই বিশ্বব্যাপী মুসলিম শাসনের পতনের একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বর্তমানে অগ্রাধিকারনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নিচের বিষয়গুলোর ওপরও গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

৯.১. বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান : আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। কিন্তু শুধু কতিপয় ফরয ইবাদত পালন করে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর কাজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর মানুষের নির্ভরতা বেড়ে গেছে। এগুলোর নিত্য-নতুন আবিষ্কার মানুষের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। বর্তমানে এমন কোনো সমাজবদ্ধ মানুষ নেই যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে কোনো ধরনের সহায়তা নেয় না। তাই মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত সকল বিষয় ও কাজে নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তিকে দক্ষ করে তুলতে হবে। কেননা, সকলের মধ্যে এসব বিষয়ে প্রতিযোগিতা থাকে। খালেছ নিয়তে যারা এসব কাজে পারদর্শী হবেন তাদের এসব কাজ ইবাদত ও জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে।

ইসলামে পেশাদারিত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমার যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস করো।'[১] দীনের জ্ঞানে যেমন বিশেষজ্ঞ আছে তেমনি বিশেষজ্ঞ আছে অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রতিরক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে। মুসলিমদের মধ্যে সকল বিষয়েই বিশেষজ্ঞ থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাহাবিরা ইসলাম গ্রহণের আগে অনেকেই অনেক কাজে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে সেসব পুরনো পেশা ছেড়ে দিয়ে শুধু ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য ছুটে আসতে বলা হয়নি।

---

[১]আল কুরআন, ১৬ : ৪৩।

www.pathagar.com

আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন, ঋতুর পরিবর্তন, দিবস ও রজনীর আবর্তন, মেঘের সঞ্চালন, বৃষ্টিবর্ষণ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাগবেষণার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশনার ওপর আমল করার কারণে অতীতে মুসলমানদের জীবন আবিষ্কারের নেশায় পরিণত হয়েছিল। এরই কারণে মধ্যযুগে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম জাতি সারা বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এর পর থেকে তারা এসব বিষয়কে গুরুত্বহীন মনে করতে থাকে। অবস্থা এতোটাই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, এক সময় তারা আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত শত্রুর মোকাবেলা করতে পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

৯.২. অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন : ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতে ঈমানদার মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা থাকলে সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত হবে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে। ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং পরিশ্রম করে হালাল উপার্জনকে সালাত ও সাওমের মতোই ফরয গণ্য করা হয়। ইসলামে দাতার হাতকে গ্রহীতার হাত থেকে উত্তম বিবেচনা করা হয়। কিন্তু অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতকে গুরুত্বহীন মনে করে তা থেকে দূরে থাকার কারণে অতীতে মুসলিম জাতিকে ব্যাপক খেসারত দিতে হয়েছিল।

ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. ও তাঁর সাহাবিগণ ইসলামকে ফকির-দরবেশের ধর্ম মনে করেননি। তাঁরা ঈমান ও দীনদারিকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি অথবা উন্নত জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে একমাত্র দীনদারি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাননি। যেমন সা'দ ইবনে আল রবি রা.-এর কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ দান গ্রহণের প্রস্তাব পেয়েও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন : আমি ব্যবসায়ী, বাজার কোথায়, আমাকে দেখিয়ে দিন। তিনি ব্যবসা করে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেন। আর এ ব্যবসা তাঁর ঈমান ও দীনদারিকে সামান্যও ক্ষুণ্ন করেনি, বরং তিনি ছিলেন বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের মধ্যে অন্যতম।[১]

---

[১]উদ্ধৃতি : ড. ইউসুফ আল কারযাভি, আধুনিক যুগ, ইসলাম, কৌশল ও কর্মসূচি, প্রাগুক্ত, ২০১১, পৃ. ৬৪।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ও অবারিত মানবকল্যাণ

১. মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ও অবারিত মানবকল্যাণ

আল কুরআনে কল্যাণের আরবি সমার্থক 'ফালাহ্' (فلاح) শব্দটি বিভিন্নরূপে ৪০ বার এবং এর ফালাহের অন্য অর্থ 'সাফল্য'-এর প্রতিশব্দ 'ফাউজুন' (فوز) শব্দটি বিভিন্নরূপে ২৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

ইসলামের একটি প্রধান ইবাদত সালাতকে বলা হয়েছে কল্যাণের মাধ্যম। প্রতিদিন মুয়াজ্জিন পাঁচ বার আযানের সময় 'হাইয়ালাল ফালাহ্' বা কল্যাণের দিকে এসো বলে মানুষকে সালাতের দিকে ডেকে থাকে। ইসলামী শরী'আহ্র প্রধান উৎস কুরআন এবং এর উপস্থাপক রাসূলুল্লাহ্ স.-কে বলা হয়েছে রহমত। একইভাবে 'মাসালিহ্ মুরসালাহ্' বা অবারিত জনস্বার্থকে ইসলামী শরী'আহ্র আরো একটি উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, মানবতার কল্যাণ সাধনই শরী'আহ্। অন্যভাবে বলা যায়, কল্যাণই শরী'আহ্ কিংবা শরী'আহ্ই কল্যাণ। ইসলামে মানবতার কল্যাণকে এতোই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে যে, একে একই সাথে শরী'আহ্র প্রধান লক্ষ্য ও উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ বা শরী'আহ্র একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো মাসলাহা বা কল্যাণ বা কল্যাণকে আইনে পরিণত করা। অপরদিকে শরী'আহ্র একটি উৎস মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা অবারিত জনস্বার্থের উদ্দেশ্যও হলো কল্যাণকে আইন প্রণয়নের মানদণ্ডে পরিণত করা। মূলত মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ও মাসালিহ্ মুরসালাহ্ একই পরিভাষার দুটি নাম। এ দুটির উদ্দেশ্যও এক। আর তা হলো মানবতার কল্যাণ সাধন।

মাসলাহা বা কল্যাণ হলো মঙ্গল, ভালো ও সুন্দরের সমষ্টি। মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়, বিশেষ করে দীন বা ধর্ম, নফস বা জীবন, আকল বা জ্ঞান, মাল বা সম্পদ ও নসল বা বংশ এই পাঁচটি মৌলিক জিনিসকে রক্ষার কাজে যেসব বিষয় ও বস্তু অন্তর্ভুক্ত সেগুলো মাসলাহা বা কল্যাণ আর যেসব জিনিস এই পাঁচটি বিষয়ের জন্য ক্ষতিকর সেগুলো মুফসিদা বা অকল্যাণ। ইসলামে কল্যাণকে শুধু কোনো একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে

---

[১]এম. উমর চাপড়া, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari`ah, ২০০৭, পৃ. ২।

www.pathagar.com

বিবেচনা না করে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়। আবার শুধু একজন ব্যক্তির কল্যাণ বিবেচনা না করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ বিবেচনা করা হয়। ইমাম রাগিব আল ইস্পাহানি ফালাহ্ বা কল্যাণকে উভয় জগতের সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাখা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইহকালে মানুষের জন্য কল্যাণ হচ্ছে তার টিকে থাকা, তার স্বাধীনতা, শক্তি ও সম্মান লাভ এবং পরকালে তার জন্য কল্যাণ হচ্ছে মৃত্যুহীন জীবন, দারিদ্র্যহীন সচ্ছলতা, অপমানহীন সম্মান এবং অজ্ঞতাহীন জ্ঞান।[১]

কল্যাণ হচ্ছে সৎকাজের পরিণাম। সৎকাজের পরিণাম কখনো দুনিয়াতে পাওয়া যায় আবার কখনো আখিরাতে পাওয়া যাবে। পরিপূর্ণ বা চূড়ান্ত পরিণাম দুনিয়াতে পাওয়া জরুরি নয়। তবে তার জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালাতে হয় দুনিয়াতেই। মহান আল্লাহ্ বলেন, مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ—'কেউ দ্রুত সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি তাকে যা ইচ্ছা এখানে সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি।'[২] তিনি আরো বলেন, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا— 'যারা মুমিন হয়ে পরকাল কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালায় তাদের প্রচেষ্টাই (আল্লাহ্র দরবারে) স্বীকৃত হয়।'[৩] এ আয়াতদ্বয় থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, কল্যাণ দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানেই পাওয়া যায়। তবে এর জন্য দুনিয়াতেই প্রচেষ্টা সাধন করতে হয়।

মানবতার কল্যাণ সাধনের বিষয়টি শুধু ইসলামী জীবনব্যবস্থারই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়, বরং সকল ধর্ম ও মতাদর্শই এই কল্যাণের বিষয়টিকে অতীব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ সকলের একই কথা 'মানবকল্যাণ' সাধন করতে হবে।

প্রত্যেক ধর্ম ও মতাদর্শই মানবসম্পদ উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে মানবকল্যাণ (human well-being)-কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। তবে কল্যাণ সাধনের পন্থা-পদ্ধতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মাত্রা, উপাদান ও স্থিতিশীলতার বিচারে তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, বস্তুবাদী ও সেক্যুলার দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু মাথাপিছু আয় ও সম্পদ বৃদ্ধিকে কল্যাণের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

---

[১]Md. Akram Khan, Concept of Welfare (Falah) In Islam, Islamic Financial System, Edited by Md. Mahfuzur Rahman, Welfare Publication, 2007, P. 378.

[২]আল কুরআন, ১৭ : ১৮।

[৩]আল কুরআন, ১৭ : ১৯।

www.pathagar.com

কিন্তু ইসলাম মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, ন্যায়বিচার ইত্যাদিকে মানবকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আবার ইসলামে কল্যাণের ফল শুধু ইহলোকেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা পরকালব্যাপী বিস্তৃত।

২. মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা জনকল্যাণকে শরী'আহ্র উৎস হিসেবে গ্রহণ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য যেমন কল্যাণ তেমনি মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা জনকল্যাণকে শরী'আহ্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্তে যেমনি কল্যাণকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয় তেমনি অকল্যাণকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়।

'মাসালিহ্ মুরসালাহ্' পরিভাষাটি 'মাসালিহ্' ও 'মুরসালাহ্' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। যেখানে 'মাসালিহ্' মাসলাহা (مَصْلَحَةٌ) শব্দের বহুবচন। মাসলাহা অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, স্বার্থ ইত্যাদি। আর মুরসালাহ্ অর্থ মুতলাক বা মুক্ত বা সাধারণ। অতএব মাসালিহ্ মুরসালাহ্ অর্থ সাধারণ কল্যাণ। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে এটি জনকল্যাণ, জনস্বার্থ, কল্যাণের চিন্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, মাসালিহ্ মুরসালাহ্ অর্থ হলো অবারিত জনস্বার্থ।

মাসলাহা শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, উপকার, কল্যাণ, স্বার্থ, মঙ্গল ইত্যাদি অর্থে। আবার কখনো কখনো উপকার সাধনের উপকরণ অর্থেও শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। সার্বিকভাবে মাসলাহা শব্দটি মানবকল্যাণ সাধনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, লেখার উপকরণ কলম। এখানে লেখার ক্ষেত্রে কলমটি মাসলাহা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য দিকে মাসলাহা বা কল্যাণ শব্দটিকে অকল্যাণের বিপরীতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন 'আল কামুসুল মুহিত' নামক অভিধানে বলা হয়েছে, কল্যাণ অকল্যাণের বিপরীত। 'মুখতারুস সিহ্হা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কল্যাণ ফাসাদের বিপরীত। আবার 'মিসবাহুল মুনির' অভিধানে বলা হয়েছে, কোনো জিনিসকে যথার্থভাবে সংশোধন করার নাম মাসলাহা। কারণ, অকল্যাণ বা ফাসাদ দূর হলে সেখানে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম গাযালি র.-এর মতে, মাসলাহা বা কল্যাণ শব্দটি উপকার সাধন করা এবং ক্ষতি বা অপকার প্রতিরোধ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রকৃতপক্ষে কল্যাণের বিষয়টি আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। স্থান-কাল-পাত্র ও শ্রেণিভেদে কল্যাণের ধারণা বিভিন্ন হয়ে থাকে। আবার কল্যাণ একটি বিমূর্ত ও ইতিবাচক বিষয়ও বটে, যা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। যেমন, একজন বলল, ভালো আছি। এখানে ভালো থাকার বিষয়টি দেখা যায় না

www.pathagar.com

কিন্তু অনুভব করা যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা সামগ্রিকভাবে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলজনক অবস্থানকে কল্যাণ নামে অভিহিত করেছেন।

পরিভাষায় মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বলতে এমন কল্যাণকে বুঝায়, যা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে শরী'আহ্ প্রণেতার পক্ষ হতে এমন কোনো অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল নেই এবং এমন কোনো মূলও নেই যার ওপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণ ও গণ্য করা হলে তাতে কোনো-না-কোনো উপকার অর্জন বা ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায়।

ইমাম শাতিবি র. বলেন, 'মাসালিহ্ মুরসালাহ্ হলো এমন সব বিষয়, যেগুলো শরী'আহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু সেগুলো গ্রহণ করা বা পরিত্যাগ করার পক্ষে-বিপক্ষে কোনো দলিল নেই। অথচ সেগুলো বিবেচনায় এনে কোনো বিধান প্রণয়ন করলে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় অথবা অকল্যাণ দূর হয়।'[১]

ইমাম গাযালি র. বলেন, 'বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তই হলো মাসালিহ্ মুরসালাহ্‌র ভিত্তি, কিন্তু তা প্রমাণের জন্য সর্বসম্মত মূলনীতি বিদ্যমান নেই।'[২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, 'মুজতাহিদগণ কাজের মধ্যে যে অগ্রাধিকারযোগ্য কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করেন এবং শরী'আহ্‌তে উক্ত কল্যাণের বিরোধী কোনো নির্দেশনা নেই, তাকে মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বলা হয়।'[৩]

ইবনে আশুর র. বলেন, 'মাসলাহা হলো কাজের সে গুণ, যার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের চিরস্থায়ী বা অগ্রাধিকারমূলক ন্যায়পরতা ও কল্যাণ সাধিত হয়।'[৪]

মালিকি মাযহাবের ফকিহ্গণের মতে, সার্বিক জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সাধারণ অর্থবোধক নস না থাকা অবস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্তকে এমন কোনো মৌলিক নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়ার নাম মাসালিহ্ মুরসালাহ্, যার ফলে তা জনস্বার্থ ও শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য উভয়টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

সংক্ষেপে বলা যায়, জনস্বার্থে কল্যাণকে বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই মাসালিহ্ মুরসালাহ্। অন্যভাবে বলা যায়, মাসালিহ্ মুরসালাহ্ হলো

---

[১]ইমাম শাতিবি র., আল-মুওয়াফাকাত ফি উসূলিশ শরী'আহ্, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬, খ. ১, পৃ. ২৪২।

[২]বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ২৫।

[৩]ইমাম শাতিবি র., মাজমুআতুর রাসাইল ওয়াল মাসাইল, কায়রো, খ. ৩, পৃ. ২২।

[৪]Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, Ibid, p. 96.

www.pathagar.com

এমনসব কল্যাণ যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ্ কিংবা ইজমা যেমন সাক্ষ্য দেয় না, তেমনি নাকচ করার ব্যাপারেও কোনো সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু জনগণের অসুবিধা দূর করা ও শরী'আহ্র উদ্দেশ্য হিফাযত করার জন্য উক্ত কল্যাণ গ্রহণ করতে হয়। ইসতিহ্সানের ক্ষেত্রেও জনকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় কিন্তু মাসালিহ্ মুরসালাহ্র পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

৩. মাসালিহ্ মুরসালাহ্র প্রামাণিকতা

মাসালিহ্ মুরসালাহ্র সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ উল্লেখ করা যায় :

ক. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ—'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা চান না।'[১]

খ. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ—'তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২]

গ. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ—'আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না।'[৩]

ঘ. 'ইসলামে কারো ওপর কোনো ক্ষতি আরোপিত হবে না এবং তা সহ্য করা হবে না।'[৪]

ঙ. 'দুটো বিকল্পের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ স. সহজটিকে গ্রহণ করেন যতক্ষণ না এটি পাপের কারণ হয়।'[৫]

চ. 'তোমরা কাজকর্ম সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে না, মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না।'[৬]

৪. মাসালিহ্ মুরসালাহ্র গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইমাম মালিক র. মাসালিহ্ মুরসালাহ্র ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি অবস্থার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্যাণকে গ্রহণের ব্যাপারে কোনো শর্তাবলি মেনে চলার প্রয়োজনও অনুভব

---

[১]আল কুরআন, ২ : ১৮৫।

[২]আল কুরআন, ৫ : ৩।

[৩]আল কুরআন, ৫ : ৬।

[৪]ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আহকাম, বাবু মান বানা ফি হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বি জারিহি।

[৫]সহিহ আল বুখারি, বাবু ইকামাতিল হুদুদি ওয়াল ইনতিকামু লি হুরুমাতিল্লাহ।

[৬]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা কানান্নাবিউ স. ইয়াতাখাওয়ালাহুম বিল মাউয়িযাতি ওয়াল ইলমি কাইলা ইয়ানফিরু ও মুসলিম।

www.pathagar.com

করেননি। তিনি বলেছেন, 'শরী'আহ্ প্রণেতা সমগ্র হুকুমের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে মাসলাহার বিবেচনা করেছেন। মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও অকল্যাণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে মাসলাহার বিবেচনা ব্যতিরেকে শরী'আহ্র কোনো হুকুম প্রবর্তিত হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়, মাসলাহার বিবেচনা একটি সঠিক নীতি।'[১] কিয়াস ও ইসতিহসান আবশ্যিকভাবে নুসুসের (text) ইল্লতের ওপর নির্ভরশীল।

নুসুসের ইল্লতের ওপর ভিত্তি করে কিয়াস ও ইসতিহসান দ্বারা আইনের সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু এ প্রকারে আইন তৈরীর ক্ষেত্র খুবই সীমিত হওয়ার কারণে মাসলাহার ভিত্তিতে বা জনস্বার্থে আইন তৈরি করতে হয়। তাই মাসালিহ্ মুরসালাহ্কে জরুরি অবস্থার আশ্রয়স্থল বলা হয়। এ কারণে ইমামগণ এর নাম দিয়েছেন 'মুনাসিব' তথা সময়োপযোগী বা যুগোপযোগী হাতিয়ার।[২]

ড. হাশিম কামালির মতে, পরিবর্তনশীল বিশ্বের নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য ইসলামী আইনবিদগণের জন্য মাসলাহা হচ্ছে একটি প্রধান হাতিয়ার। অবশ্য কোনো কোনো ফিকাহবিদ এটিকে গ্রহণ করতে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এ মতভূক্ত ওলামার সংখ্যা কম এবং তাদের যুক্তিও তেমন জোরালো নয়।[৩]

আল্লামা ইমাম শাতিবি র. তাঁর 'মুওআফাকাত' ও 'আল ইতিসাম' গ্রন্থে মাসলাহার ব্যাপারে গবেষণামূলক বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ইবাদত-বন্দেগির ব্যাপারে শরী'আহ্র মূলনীতি হলো উদ্দেশ্য-তাৎপর্য ও মুসলিহাতের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যেমনভাবে করতে বলা হয়েছে তেমনভাবেই ইবাদত-বন্দেগি করতে হবে। আর অভ্যাস ও আচার-ব্যবহারের ব্যাপারটি তার বিপরীত।'[৪]

একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের জন্য দীন, জীবন, বুদ্ধি-বিবেক, বংশধারা ও সম্পদের হিফাযত করা জরুরি। এ পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটির অনুপস্থিতিতে সমাজব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অতএব এগুলোর সংরক্ষণ ও ক্ষতি দূর করার জন্য মাসালিহ্ মুরসালাহ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

---

[১]ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

[২]ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, (আল-মাকাসিদুল আম্মা লিশ-শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ) ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ২০০৬, পৃ. ৭১।

[৩]শাহ আব্দুল হান্নান, উসূলুল ফিকহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[৪]ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৬৪।

www.pathagar.com

৫. মাসলাহা বা কল্যাণের প্রকারভেদ

সাধারণত মাসলাহা বা কল্যাণ তিন প্রকার :

৫.১. মাসালিহ্ মু'তাবারাহ্ বা বিবেচ্য কল্যাণ : যে কল্যাণ সাধন করা ও যে ক্ষতি বা অকল্যাণ দূর করার জন্য বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে তাকে মাসালিহ্ মু'তাবারাহ্ বা বিবেচ্য কল্যাণ বলা হয়। যেমন, কিসাসের বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য কল্যাণ হলো মানুষের জীবন রক্ষা করা।

৫.২. মাসালিহ্ মুলগাহ্ বা পরিত্যাজ্য কল্যাণ : যে কল্যাণকে শরী'আহ্তে গ্রহণ না করে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে তাকে মাসালিহ্ মুলগাহ্ বা পরিত্যাজ্য কল্যাণ বলা হয়। যেমন, সুদের মধ্যে এর দাতা ও গ্রহীতার জন্য কিছু কল্যাণ থাকলেও ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের ওপর এর সুদূরপ্রসারী কুফলের কারণে ইসলামী শরী'আহ্তে একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫.৩. মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা জনস্বার্থ : যে কল্যাণকে শরী'আহ্ প্রণেতা কল্যাণ হিসেবে বিবেচনা করেননি আবার অকল্যাণ হিসেবে বাতিলও করেননি এমন কল্যাণকে মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বলা হয়। অর্থাৎ যে কল্যাণ গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে শরী'আহ্ প্রণেতা নীরবতা অবলম্বন করেছেন তাকে মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বলা হয়।

৬. মাসলাহা বা কল্যাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যই ইসলামী শরী'আহ্ প্রণয়ন করা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে কল্যাণ নিশ্চিত করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য। ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাযি র. কল্যাণ-অকল্যাণ গ্রহণ করা বা না করার বিবেচনায় মানুষের কর্মকাণ্ডকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. যে কর্মে শুধু কল্যাণ রয়েছে, কোনো অকল্যাণ নেই তা শরী'আহ্সম্মত হওয়া নিশ্চিত।

খ. যে কর্মে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয় রয়েছে। তবে তাতে কল্যাণের মাত্রা বেশি। এ ধরনের কর্ম শরী'আহ্সম্মত। কেননা, সামান্য অকল্যাণের জন্য বৃহৎ কল্যাণ পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

গ. যে কর্মে কল্যাণ-অকল্যাণ সমান, তা নিরর্থক কাজ। এটি শরী'আহ্সম্মত নয়।

ঘ. যে কর্মে কল্যাণ-অকল্যাণ কোনোটিই নেই, তাও নিরর্থক কাজ। এটি শরী'আহ্সম্মত নয়।

ঙ. যে কর্মে শুধু অকল্যাণ নিহিত তা শরী'আহ্সম্মত নয়।

চ. যে কর্মে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয় রয়েছে, তবে অকল্যাণের মাত্রা বেশি। এটি শরী'আহ্সম্মত নয়।

www.pathagar.com

৭. মাসালিহ্ মুরসালাহ্র উদাহরণ

৭.১. সাহাবিদের যুগ

সাহাবিগণ কর্তৃক মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা অবারিত জনস্বার্থকে শরী'আহ্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত অনেক। আবার কল্যাণের ভিত্তিতে গৃহীত সম্মানিত খলিফাগণের কোনো কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্য সাহাবিদের বিরোধিতা না থাকায় তা ইজমায়ে সুকুতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম রা. কর্তৃক গৃহীত কিছু মাসালিহ্ মুরসালাহ্র দৃষ্টান্ত হলো :

৭.১.১. কুরআন সংকলন : আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে বিপুল সংখ্যক সাহাবি বিভিন্ন যুদ্ধে শাহাদত বরণ করলে উমর রা.-এর পরামর্শক্রমে যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-কে কুরআন সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ সিদ্ধান্ত সার্বিক কল্যাণের জন্য গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্র কোনো দলিল ছিল না। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসটি হলো : যায়েদ ইবনে সাবিত রা. বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রা. আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোনো সংশয় নেই। অধিকন্তু তুমি রাসূল স.-এর অহির লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআনের অংশগুলোকে তালাশ করে একত্র করো। আল্লাহ্র শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত, তাহলেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন মনে হতো না। আমি বললান, যে কাজ রাসূল স. করেননি, আপনারা সে কাজ কীভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এটা একটা কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি তিনি বার বার আমার কাছে বলতে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমার বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিলেন সে কাজের জন্য যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর ও উমর রা.-এর বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিয়েছিলেন। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধান কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করলাম।[১]

এ ছাড়া উসমান রা. কর্তৃক আল কুরআনের মূল সংকলন ছাড়া পাঠের ভিন্নতা সম্পন্ন অন্যান্য সংকলন পুড়িয়ে ফেলা মাসালিহ্ মুরসালাহ্র আরো একটি দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য যে, আবু হুযায়ফা রা. আরমেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের সময় দেখলেন, সাহাবিগণ আল কুরআন বিভিন্নভাবে পড়ছেন। তখন তিনি উসমান রা.-কে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন! এ উম্মত আল কুরআনের মাঝে ইহুদি-নাসারাদের মতো মতভেদ করার পূর্বে আপনি তাদের নাগাল ধরুন।' তখন উসমান রা. হাফসা রা.-এর নিকট সংরক্ষিত আবু বকর সিদ্দিক রা. ও

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবু ফাযায়িলুল কুরআন, বাবু জাম'য়িল কুরআন।

www.pathagar.com

উমর ফারুক রা. কর্তৃক সংকলিত কপি সংগ্রহ করেন এবং এর অনুলিপি প্রস্তুত করে মুসলিমজাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। আর আল কুরআনের উক্ত অনুলিপি ব্যতীত জনসাধারণের নিকট সংরক্ষিত অন্যান্য অনুলিপি তিনি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন– যাতে কুরআন মজিদের কিরাআত ও উচ্চারণে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়ার আশঙ্কা না থাকে। তাঁর এ মহৎ কাজ সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতেই করা হয়েছিল। তাঁর সময়ের সকল সাহাবি এ বিষয়ে সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন।[১]

৭.১.২. কারিগরকে জরিমানা : কারিগরের কাছে সম্পদ আমানতস্বরূপ বিদ্যমান থাকে। আর আমানতের মাল ধ্বংস হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না; কিন্তু কারিগরকে এ সুযোগ দেয়া হলে সম্পদ রক্ষার প্রতি তার গুরুত্ব কমে যাবে। এ কারণে আলী রা. কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের জিম্মায় থাকা দ্রব্য হারিয়ে গেলে তাদেরকেই তার জন্য দায়ী করে বিধান চালু করেন।

৭.১.৩. মদপানের শাস্তি : রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সময় স্বাধীন লোকের মদপানের শাস্তি ছিল চল্লিশ বেত্রাঘাত। আবু বকর রা.-এর আমলেও একই বিধান জারি ছিল। কিন্তু উমর রা.-এর শাসনামলে মদপানকারীরা যখন এ শাস্তিকে তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছিল না, তখন তিনি সাহাবিগণের সঙ্গে পরামর্শ করে মদপানের শাস্তি চল্লিশটি বেত্রাঘাত থেকে আশিটিতে উন্নীত করেন। উসমান রা. 'কখনো চল্লিশটি আবার কখনো আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। এ শাস্তি অপরাধের মাত্রা অনুসারে নির্ধারিত হতো। যারা মাদকগ্রহণকে অভ্যাসে পরিণত করেছিল তাদেরকে আশি ঘা আর যারা মাদকাসক্ত নয় কিন্তু নৈতিক স্খলনজনিত কারণে শরাব পান করত তাদেরকে চল্লিশ ঘা লাগাতেন। প্রথম চল্লিশটি হদ হিসেবে এবং শেষ চল্লিশটি তাযির হিসেবে গণ্য হতো।'[২]

৭.১.৪. হত্যাকারী দলকে হত্যার ফতোয়া : একদল লোক যদি মাত্র একজনকে হত্যা করে তাহলে উমর রা. এ হত্যাকারী দলের সকলকেই কিসাস হিসেবে হত্যা করার বিধান জারি করেন। সানয়ায়ে ইয়েমেনে হত্যাকৃত ব্যক্তির হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের বিষয়ে তিনি বলেন, 'যদি সকল সানয়াবাসী তার হত্যায় যোগ দিত, তাহলে আমি তাদের সকলকে হত্যা করতাম।'[৩]

---

[১]তাফসিরে ইবনে কাছির, অনুবাদ- অধ্যাপক আখতার ফারূক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ১, পৃ. ৪৮।

[২]মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল হুদুদ, বাবু আল-হাদ্দু ফিশ-শুরাবি; ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী, ফিক্‌হে ওসমান ইবনু আফ্‌ফান রা., অধুনিক প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৪০।

[৩]উসূলুল ফিকহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

www.pathagar.com

৭.২. তাবেয়িদের যুগ

তাবেয়িগণের সময় নিত্য-নতুন অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। তাঁরা মাসালিহ্ মুরসালাহ্র ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের ক'টি হলো :

৭.২.১. সরাইখানা নির্মাণ : উমর বিন আবদুল আজিজ র. মুসাফিরদের সুবিধার্থে রাস্তায় সরাইখানা নির্মাণ করেন।

৭.২.২. মিনায় প্রাসাদ নির্মাণ নিষিদ্ধকরণ : হাজ্বিদের সুবিধার্থে তাবেয়িদের আমলে মিনায় প্রাসাদ নির্মাণ স্থগিত করা হয়েছিল।

৭.২.৩. হাদিস সংকলন : তাবেয়িদের সময় দীনকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হাদিস সংকলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৭.২.৪. খেলার মাঠে শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ : খেলার মাঠে প্রাপ্তবয়স্ক লোক না থাকলে শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে মর্মে ইবনে আবি লায়লা র. মত প্রদান করেন।[১]

৭.২.৫. জেলখানা স্থাপন : তাবেয়িদের যুগে জেলখানা স্থাপন এবং খারাজ বা খাজনা আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অথচ এসব বিষয়ের কোনো নজির তাদের সামনে ছিল না।

৭.৩. হানাফি মাযহাব

গনিমতের মাল পুড়িয়ে ফেলা : মুসলিমগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গনিমতের মাল বহন করে নিয়ে আসতে না পারলে তা পুড়িয়ে ফেলা বৈধ বলে হানাফিগণ অভিমত ব্যক্ত করেন, যাতে তা থেকে শত্রুরা কোনো উপকার লাভ করতে না পারে।[২]

৭.৪. মালিকি মাযহাব

কর আরোপ ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষ্যগ্রহণ : বায়তুল মালে ঘাটতি দেখা দিলে জনকল্যাণার্থে ধনীদের ওপর বিশেষ কর আরোপ করা বৈধ। এ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে সংঘটিত ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা বৈধ। যদিও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে শর্ত হলো প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।[৩]

৭.৫. শাফিঈ মাযহাব

শত্রুবাহিনীর ব্যবহৃত বাহন ধ্বংস ও বৃক্ষকর্তন : শত্রুপক্ষ যেসব জীবজন্তু ও বাহন নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে, প্রয়োজনে সেসব হত্যা বা ধ্বংস করা বৈধ। এ ছাড়া শত্রুপক্ষের মালিকানাধীন গাছপালা ধ্বংস করাও বৈধ হতে পারে যদি এর মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয়ের সম্ভাবনা থাকে।[৪]

---

[১] উসূলুল ফিকহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[২] ড. আব্দুল করিম যায়দান, আল-ওয়াজিয ফি উসূলিল ফিকহ, পৃ. ২৪৩।

[৩] আবু যাহরা, মালিক ইবনে আনাস, পৃ. ৪০২।

[৪] ড. আব্দুল করিম যায়দান, আল-ওয়াজিয ফি উসূলিল ফিকহ, পৃ. ২৪৩।

www.pathagar.com

৭.৬. হাম্বলি মাযহাব

শাসক কর্তৃক বাধ্যবাধকতা আরোপ : রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক পণ্য গুদামজাতকারীদেরকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারেন। একইভাবে তারা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ন্যায্য মূল্যে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করতে পারেন।[১]

৮. জনকল্যাণকে শরী'আহ্‌র উৎস হিসেবে গ্রহণ করার শর্ত

বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা, মারাত্মক ক্ষতি দূর করা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই মাসালিহ্ মুরসালাহ্‌র উদ্দেশ্য। কোনোভাবেই এর অর্থ আইন প্রণয়নের অবাধ অনুমতি নয়। ইমাম শাতিবি র. ও অন্যান্য উসূলবিদ জনকল্যাণকে শরী'আহ্‌র স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

৮.১. **সামঞ্জস্যতা**: মাসলাহা বা কল্যাণটি অবশ্যই শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য ও মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।[২]

৮.২. **যুক্তিগ্রাহ্যতা**: বিবেচ্য কল্যাণটি বুদ্ধি-বিবেকসম্মত হবে। কোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির সামনে পেশ করা হলে তা সাধারণ বুদ্ধি-বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।[৩]

৮.৩. **জরুরি বিষয় সংরক্ষণ**: মাসলাহা বা কল্যাণটি শরী'আহ্‌র জরুরি বিষয় সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে এবং এর দ্বারা জরুরি কোনো সঙ্কটের সমাধান হবে।[৪]

৮.৪. **সার্বজনীন কল্যাণ**: কল্যাণটি সার্বজনীন হতে হবে। অর্থাৎ, সামগ্রিক বিবেচনায় তা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হতে হবে। বিশেষ কোনো ব্যক্তি কিংবা স্বল্পসংখ্যক মানুষের জন্য তা সীমাবদ্ধ হবে না।[৫]

৮.৫. **কল্যাণটি নসের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া**: মাসলাহা বা কল্যাণটি অবশ্যই স্পষ্ট নস (text) বা কুরআন-সুন্নাহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।[৬]

---

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

[২]ইমাম শাতিবি র., আল-ইতিসাম, খ. ২, পৃ. ২০৭-২১২।

[৩]প্রাগুক্ত।

[৪]প্রাগুক্ত।

[৫]ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলি, আল ওয়াজিয ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী, খ. ২, পৃ. ৭৮।

[৬]শাহ্ আবদুল হান্নান, উসূলুল ফিকহ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১১, পৃ. ৪৫

www.pathagar.com

৮.৬. **বাস্তবসম্মত কল্যাণ:** জনকল্যাণচিন্তা বাস্তবসম্মত হবে, শুধু তাত্ত্বিক বা কাল্পনিক হবে না। অর্থাৎ মাসলাহা প্রয়োগ করা হলে বাস্তবেই মানুষের কোনো কল্যাণ সাধিত হবে কিংবা কোনো দুঃখ-কষ্ট লাঘব হবে।[১]

৮.৭. **মুজতাহিদ কর্তৃক প্রয়োগ:** মাসলাহা প্রয়োগকারীর মধ্যে মুজতাহিদের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে।[২]

৮.৮. **মু'আমালাহ্সংক্রান্ত কল্যাণ:** জনকল্যাণচিন্তার বিষয়টি ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা। এটি শুধু মু'আমালাহ্র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।[৩]

৯. বিভিন্ন মাযহাব ও আলিমের দৃষ্টিতে মাসলাহা বা জনকল্যাণ

হানাফি মাযহাবে মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা জনকল্যাণকে শরী'আহ্র স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। তবে মাসলাহার ভিত্তিতে ইসতিহসানকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি দেখিয়েছেন যে, হানাফি মাযহাবে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এমন অনেক দিক বিবেচনা করা হয়েছে যেখানে মাসালিহ্ মুরসালাহ্র প্রতিচ্ছবি হুবহু বিদ্যমান।[৪] হানাফি মাযহাবে গৃহীত ইসতিহসানের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটি হলো মাসলাহার ভিত্তিতে ইসতিহসান। এ ছাড়া ইসতিহসান ও মাসালিহ্ মুরসালাহ্র মধ্যে ব্যবহারিক দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়; বরং উভয়ের লক্ষ্য এক। যেমন, ইমাম মালিক র.-এর দৃষ্টিতে ইসতিহসান মাসালিহ্ মুরসালাহ্র একটি অংশ।

ইমাম মালিক র. মাসালিহ্ মুরসালাহ্কে শরী'আহ্র স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে নস না পাওয়া পেলে তিনি মাসলাহার মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করতেন।[৫] তিনি সাহাবিদের অনুকরণে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে মাসলাহা গ্রহণ করেছেন। মালিকি ফিকহে মাসালিহ্ মুরসালাহ্ একটি স্বতন্ত্র অবস্থান পেয়েছে। এ কারণেই মালিকি ফিকাহকে 'ফিকহুল মাসালিহ্' বলা হয়।

ইমাম শাফিঈ র. ইসতিহসান ও মাসালিহ্ মুরসালাহ্কে শরী'আহ্র স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়

---

[১] ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলি, আল-ওয়াজীয ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ২৫৬।

[২] ইয়াকুব আবদুল ওয়াহহাব আল-বাহিসিন, রাফউল হারজ ফিশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ, মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০১, পৃ. ২৬৬।

[৩] মুহাম্মদ সাঈদ রমাযান আল-বুতী, দাওয়াবিতুল মাসলাহা ফিশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ, দামিশক, দারুল ফিকর, ২০০৫, পৃ. ২১৫।

[৪] ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলি, উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, খ. ২, পৃ. ৫৫-৬১।

[৫] আবু যাহরাহ, মালিক ইবনে আনাস হায়াতুহু ওয়া আসরুহু ওয়া ফিকহুহু, দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো, ১৯৯৭, পৃ. ৩১৮।

www.pathagar.com

যে, কিয়াসের মাধ্যমে মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তিনি মাসলাহাকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে কিয়াস হলো, 'অগ্রগণ্য বিধান তথা কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে দলিল অন্বেষণ করা।'[১]

শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ইমাম গাযালি র. 'ইসতিসলাহ্' পরিভাষার অধীনে মাসালিহ্ মুরসালাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, মাসালিহ্ মুরসালাহ্ শরী'আহ্‌র স্বতন্ত্র কোনো দলিল নয়; বরং এটি কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইজমার মাধ্যমে স্বীকৃত শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি।[২]

মাসালিহ্ মুরসালাহ্‌কে শরী'আহ্‌র উৎস হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মালিকি মাযহাবের পরই হাম্বলি মাযহাবের স্থান। ইমাম মালিক র. ও তাঁর মাযহাবের বিভিন্ন আলিমের ফাতওয়াদানের রীতিতে এর প্রমাণ মেলে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. ও ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ র.-এর বিভিন্ন উক্তি থেকে জানা যায়, তাঁরা মাসালিহ্ মুরসালাহ্‌কে শরী'আহ্‌র স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং এটিকে কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩]

শিয়া ও যাহিরি মাযহাবেও যুক্তিগ্রাহ্য হলে মাসলাহাকে গ্রহণ করার রীতি লক্ষ করা যায়। শেখ তাকি হাকিম বলেন, 'নিশ্চিতভাবে যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া ব্যতীত শিয়াগণ মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বা জনকল্যাণকে বিবেচনা করেন না। কেননা, যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া ব্যতীত তা প্রমাণ নয়।'[৪]

হাম্বলি মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম নাজমুদ্দিন তুফি মাসালিহ্ মুরসালাহ্‌কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি 'রিসালাতুন ফি রি'আয়াতিল মাসলাহা' গ্রন্থে এ ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শরী'আহ্‌র ১৯টি উৎস রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো নস ও ইজমা, যদি তা মাসলাহার অনুকূলে হয়। আর মাসলাহার বিরোধী হলে সেক্ষেত্রে মাসলাহাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, মাসলাহা ইজমার চেয়ে শক্তিশালী। তবে মাসলাহা শুধু লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।[৫]

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, শরী'আহ্‌র উৎস হিসেবে মাসলাহাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মতভেদ থাকলেও কোনো মাযহাবেই মাসলাহাকে গুরুত্বহীন

---

[১]ইমাম আশ-শাফিঈ র., আর-রিসালাহ্, পৃ. ৪০।

[২]ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলি, উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, খ. ২, পৃ. ৫৫-৬১।

[৩]মুহাম্মদ রুহুল আমিন, ইসলামী আইনের উৎস, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩, পৃ. ১৫৪।

[৪]তাকি হাকিম, আল-উসূলুল আম্মাহ লিল-ফিকহিল মুকারিন, পৃ. ৪০৪।

[৫]নাজমুদ্দিন তুফি, রিসালাতুন ফি রি'আয়াতিল মাসলাহা, পৃ. ২৩-২৭।

www.pathagar.com

করে দেখা হয়নি। প্রত্যেক মাযহাবেই নতুন সমস্যা সমাধান বিশেষ করে মু'আমালাহ্‌র ক্ষেত্রে মাসলাহাকে অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। নসের ওপরে মাসলাহাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু ইজতিহাদি মাসয়ালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাসলাহাকে গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি কারো যুক্তি-বুদ্ধিতেই অস্বীকার করার মতো নয়।

১০. মাসলাহা বা কল্যাণ গ্রহণ না করার যুক্তিখণ্ডন

ইসলামী শরী'আহ্‌র বিধান রচনার ক্ষেত্রে মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা গ্রহণ করা এবং যা ক্ষতিকর তা পরিহার করাকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামী পণ্ডিতগণের মধ্যে বিভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। যাহিরি ও শিয়া মতের অনুসারীগণ 'মাসলাহা' বা জনকল্যাণকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তাদের মতের পক্ষে যুক্তি হলো, মাসলাহাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করলে নিজের ইচ্ছামত শরী'আহ্‌র বিধান রচনার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্‌র বিধানের ওপর মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির প্রাধান্য বিস্তৃত হবে। তারা আরো বলেন যে, মাসলাহার ধারণাই ভিত্তিহীন, কারণ এর পক্ষে কোনো দলিল নেই।

উক্ত মতের অনুসারীদের জবাবে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মাসলাহাকে শরী'আহ্‌র বিধান রচনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি দলিলহীন নয়। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্‌র দলিল ও সাহাবিদের আমল রয়েছে। এ ছাড়া মাসলাহা গ্রহণ করলে আল্লাহ্‌র বিধান বিকৃত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অমূলক। কেননা, এ ব্যাপারে স্বীকৃত নীতি হলো, জনকল্যাণ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যতক্ষণ তা শরী'আহ্‌র অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক না হবে। সাংঘর্ষিক হলে মাসলাহা পরিত্যাজ্য হবে। এটাই ইমাম মালিক র. ও আহমাদ র.-এর মত। ইমাম শাতিবি র. তাই বলেছেন, 'মাসলাহা যদি শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং তা কোনো একটা মূলনীতির কিংবা কোনো দলিলেরও বিপরীত না হয়, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।'[১]

ইমাম আবু হানিফা র. ও শাফে'ঈ র. মাসলাহা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন, তার সারমর্ম হলো, সেই মাসলাহা অগ্রহণযোগ্য, যা শরী'আহ্‌ প্রণেতা কর্তৃক সমর্থিত নয়, যা মানুষের খামখেয়ালি ও যথেচ্ছভাব-নিতান্তই ইচ্ছেমত

---

[১]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম র., ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯। আরো দেখুন, ইমাম শাতিবি র., আল-মুওয়াফাকাত।

www.pathagar.com

শরী'আহ্‌র বিধান রচনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু যে মাসলাহা শরী'আহ্‌র সীমার মধ্যে রক্ষিত এবং যা শরী'আহ্‌র বিধিবিধান মোতাবেক, তার বিপরীত কিছু মাত্র নয়, প্রকৃতপক্ষে তেমন মাসলাহা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু হানিফা র.-এর মাযহাবের বহু মাসয়ালা মাসলাহার ওপরই প্রতিষ্ঠিত।[১]

১১. শরী'আহ্‌র বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানবকল্যাণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব

এ গ্রন্থের বহু স্থানেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী শরী'আহ্‌র লক্ষ্যই হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা। এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখা যায় যে, কল্যাণ একটি পরিবর্তনশীল বিষয়। যেখানে কল্যাণের পরিবর্তন ঘটেছে সেখানে অনিবার্যভাবে ইসলামী আইনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ইবাদত সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের ঐকমত্যমূলক সিদ্ধান্ত হলো, সেগুলো কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না। এক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই নস-এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। কিন্তু মু'আমালাহ্‌র হুকুম-আহকাম মানুষের কল্যাণ ও প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। কল্যাণের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে হুকুমেরও পরিবর্তন হতে পারে।

ইসলামী শরী'আহ্‌র প্রতিটি নির্দেশ থেকে বুঝতে হবে, এর মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। আবার প্রত্যেকটি নিষেধাজ্ঞা থেকে বুঝতে হবে, এর মধ্যে ক্ষতি বা অকল্যাণ রয়েছে। কারণ, ইসলামী শরী'আহ্‌র মূল ভিত্তিই হলো মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করা। বস্তুত শরী'আহ্‌র পুরোটাই আদল বা ন্যায়, রহমত বা দয়া, মাসলাহা বা কল্যাণ, হিকমত বা প্রজ্ঞা। ফলে যেসব বিষয় ন্যায়ের পরিবর্তে জুলুম, দয়ার পরিবর্তে কঠোরতা, কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ, প্রজ্ঞার পরিবর্তে নির্বুদ্ধিতা বা বোকামি বলে বিবেচিত হয় তা কখনো শরী'আহ্‌র আইন হতে পারে না। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যুক্তি দিয়ে তাকে যতোই সঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হোক। বস্তুত মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত আদল বা ন্যায়বিচার, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দয়া-মায়া এবং জগতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ছায়া বিস্তৃত করার নামই হলো শরী'আহ্।[২]

শরী'আহ্‌র বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. ও সাহাবিগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামষ্টিক

---

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০।
[২]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫।

www.pathagar.com

কল্যাণ বিবেচনা করে শাস্তি মাফ করে দিয়েছেন, স্থগিত করেছেন এবং বৈধ কাজের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেছেন। এ ছাড়া যেখানেই প্রয়োজন ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে কল্যাণের পরিবর্তন এসেছে সেখানেই মুজতাহিদগণ শরী'আহ্র হুকুম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

শরী'আহ্র বিধান প্রয়োগ বিশেষ করে অপরাধ দমনে ক্ষেত্রে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনার ওপর গুরুত্বারোপের ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন'-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অপরাধ অবশ্যই ঘৃণ্য কাজ এবং তা দমন করতে হবে। অপরাধ দমনের উদ্দেশ্য হলো, সমাজে সততা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং কল্যাণকর সমাজ গড়ে তোলা। কিন্তু কোনো অপরাধ দমন করলে যদি সমাজে তার চেয়ে আরো ভয়ানক অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে সে অপরাধ দমন না করাই ভালো।

হিজরতের পূর্বে মক্কায় নানা ধরনের অন্যায়-অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলেও রাসূলুল্লাহ্ স. নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। সে সময় পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে ছিল না এবং অন্যায় দমন করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। এমনকি মক্কা বিজয়ের পর যখন তাঁর হাতে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল তখনও তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং তাতে মানুষের কতটুকু কল্যাণ রয়েছে তা বিবেচনা করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ স. কাবা ঘরকে ইব্রাহিম আ.-এর মূল কাঠামোয় ফিরিয়ে আনার সংকল্প করলেন। কিন্তু তিনি ইসলামী রষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ সংকল্প থেকে বিরত থাকলেন এই কারণে যে, সদ্য ইসলামে দীক্ষিত মক্কার মুসলমানদের মনে দীর্ঘ দিনের কাবার অবকাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন বিরূপতা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে কাবাঘরকে ইব্রাহিমি অবকাঠামোয় ফিরিয়ে আনার চেয়ে সামাজিক বিচ্যুতিকে বড় করে দেখলেন।[১]

ইবনুল কাইয়্যিম র. অপরাধ দমনকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। প্রথমত অন্যায় অপরাধ দমন করে সেখানে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত অন্যায় অপরাধ সম্পূর্ণ নির্মূল না হলে তার মাত্রা হ্রাস করা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনা। তৃতীয়ত একটি অপরাধ নির্মূল করতে গিয়ে আরেকটি অপরাধের জন্ম দেয়া। চতুর্থত একটি অপরাধ দমন করার কারণে তার চেয়ে আরো বড় ধরনের মারাত্মক আপরাধের জন্ম দেয়া।

---

[১]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬; ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানবিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের গুরুত্ব, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ২০০৫, পৃ. ৩৮।

www.pathagar.com

উক্ত চারটি অপরাধের মধ্যে প্রথম দুটির কার্যক্রম চালানো শরী'আহ্‌র দাবি। তৃতীয়টি পরিচালনার ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে তৎপরতা চালানো যেতে পারে। কিন্তু চতুর্থ পর্যায়ের দমনকার্যক্রম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। যেমন, কেউ যদি কোথাও কিছু লোককে অবৈধ খেলাধুলা কিংবা অশ্লীল গান-বাজনা ও নৃত্যরত দেখে তাহলে তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রেখে ভালো কাজে লিপ্ত করাতে পারলে তা খুবই প্রশংসাযোগ্য কিন্তু তাদেরকে উক্ত কাজ থেকে বিরত রাখার ফলে যদি আগের চেয়ে আরো মারাত্মক অপরাধে তাদের লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদেরকে বিরত না রাখাই ভালো। কারণ, একটি লঘু অপরাধ দমন করলে যদি একটি মারাত্মক অপরাধ সৃষ্টি হয় তা হলে তা না করাই ভালো। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া র.-এর বাণীটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, বাগদাদে তাতারি আক্রমণের সময় আমরা ক'জন একটি গ্রামে গেলাম। সেখানকার কিছু লোককে কাবাব ও মদপানে লিপ্ত দেখে আমাদের এক সাথি তাদেরকে এ কাজে নিষেধ করতে চাইল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, আরে দোস্ত! পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করো। মদ ও কাবাব অপরাধপ্রবণ এই লোকগুলোকে ব্যাপক হত্যাযোগ্য, লুটতরাজ এবং নারী-শিশুদের ওপরে অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বিরত রেখেছে। কাজেই এদেরকে এ অবস্থায় থাকতে দেয়াই ভালো।[১]

১২. মানবকল্যাণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তন

অবস্থা পরিবর্তনের সাথে হুকুম বা বিধান পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনশীলতার মূলে রয়েছে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ। কল্যাণ একটি আপেক্ষিক বিষয়। স্থান-কাল ও সময়ের পরিবর্তনে কল্যাণও পরিবর্তিত হয়। নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিংবা বিদ্যমান আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষের সার্বিক কল্যাণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

ইসলামী শরী'আহ্ দেশ-স্থান-কাল ও মানুষের বাস্তব কল্যাণের সাথে সঙ্গতি রেখেই চলে যতক্ষণ না তা শরী'আহ্‌র মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাই ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' গ্রন্থে লিখেছেন, স্থান-কাল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও ঘটনার আবর্তন-বিবর্তন অনুযায়ী ফতোয়া পরিবর্তনের মূলে একটা বিরাট ও বিপুল কল্যাণকর তাৎপর্য রয়েছে।[২]

মানবকল্যাণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে হুকুম পরিবর্তনের ক'টি অনন্য নজির নিচে তুলে ধরা হলো :

---

[১]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬, খ. ৩, পৃ. ৬-৭।
[২]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম র. ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

www.pathagar.com

১২.১. মঙ্গাপীড়িত অবস্থায় চুরির শাস্তি মওকুফ

মঙ্গাপীড়িত অবস্থায় চুরির শাস্তি মওকুফ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম র. তাঁর 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' গ্রন্থে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, উমর রা. মঙ্গা ও তীব্র খাদ্যাভাবের সময় চুরির শাস্তি মওকুফ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, খাদ্যাভাব ও মঙ্গাপীড়িত অবস্থায় খেজুর চুরি ও অন্যান্য চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না।

উমর রা. হাতিব-এর গোলামদের চুরির শাস্তি মাফ করে দিয়েছিলেন। হাতিবের ক'জন গোলাম মুজাইনা কবিলার এক ব্যক্তির উট চুরি করে ধরা পড়লে তাদেরকে উমর রা.-এর দরবারে হাজির করা হয়। গোলামরা উমর রা.-এর কাছে চুরির কথা স্বীকার করে। উমর রা. হাতিবের ছেলে আবদুর রহমানকে ডেকে ঘটনা শোনালেন এবং কাছির ইবনে সালাতকে গোলামদের হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। হাত কাটার জন্যে গোলামদেরকে নিয়ে যাওয়ার পর উমর রা.-এর চিন্তা বদলে গেল। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি মওকুফ করে হাতিবের ছেলের উদ্দেশে বললেন :

'তোমরা এ অসহায় লোকদের দিয়ে কাজ করাও। কিন্তু পানাহারে এদেরকে এমন কষ্ট দাও যে এরা যদি কষ্টের যাতনায় কোনো হারাম বস্তুও খেয়ে ফেলে তাহলে তা এদের জন্যে জায়েয বিবেচিত হবে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ বিষয়টি না জানলে তাদের হাত কেটে দিতাম। কিন্তু এখন ওদের হাত কাটার পরিবর্তে তোমাদের ওপর এমন কঠিন জরিমানা ধার্য করবো যা তোমাদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

এরপর উমর রা. মুজাইনির কাছে উটের দাম জানতে চাইলেন। জবাবে মুজাইনি জানালেন, উটের দাম চারশ' দিরহাম হতে পারে। উমর রা. গোলামদের মালিককে আটশ' দিরহাম জরিমানা দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[১]

১২.২. উমর রা. কর্তৃক 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' খাতে যাকাত প্রদান স্থগিতকরণ

শরী'আহ্‌র প্রতিটি নির্দেশের মূলে যে মানুষের কল্যাণ সাধনের প্রয়াস রয়েছে সে গূঢ়-রহস্য ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য উপলব্ধি করেই উমর রা. অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। অনেক সময় তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের কোনো কোনোটি নসের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত মনে হতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল মাসলাহা বা কল্যাণ ও স্থান-কালের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শরী'আহ্‌র সঠিক প্রয়োগ। এরকম একটি দৃষ্টান্ত হলো 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' বা যাদের মন রক্ষার জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান

---

[১]ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

করা হয়, তাদের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত। আল কুরআনে আটটি খাতে যাকাত বণ্টনের কথা বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'। এ খাতে যাকাত বণ্টনের ক্ষেত্রে কুরআনের অকাট্য ও সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও উমর রা. উক্ত খাতে যাকাত প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ভিত্তিতেই হয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল বাস্তবতা ও বিশেষ অবস্থার আলোকে। কেননা, মুয়াল্লাফাতুল কুলুবকে যাকাতদানের আবশ্যকতা তখনই ছিলো যখন ইসলামী রাষ্ট্র তাদের মুখাপেক্ষী ছিলো, তাদের অনিষ্ট ও দুস্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু উমর রা.-এর সময় ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বৈরী শক্তির প্রতি রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষিতা ছিল না। ফলে তিনি 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' খাতে যাকাত প্রদান করা বন্ধ করে দেন।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম র. বলেন, শরী'আহ্র উক্ত হুকুমটি ছিল একটা বিশেষ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তা হলো মনরক্ষার কারণ। বস্তুত এ অতীব সূক্ষ্ম ফিকহিতত্ত্ব। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বিশেষ ও নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি। তিনি একটা গুণের একটা বিশেষ অবস্থার উল্লেখ করেছেন। কাজেই সেই গুণ বা বিশেষ অবস্থাটি যখন পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তখন তার ভিত্তিতে দেয়া শরী'আহ্র হুকুম পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কাজেই বলতে হবে উমর রা. কুরআনের স্পষ্ট-অকাট্য বিধিকে অকেজো করে দেননি; বরং শরী'আহ্র প্রতিটি হুকুম যে একটা কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট আর সে কারণটিই হচ্ছে উপযুক্ত যৌক্তিকতা ও নির্ভরযোগ্য কল্যাণ–তিনি শুধু এই তত্ত্বই উদ্ঘাটিত করেছেন মাত্র।[১]

১২.৩. লুকতাহ্ বা কুড়িয়ে পাওয়া মালের হুকুমের বিভিন্নতা

অবস্থা, নস-এর ইল্লত বা কার্যকারণ ও কল্যাণ পরিবর্তন হওয়ার সাথে হুকুম পরিবর্তনের আরো একটি উদাহরণ হলো 'লুকতাহ্' বা কুড়িয়ে পাওয়া মালের হুকুমের ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে বুখারি ও মুয়াত্তায় প্রায় একই ধরনের একটি হাদিস রয়েছে : এক লোক রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে কুড়িয়ে পাওয়া মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'এক বছর যাবৎ এর ঘোষণা দিতে থাকো। এরপর থলের মুখ বন্ধ করে স্মরণ রাখো। ইতোমধ্যে যদি মালিক এসে যায় তবে তাকে তা দিয়ে দাও। আর যদি না আসে তবে যা ইচ্ছা তা করো।' লোকটি বলল, 'সেটা ছাগল হলে কী করা হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ?' তখন তিনি বললেন, 'সেটা তোমার জন্য বা তোমার ভাইদের জন্য কিংবা নেকড়ে

---

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

www.pathagar.com

বাঘের জন্য।' লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুড়িয়ে পাওয়া উট কী করা যায়?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'তাতে তোমার কী? তার সাথে রশি ও পানির পাত্র রয়েছে। মালিক তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সে পানিতে অবতীর্ণ হতে পারে, গাছের পাতা খেয়ে বাঁচতে পারে।'[১]

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভি তাঁর 'ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ স.-এর এই নির্দেশ আবু বকর ও উমর রা.-এর আমল পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে অনুসৃত হতো। তখন হারানো উট যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। কিন্তু উসমান রা.-এর সময় এ অবস্থার একটু পরিবর্তন হলো। এ ব্যাপারে মুয়াত্তায় একটি বর্ণনা রয়েছে, 'উমর রা.-এর সময়ে হারানো উট ধরে রাখা হতো না। এমনকি বাচ্চা প্রসব করতো, কিন্তু কেউ তাতে হাত লাগাতো না। এভাবে যখন উসমান রা.-এর সময় এলো তখন তিনি তা চিনে রাখার এবং হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর মালিক না পাওয়া গেলে তা বিক্রি করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। অতঃপর মালিক এলে তাকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দেয়া হতো।'[২] আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, আলী র.-এর যুগের পর অবস্থার আরো পরিবর্তন হলো। তখন আলী রা. কুড়িয়ে পাওয়া উটকে মালিকের স্বার্থে হিফাযত করার নির্দেশ দিলেন। কারণ তিনি মনে করলেন, কুড়িয়ে পাওয়া উট তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি করলে দাম কম হওয়াই স্বভাবিক। এতে উটের মালিকের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে তিনি হারানো উটকে হিফাযতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যে খরচ হয় তা বায়তুল মাল থেকে দেয়ার আদেশ জারি করেন।[৩]

এ ক্ষেত্রে উসমান রা. ও আলী রা. যা করেছেন তা হাদিস বিরোধিতা নয়, বরং তা করেছিলেন হাদিসের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ রেখে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সময়ের মানুষের যে চরিত্র ছিলো তা উক্ত সম্মানিত দুই খলিফার সময় থেকে ভিন্ন। তাঁদের সময় কারো কারো হাত হারামের দিকে প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কা ছিলো। এমতাবস্থায় কারো কারো হাতে হারানো উট ধরা পড়লে মালিকের ফেরত না পাওয়ার আশঙ্কা ছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সময় এ আশঙ্কা ছিলো না। এ জন্য উক্ত সম্মানিত খলিফাদ্বয় বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে মানুষের কল্যাণেই উক্ত নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[৪]

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবু ফিল-লুকতাহ্, বাবু দল্লাতিল ইবিল; মুয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ১২৮।

[২]মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুত লুকাতাহ্।

[৩]ড. মরহুম মুহাম্মদ মুসা, তারিখুল ফিকহ আল ইসলামী ফিকহুস সাহাবা ওয়াত তাবেয়িন, পৃ. ৮৩-৮৫; ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

[৪]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

www.pathagar.com

১৩. কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপের কতিপয় দৃষ্টান্ত

ইসলামী শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জনগণের কল্যাণ সাধন করা। দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ-প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে শাসককে অবস্থার আলোকে কখনো অধিক থেকে অধিকতর কঠোর হতে হয়। আবার শাসনরীতি কখনো কখনো কঠোরতাহীন হয়ে থাকে। এসব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের কল্যাণকে কেন্দ্র করে।

জনগণের কল্যাণ বিবেচনায় শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরতার বিষয়টি সাহাবায়ে কিরাম ও সম্মানিত চার খলিফার দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়। একবার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. আবু বকর রা.-কে চিঠি লিখে জানালেন, তিনি আরবের এক স্থানে দেখেছেন যে, সেখানে কোনো এক পুরুষের সাথে নারীর মতো যৌনমিলন করা হয়। তখন আবু বকর রা. এ বিষয়ে অন্যান্য সাহাবির সাথে পরামর্শ করলেন। এদের মধ্যে আলী রা. উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কঠোর অভিমত ব্যক্ত করে বললেন, এ জাতীয় অপরাধ কেবল একটিমাত্র জাতি করেছিল। আল্লাহ্ তাদেরকে কি রকম শাস্তি দিয়েছেন তা সকলের জানা। সুতরাং আমার অভিমত হলো, এসব লোককে আগুনে পুড়িয়ে মারা। তখন আবু বকর রা. খালিদ বিন ওয়ালিদকে চিঠি লিখে এ সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। ফলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর ও হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক তাদের শাসন আমলে সমকামীদের আগুনে পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েছিলেন।[১]

চুরি-ডাকাতি নির্মূলের জন্য উমর রা. হদ বা দণ্ড-বিধির ব্যাপারে মদ্যপায়ীকে চল্লিশ বেতের অতিরিক্ত বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং তাকে নির্বাসনের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।'[২] আবার তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার মদ্যপানের শাস্তি হিসেবে হত্যা করার ফরমান জারি করা হয়েছিল। এ ফরমান ইসলামের সাধারণ বিধানকে রহিত করেনি; বরং এটি ছিল অতিরিক্ত দণ্ড।[৩]

ইসলামী আইনে 'তাযির'-এর বিধান রয়েছে। তাযির প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনকল্যাণের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয়। যেমন, উমর রা. শুধু মানবকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নছর ইবনে হুজ্জাজকে কোনো অপরাধ ছাড়াই নির্বাসন দিয়েছিলেন। এ কারণে নছর উমর রা.-কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমিরুল মুমিনিন! আমার অপরাধ কী? উমর রা. উত্তরে বলেছিলেন, আপনার কোনো অপরাধ নাই, অপরাধ আমারই– যদি না হিজরতের এ পবিত্র ভূমিকে আপনার থেকে মুক্ত

---

[১] ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

[৩] প্রাগুক্ত,।

www.pathagar.com

করি। আসলে নছর ইবনে হুজ্জাজের শারীরিক সৌন্দর্য দেখে মহিলাদের ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা থেকেই উমর রা. তাকে নির্বাসিত করেছিলেন।'[১] তাঁর এ সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছিল জনকল্যাণের স্বার্থেই।

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বিরচিত 'আল হিসবাহ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাযিরের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।[২] এখানে তা থেকে ক'টি তুলে ধরা হলো :

রাসূলুল্লাহ্ স. একবার এক অপরাধীকে একশ বেত্রাঘাত করেছিলেন এই কারণে যে, লোকটির স্ত্রী তার নিজের দাসীকে স্বামীর জন্য হালাল করে দিলে স্বামী দাসীর সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রে সন্দেহের কারণে যিনার হদ মওকুফ করে তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে এসে তোমাদেরকে অন্য কারো বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাদের জামা'আতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করবে, সে যে-ই হোক তার কল্লা তরবারি দিয়ে কেটে দাও। দাইলাম আল হামিরি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে এমন লোক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন যে মদপান ত্যাগ করছে না। রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, মদপান ত্যাগ না করলে তাকে হত্যা করো।

'মুয়িনুল হুক্কাম' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকের অনেক অধিকার রয়েছে, এমনকি প্রয়োজনে কাউকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারেন। সন্ত্রাসী ও অপরাধী চক্রের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে তাদের ওপর কঠোর নীতি অবলম্বন করা, তালাকের শপথ নেয়া, সাক্ষীদের ওপর সন্দেহ হলে শপথ নেয়া ইত্যাদি কাজ বিচারক করতে পারেন।[৩]

১৪. কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে শাস্তি মওকুফের অনন্য নজির

ইসলাম বিনা বিচারে কাউকে আটকিয়ে রাখা, কাউকে শাস্তি দেয়া কিংবা কাউকে হত্যার অনুমতি দেয় না। ইসলামের মূল চিন্তাধারা হলো, যতদূর সম্ভব শাস্তি পরিহার করে চলা। জীবননাশের চেয়ে জীবন রক্ষাকে ইসলামে অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'যতদূর সম্ভব মুসলমানকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, সুযোগ থাকলে তাকে ছেড়ে দাও। অপরাধীকে ভুল করে শাস্তি দেয়ার চেয়ে ভুল করে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম।'[৪] রাসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, 'বাঁচানোর কোনো পথ থাকলে মানুষকে শাস্তি থেকে মুক্তি দাও।'[৫]

---

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

[৩]প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[৪]জামে আত-তিরমিযি, আবওয়াবুল হুদুদ।

[৫]ইবনে মাযাহ।

www.pathagar.com

কারো অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরও খাঁটি তওবা বা অনুতপ্ত হওয়ার কারণে জনকল্যাণের স্বার্থেই কিছু কিছু শাস্তি মওকুফ করার বিধানও ইসলামী আইনে লক্ষ করা যায়।

এ রকম আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো, কোনো কোনো মুনাফিকের মুনাফেকি ধরা পড়েছিল এবং যারা রাসূলুল্লাহ্ স. ও মুসলিম সমাজকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছিল তাদের অনেককে ব্যক্তিগতভাবে চেনা-জানার পরও রাসূলুল্লাহ্ স. তাদেরকে শাস্তি দেননি।[১] এর কারণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ স. নিজেই বলেছেন, 'মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদেরকে হত্যা করে' আরবরা এ কথা বলাবলি করুক তা আমি চাই না।[২] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ স. এই আশঙ্কায় তাদেরকে শাস্তি দেননি যে লোকেরা ঐ মুনাফিকদেরকে হত্যার আসল কারণ না জেনেই বলাবলি করতে থাকবে যে, মুহাম্মদ স. তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে। ফলে অনেক আরব ইসলাম গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতে পারে।

শাস্তি মওকুফের আরো একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায় সাঈদ ইবনে মানসুরের 'সুনান' নামক গ্রন্থে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, উমর রা. লোকদের কাছে লিখে পাঠান যে, কোনো সেনাপ্রধান বা অন্য কোনো মুসলমান যুদ্ধরত অবস্থায় কাফেলাসহ রাস্তা অতিক্রম না করা পর্যন্ত যেন অপরাধীকে হদ হিসেবে বেত্রাঘাত না করা হয়, যাতে ঐ ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় কাফিরদের দলে চলে যায়।[৩]

উমর রা.-এর উক্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায় ইসলামী শাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম শাসকদের কার্যক্রমে। কাদিসিয়ার যুদ্ধে আবু মাহজান মদপান করেন। তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। আবু ওয়াক্কাস রা. তাকে শাস্তি না দিয়ে বন্দি করে রাখার নির্দেশ দেন। যখন যুদ্ধ লেগে যায় তখন আবু মাহজান একটি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। কবিতাটি হলো : 'ঘোড়াগুলো তীর-বল্লম নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে আর আমি পায়ে বেড়িপরা অবস্থায় বন্দি হয়ে থাকব তা আমার জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ।'[৪] তখন তিনি সা'দ রা.-এর স্ত্রীকে বললেন, আপনি আমাকে মুক্ত করে দিন, আমি ওয়াদা করছি– আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিরাপদে ফিরে এলে আবার স্বেচ্ছায় পায়ে বেড়ি পরবো। আর যদি মারা যাই তাহলে আপনারা আমার থেকে নিস্কৃতি পাবেন। যখন তাকে ছেড়ে দেয়া হলো তখন তিনি সা'দ রা.-এর একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে তীরধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি শত্রুদলের যেদিকেই আক্রমণ করছিলেন সেদিকেই তাদেরকে পরাজিত করে ছাড়ছিলেন।

---

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
[২]সহিহ আল বুখারি ও মুসলিম।
[৩]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.৭।
[৪]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮।

www.pathagar.com

এ সময় সা'দ রা. আহত থাকার কারণে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন খালিদ ইবনে আরকতা। সা'দ উঁচু স্থান থেকে যুদ্ধের অবস্থা অবলোকন করছিলেন। আবু মাহজানের এ বীরত্ব দেখে লোকেরা বলাবলি করছিল এটি কি আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। কেননা, আবু মাহজান তখন বন্দি ছিল। যুদ্ধে শত্রুরা পরাজিত হলে আবু মাহজান ওয়াদা মতো ফিরে এলেন এবং স্বেচ্ছায় পায়ে বেড়ি পরলেন। অতঃপর সা'দ রা.-কে এ ঘটনা জানানো হলে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন লোককে বেত্রদণ্ড দিতে পারি না যিনি মুসলমানদের জন্য দুঃসাধ্য কাজ করেছেন। তারপর তাকে মুক্তি দেয়া হলো। তখন আবু মাহজান বললেন, যখন আমার ওপর হদ কায়েম করে আমাকে পবিত্র করার ব্যবস্থা ছিল তখন আমি মদ পান করতাম। এখন আমাকে তা হতে মুক্ত করা হলো। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর কখনো মদ পান করবো না। এ ঘটনার একটি শব্দও দলিল, প্রমাণ, যুক্তি ও ইসলামী শরী'আহ্‌র মূলনীতির পরিপন্থি নয়। বরং যদি বলা হয় সা'দ রা.-এর সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছে ইজমা, তাহলে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না।[১]

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের এ সিদ্ধান্ত শরী'আহ্‌র মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় বলেই অভিমত পাওয়া যায় বিভিন্ন ফকিহ ও ইসলামী চিন্তাবিদ থেকে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা র. বলেছেন, দৃশ্যত বুঝা যায় সা'দ রা. আবু মাহজানের হদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করেছেন। সা'দ যখন আবু মাহজানের মধ্যে দীনের প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ-মানসিকতা, বীরত্ব ও তীব্র আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পান, তখন তিনি হদ তথা শাস্তি মওকুফ করে দেন। কারণ আবু মাহজানের সুকৃতি তার দুস্কৃতিকে ছাপিয়ে গেছে। যাকে বলা যেতে পারে, এক টুকরো নাপাক জিনিস বিশাল জলাধারে লীন হয়ে গেছে। তা ছাড়া সা'দ নিজে রণাঙ্গনে আবু মাহজানের মনোদৈহিক অকৃত্রিম তরবার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোনো অকৃত্রিমতা ছাড়া রণাঙ্গনে এভাবে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে কোনো মানুষ গোনাহের পুনরাবৃত্তি করার মানসিকতা ধারণ করতে পারে না। জীবনমৃত্যুর কঠিন অবস্থায় নিজেকে নিক্ষেপ করে ফিরে এসে আবার স্বেচ্ছায় হাতে-পায়ে শিকল পরে বন্দিত্ববরণ করে নেয়ার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, আবু মাহজান সত্যিকার তওবা করেছেন, তার অপরাধের শাস্তি ক্ষমাযোগ্য।[২]

অপরাধের পর তওবাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার নজির রাসূলুল্লাহ্ স.-এর আমলেই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর যুগে ভোরের অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাচ্ছিল এক মহিলা। পথে তার ওপর হামলে পড়লো এক লোক। লোকটি তার শ্লীলতাহানি ঘটাতে শুরু করল। মহিলাটি চিৎকার

---

[১]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

www.pathagar.com

করতে লাগল এবং তার পাশ দিয়ে গমনকারী এক ব্যক্তিকে সাহায্য করার অনুরোধ জানাল। সে ব্যক্তি যখন মহিলার কাছে পৌঁছল, হামলাকারী ততক্ষণে পালিয়ে গেছে। সাহায্যকারী লোকটি হামলাকারীর পিছু ধাওয়া করল। ইতোমধ্যে উক্ত মহিলার কাছে আরো ক'জন লোক পৌঁছল। এ লোকদের কাছেও সে সাহায্যের আবেদন করল। তারা মহিলার ফরিয়াদ শুনে অপরাধীকে ধরার জন্যে দৌড়াল। আক্রান্ত মহিলার সাহায্যকারী দলের লোকেরা প্রথম সাহায্যকারী ব্যক্তিকে দৌড়াতে দেখে সবাই তার পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনল। কিন্তু লোকটি তা অস্বীকার করে বলল, 'আমি তো মহিলার সাহায্যকারী। অপরাধীকে ধরার জন্যই আমি তাকে ধাওয়া করছিলাম।' কিন্তু অন্যেরা তা বিশ্বাস করল না। অবশেষে তাকে ধরে নবী করীম স.-এর দরবারে নিয়ে এলো।

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর দরবারে মহিলা নিজেই সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, 'এ লোক আমার শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছে।' অন্যরাও তা সমর্থন করে বলল, 'পলায়নরত অবস্থায় আমরা তাকে ধরে ফেলেছি।' অভিযুক্ত লোকটি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে বলল, 'আসলে আমি আক্রান্ত মহিলার সাহায্যের জন্য এসে পলায়নকারী অপরাধীকে ধরার জন্য ধাওয়া করেছিলাম কিন্তু এ লোকেরা আমাকে দৌড়াতে দেখে অপরাধী ভেবে ধরে নিয়ে এসেছে।' একথা শুনে মহিলা বলল, 'না, সে মিথ্যা বলছে। আসলে সেই আমার শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ্ স. বাদি-বিবাদি ও পাকড়াওকারীদের যবানবন্দী শুনে নির্দেশ দিলেন, 'যাও, প্রস্তরাঘাতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করো।' এমন সময় সমবেত লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'না, ওকে নয় আমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলুন। কারণ, সে নয় আমি মহিলার শ্লীলতাহানি করেছি।'

রাসূলুল্লাহ্ স. মূল অপরাধী (আত্মস্বীকৃত অপরাধী)-কে বললেন, তোমাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও সাধুবাদ দিলেন। এ সময় উমর রা. আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আত্মস্বীকৃত ব্যভিচারীকে শাস্তি দিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ স. উমরের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বললেন, সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে গেছে।[১]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মস্বীকৃত যিনাকারী ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী হলেও আল্লাহ্‌র দরবারে সে ক্ষমার অযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র দয়ার ভাণ্ডারে তার ক্ষমার অবকাশ ছিল। তাই সে খাঁটি মনে তাওবা করে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকার পরও নিজের অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি ভোগ করার জন্য নিজেকে পেশ করার দ্বারা প্রমাণ করে যে, সে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে উদগ্রীব। একমাত্র পূর্ণ তাকওয়াই পারে আত্মস্বীকৃতিতে উদ্বুদ্ধ

---

[১]সুনানু নাসা'ঈ। আরো দেখুন- ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯।

www.pathagar.com

করতে। বস্তুত সে আত্মস্বীকৃতি দিয়ে খাঁটি মন ও তাকওয়ার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে তা তার অপরাধকেও ছাপিয়ে গেছে। নিরপরাধ একজন মুসলমানের জীবন রক্ষা করেছে তার স্বীকারোক্তি। সে অন্যজনের জীবনকে নিজের জীবনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।

বস্তুত মন্দ কাজ ভাইরাসের মতো, ভালো কাজ ওষুধ হিসেবে তার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে। এমতাবস্থায় রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকায় ভাইরাস অবদমিত হয়ে যায় এবং রোগী আবার পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। উক্ত অপরাধীকে মাফ করে দেয়ার মধ্যে এই হিকমত নিহিত ছিল বলেই রাসূলুল্লাহ্ স. তা করেছিলেন। কারণ শাস্তি দিতে হবে সংশোধনের জন্য যে নিজে নিজেই সংশোধন হয়ে নিজেই মাথা পেতে শাস্তি নিতে প্রস্তুত হয়েছে তাকে আর শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন হয় না বিধায় রাসূলুল্লাহ্ স.-এর এ পদক্ষেপ ছিল।

অপারেশন বা শাস্তি তো দেয়া হবে রোগী কিংবা অপরাধীকে সুস্থ কিংবা পবিত্র করার জন্য। ইতোমধ্যেই যারা সুস্থ বা পবিত্র হয়ে গেছে তাদের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন নেই। শাস্তি বা অপারেশন ছাড়াই যেহেতু অপরাধী অপরাধমুক্ত হয়ে গেছে রোগী সুস্থ হয়ে গেছে, তাই তার প্রতি সদয় হয়ে তাকে আর কাটাছেঁড়া করা বা শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাই বলা যায়, রাসূলুল্লাহ্ স. এ ক্ষেত্রে যে ফয়সালা দিয়েছেন তার চেয়ে বাস্তবানুগ ও কল্যাণকর আর কোন ফয়সালা হবে? যে ফয়সালায় দয়া, মমতা, মানবিকতা, প্রজ্ঞা ও কৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে?[১]

১৫. সামষ্টিক কল্যাণ বিধানে শাস্তি স্থগিত

সামষ্টিক কল্যাণ বিধানে শাস্তি স্থগিতকরণে বহু নির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহ্ ও সাহাবিগণের আমলে দেখা যায়। ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, গর্ভবতী ও সদ্য প্রসবকারিণী নারীর হদ বাস্তবায়নের বিষয়টি বিলম্বিত করার নির্দেশ আল কুরআনেই রয়েছে। অনুরূপ অসুস্থ ব্যক্তির হদ বাস্তবায়নে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অতিশয় গরম ও ঠান্ডার মধ্যেও হদ বাস্তায়ন করা বৈধ নয়। বস্তুত একজন অপরাধীর সুবিধা–অসুবিধার কথা বিবেচনা করে যদি তার হদ বাস্তবায়ন বিলম্বিত করা যায়, তাহলে দীনের কল্যাণে হদ বিলম্বিত করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও জায়েয বিবেচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।[২]

উমর রা.-এর পুত্র উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. ক্রুদ্ধ হয়ে পিতার হত্যাকারী আবু লু'লুওয়াহ্র মেয়ে ও তার সহযোগী জুফাইনা নামক জনৈক খ্রিস্টান এবং

---

[১]ইবনুল কাইয়্যিম র., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানবিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের গুরুত্ব, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ-১, সংখ্যা ১, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

[২]ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানবিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের গুরুত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।

www.pathagar.com

তাসতুরের গভর্নর হরমুজানকে হত্যা করেন। তখন একদল সাহাবি উবায়দুল্লাহ্‌কে শাস্তি প্রদানের জন্য উসমান রা.-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। আর একদল মুহাজির সাহাবি বললেন, আপনি কিভাবে আজ তাকে হত্যা করতে পারেন, গতকাল যার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। এ অবস্থায় উসমান রা. বিচারের ক্ষেত্রে কিছুটা সময় নেন। এর কারণ এই নয় যে, তিনি উবায়দুল্লাহ্‌কে মাফ করে দিয়েছেন, বরং এর কারণ ছিলো উমর রা.-এর শাহাদাতের কারণে মুসলিম সমাজে যে অবস্থা বিরাজ করছিল তাতে উবায়দুল্লাহ্‌কে শাস্তি দিলে মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা আরো বেড়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে উসমান রা. বলেন, 'আমার ভয় হচ্ছে উবায়দুল্লাহ্‌কে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা হলে লোকেরা প্রচার করতে থাকবে যে, গতকাল উমর র. নিহত হয়েছে আজকে আবার তাঁর সন্তানকে হত্যা করা হলো।'[১] পরবর্তীতে উসমান রা. নিজের সম্পদ থেকে উক্ত তিন জন নিহত ব্যক্তির দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করে উবায়দুল্লাহ্‌কে মুক্ত করে দেন। কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারী না থাকায় রক্তপণের টাকা বাইতুল মালে জমা করেন এবং উবাইদুল্লাহ্‌কে মুক্ত করে দেন।[২]

আলী রা.-ও উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের এসব সিদ্ধান্ত ছিলো মূলত মানবকল্যাণের জন্যই। শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে শাস্তি মওকুফ করা কিংবা শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করার নীতিতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মর্মে ইবনে কুদামা তাঁর মুগনি নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩]

১৬. সামষ্টিক কল্যাণের জন্য বৈধ ভোগের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ

ইসলামী শরী'আহ্‌র একটি মূলনীতি হলো মানুষের সামষ্টিক কল্যাণের জন্য কিংবা ক্ষতি ও বিপর্যয় এড়ানোর জন্য কোনো কোনো বৈধ বিষয়ের ওপর শর্তারোপ করা যায়।

উমর রা. ব্যক্তিগত ভোগের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান র. বর্ণনা করেছেন, বিখ্যাত সাহাবি হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রা. মাদায়েন শহরে এক ইহুদি মেয়েকে বিয়ে করেন। তখন উমর রা. ইহুদি মেয়েকে তালাক প্রদানের জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। এর উত্তরে হুযায়ফা রা. প্রশ্ন করলেন, আমিরুল মু'মিনিন! এ মহিলাকে বিয়ে করা কি হারাম? উত্তরে

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
[২]ইমামুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ্, খ. ৭, পৃ. ১৬৭।
[৩]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

উমর রা. আবার লিখলেন, তোমার প্রতি কড়া নির্দেশ– এ চিঠি পড়ে হাত থেকে রাখার পূর্বেই তাকে তালাক দেবে। কারণ আমি আশঙ্কা করছি লোকেরা এতে তোমার অনুসরণ করবে। ফলে আহলে কিতাবদের মহিলাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে থাকবে। এতে মুসলিম মহিলাগণ অসুবিধায় পড়ে যাবে।'[১]

গোশত ভক্ষণ করা সবার জন্য বৈধ। কিন্তু মদিনায় যখন গোশতের অভাব দেখা দিয়েছিল তখন উমর রা. সপ্তাহে দুদিন লাগাতার গোশত খেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তিনি নিজেই মদিনায় অবস্থিত যুবাইর ইবনে আওয়ামের কসাইখানায় যেতেন। কাউকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে দেখলে বেত্রাঘাত করতেন এবং বলতেন, কেন তোমরা দুদিনের মধ্যে উদরভর্তি করনি? তিনি এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন যাতে সবাই সমানভাবে গোশত খেতে পারে।[২]

১৭. ইসলামী শরী'আহ্ আইনের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ সমীচীন নয়

কিছু সমালোচক ইসলামী দণ্ডবিধির সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে ইসলামী শরী'আহ্র বিরুদ্ধে কঠোরতা ও বর্বরতার অভিযোগ করে থাকে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াল কল্পকাহিনী প্রচার করে এবং বলে বেড়ায় যে, মুসলমানেরা কথায় কথায় মানুষের হাত কেটে ফেলে এবং প্রায়শই সোল্লাসে প্রস্তরাঘাতে নারী হত্যা করে। তারা প্রতিনিয়ত ইসলামী শরী'আহ্ আরোপিত সীমিত কতিপয় অপরাধের শাস্তিকে মানুষের জন্য বর্বর ও নিষ্ঠুর হিসেবে আখ্যায়িত করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গোটা ইসলামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করছে। তারা ইসলামী শরী'আহ্র প্রণীত হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, চুরির শাস্তি হাতকাটা, ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা ইত্যাদিকে কঠোর মনে করছে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আইন কঠোরতা ও নমনীয়তার সমন্বয় ঘটিয়েছে। কতিপয় গুরুতর অপরাধের অশুভ পরিণাম থেকে সমাজ ও জাতিকে রক্ষার জন্য ইসলামী শরী'আহ্ যেমন কঠোরতা অবলম্বন করে, তেমনি এর বিপরীতে বহু ক্ষেত্রেই দয়া ও উদারতার মাধ্যমে মানুষের অপরাধকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে থাকে। ইসলামী দণ্ডবিধিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখলে কঠোর মনে হতে পারে কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করলে তা প্রকৃতই মানবজাতির জন্য অধিকতর কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে।

---

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[২]শায়খ আলী খফিফ, আল মিলকিয়াতুল ফারদিয়া ওয়া তাহদিদুহা। উদ্ধৃতি : ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

www.pathagar.com

ইসলামী শরী'আহ্কে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজের কথা ধরে নিতে হবে। অনৈসলামিক সমাজে বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে ইসলামী শরী'আহ্ আইনের অনেক বিষয়কে বেখাপ্পা মনে হতে পারে। কারণ সেখানে ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকরের পরিবেশ বিদ্যমান নেই। যেমন একটি অবাধ যৌন স্বাধীনতার দেশে বসে যদি ইসলামী শরী'আহ্র ব্যভিচারসংক্রান্ত বিধান কিংবা একটি ব্যাপক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের পরিবেশে বসে চুরি ও দুর্নীতির বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাহলে আলোচকের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ সেখানকার বহু মানুষই ব্যাপকভাবে এসব অপরাধে জড়িত এবং এ কারণে তাদের অনেকের ওপরই ইসলামের ব্যভিচার ও চুরিসংক্রান্ত শাস্তি কার্যকর করা জরুরি হয়ে পড়ে। তখন ইসলামী শরী'আহ্ সম্পর্কে কারো মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, শরী'আহ্ শুধু মানুষকে শাস্তি দিতেই এসেছে।

যেখানে অপরাধের হাজার দুয়ার খোলা, প্রত্যেক ব্যক্তি এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠে যেখানে তাকে অপরাধ করতে অনুপ্রাণিত করা হয়, নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়, তখন ব্যক্তির অপরাধের কারণে তার ওপর আরোপিত শাস্তির যৌক্তিকতা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। কিন্তু ইসলাম এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যেখানে শরী'আহ্ প্রণীত ব্যভিচার ও চুরির শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল মাত্র হাতেগোনা কয়েকজনকে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মহানবী স. ও খিলাফতে রাশেদার যুগ থেকে পরবর্তী চার শত বছরে মাত্র ছয় বার চুরির অপরাধে হাতকাটার শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল।[১]

অনুরূপভাবে বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল। ধর্ষণের শাস্তি কার্যকর থাকার কারণে খিলাফতে রাশেদার যুগে একজন নারী একাই দূর-দূরান্তে নিরাপদে সফর করতে পারতো। অথচ একবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কোথাও-না-কোথাও প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো নারী ধর্ষিত হচ্ছে এবং ধর্ষণের মাত্রা দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলছে। ভয়ঙ্কর আরো একটি ব্যাপার হলো, বর্তমানে নারীদের পাশাপাশি পুরুষও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, বৃটেনের মতো দেশে প্রতি দশ জন পুরুষের মধ্যে একজন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এর প্রতিরোধের জন্য মানবতাবাদী সংগঠনগুলো পর্যন্ত ধর্ষককে কঠিন শাস্তি দিয়ে হত্যা করার পরামর্শ দিচ্ছে।

---

[১] ফিকহে হানাফির ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৫।

www.pathagar.com

যদিও তারা এতোদিন মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে আসছিল। এখন তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধানই সর্বোত্তম ও কল্যাণকর।

এখনো বহু দেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর রয়েছে। আবার অনেক দেশের সরকার বিরুদ্ধ শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দিয়ে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে তাদেরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলাচ্ছে। কোনো কোনো দেশে প্রতিবাদী জনতার মিছিলে সরকারি পেটোয়া বাহিনী গুলি-গ্রেনেড দিয়ে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। জঙ্গিদমনের নামে সাম্রাজ্যবাদীরা ড্রোনহামলা ও কথিত ক্রসফায়ারের মাধ্যমে বিনাবিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে। তথাকথিত মানবতাবাদীরা এসব অপকর্মের সমর্থন যোগাচ্ছে এই অজুহাতে যে, এসব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে শুধু ধর্মীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক শক্তি নির্মূলের জন্য। তাদের দৃষ্টিতে, ধার্মিক কিংবা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরা যত ভালো কাজই করুক না কেনো তাদের জন্য মানবাধিকার প্রযোজ্য হবে না। তাদের দৃষ্টিতে মানবাধিকার শুধু সেক্যুলারদের জন্য। তথাকথিত মানবতাবাদীরা মুখে যাই বলুক না কেনো, গোপনে গোপনে তারা এই চিন্তাই লালন করে যে, ধর্মবিশ্বাসীদের থামাও।

নিরপেক্ষতার সাথে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ইসলামী শরী'আহ্ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে মানবরচিত আইনই বর্বর, কঠোর ও নির্মম। সেখানে বিচার নেই আছে অবিচার, দয়া নেই আছে জুলুম। মানবরচিত আইনের ব্যর্থতা ও বর্বরতার চিত্র আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। সেখানে নাগরিক সুবিধার কথা মুখে বলা হলেও পুলিশি হয়রানি এবং রিমান্ডের নামে অকথ্য ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তেই হরণ করা হচ্ছে মানবাধিকার। গণতন্ত্রের কথা বলা হলেও অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে দিনের পর দিন নিষ্ঠুর অত্যাচারের মাধ্যমে ভিন্নমতের মানুষের ওপর চালানো হচ্ছে দমনপীড়ন। তাদের নাকে ঢালা হচ্ছে গুঁড়ো মরিচ মেশানো গরম পানি, শরীরে দেয়া হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক, মলদ্বারে ঢোকানো হচ্ছে গরম ডিম। কোথাও কোথাও পুরুষের গোপনাঙ্গ আর নারীর স্তন কেটে নেয়া হচ্ছে। আবার হত্যার পর গোপন করা হচ্ছে লাশ। এতসবের পরও মানবতার কল্যাণে প্রণীত ইসলামী শরী'আহ্র বিরুদ্ধে তাদের গলাবাজি থামছেই না।

১৮. ইসলামী শরী'আহ্র দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়

ইসলামী শরী'আহ্তে কথায় কথায় কারো ওপর শাস্তি কার্যকর করা হয় না। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা অবলম্বন করা হয়। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্তে যেসব বিষয় অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় তা হলো :

www.pathagar.com

১৮.১. অপরাধের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন : অপরাধীর ওপর শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে অপরাধের প্রেক্ষাপট গভীরভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। কোন অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে অপরাধী অপরাধ করেছে, সে কি স্বেচ্ছায় অপরাধ করেছে, নাকি তাকে বাধ্য করেছে ইত্যাদি বিষয় ইসলামী দণ্ডবিধিতে অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক যদি জানা যায় যে, অপরাধী কোনো পরিস্থিতির শিকার কিংবা তার অপরাধটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়, তাহলে অপরাধীকে অবশ্যই 'সন্দেহ-সুবিধা' দিতে হবে। অর্থাৎ অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে হদ বা শরী'আহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা যাবে না।

১৮.২. কঠোরতা ও দয়ার সমন্বয় : ইসলামী শাস্তিবিধান কার্যকর করার সময় কঠোরতা ও দয়ার বিষয়টি সমানভাবে বিবেচনা করা হয়। মানবজাতির অস্তিত্ব ও তার মৌলিক বিষয়গুলো সংরক্ষণের জন্য ইসলাম যেমন শাস্তিদানে কঠোর তেমনি অপরাধীর কোনো অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয় সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কিন্তু কোনো অপরাধীর প্রতি দয়া-অনুকম্পা প্রদর্শনের কারণে যেন সমষ্টির কিছুমাত্র ক্ষতি না হয় তাও বিবেচনা করা হয়। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা-নমনীয়তার সাথে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরনীতি প্রয়োগ করা হলে সমাজে অপরাধের সংখ্যা দ্রুত কমে যায়। আবার শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা হলে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই ইসলামী শরী'আহ্ শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন কঠোরতার নীতি অবলম্বন করে তেমনি প্রয়োজনে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিয়ে দয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

১৯. সমাজে ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগের সুফল ও কল্যাণ

ইসলামী শরী'আহ্‌র দণ্ডবিধি যেমন শিক্ষামূলক তেমনি দৃষ্টান্তমূলকও। এ জন্য হদ জনসমক্ষে কার্যকর করা হয়, যাতে অন্যরা শিক্ষা নিয়ে তা থেকে বিরত থাকে। আইন বিজ্ঞানেও বলা হয়, শাস্তি যতই শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক হবে সমাজে অপরাধের প্রবণতা ততই কমে যাবে।

বর্তমানে বহু দেশের কারাগারগুলো অপরাধ শিক্ষার সুদৃঢ় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সামান্য অপরাধের কারণে কাউকে কারাগারে প্রেরণ করা হলে সেখানে বড় বড় অপরাধীর সাথে কিছুদিন কাটানোর পর সে একজন দক্ষ ও পাকাপোক্ত এবং দুঃসাহসী অপরাধী হয়ে বের হয়ে আসে। তাই বিষয়টি এখন গভীরভাবে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। অপরাধীকে অপরাধবিমুখ এবং

www.pathagar.com

সমাজকে অপরাধমুক্ত করতে হলে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বড় বড় অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক দৈহিক শাস্তিদানের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

সমাজ থেকে যাবতীয় অপরাধ, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্র শাস্তি আইনের ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে সিরিয়ার বিখ্যাত আইনজ্ঞ প্রফেসর ফারেস আল খাওরি বলেন, 'জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে পুলিশি নিরাপত্তা রক্ষী এবং আদালতের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি হিসেবে রাষ্ট্রের বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু আজকে ইসলামী শরী'আহ্ আইন বাস্তবায়ন করা হলে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হালব শহরে একটি হাত কাটা হলে, দাইর যুরে আর একজনকে বেত্রাঘাত করা হলে তৃতীয় আর একজনের দামেশকে রজম করা হলে, বিভিন্ন জেলায় অনুরূপ শাস্তি দেয়া হলে অবশ্যই অপরাধ প্রবণতা কমে যেত এবং রাষ্ট্রের কমছে-কম চার-তৃতীয়াংশ খরচও কমে যেত।[১]

অপরাধ নির্মূলকরণের ক্ষেত্রে ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগের সুফলতার প্রমাণ মেলে সৌদি আরবের শাসনব্যবস্থায়। সেখানে ইসলামী আইনের মাত্র কয়েকটি দণ্ডবিধি কার্যকর থাকায় সালাতের সময় দোকাট-পাট খুলে রেখেই লোকেরা সালাতে শরিক হয় কিন্তু কোনো মাল চুরি হয় না। অথচ একসময় সেখানে–হদ কায়েমের পূর্বে, ভয়ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা সংঘাতিকভাবে বিরাজমান ছিল, চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল ব্যাপক।

যাই হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের দণ্ডবিধির কঠোরতা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও অমানুষিক। সেখানে দুইশত তেইশ ধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।[২] ইংল্যান্ডের আইনে এক শিলিং-এর চেয়ে অধিক মূল্যের সম্পদ চুরি করলেও চোরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। এই সেদিনও রাশিয়াতে চুরি, পেশাদার জালিয়াতি, নারী ধর্ষণ ও ঘুষ গ্রহণের ক্ষেত্রে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল এবং বর্তমান কম্যুনিস্ট চিনেও অনুরূপ শাস্তি বলবৎ রয়েছে।[৩] অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণে ইসলামী শরী'আহ্তে মাত্র গুটিকয়েক অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি অনুমোদন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মুরতাদের শাস্তি অন্যতম।

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

[২]গাজী শামছুর রহমান, ইসলামের দণ্ডবিধি, পৃ. ৭১; আরো দেখুন, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬।

[৩]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬।

www.pathagar.com

১৯.১. হত্যার শাস্তি ও তা প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কল্যাণ

ইসলামী শরী'আহ্তে মাত্র হাতেগোনা ক'টি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্দিষ্ট। হালকা বা অগভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে তা কঠোর ও নির্মম মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটা করা হয়েছে মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ ও ভারসাম্য রক্ষা এবং সমাজের অন্য সকল মানুষের জীবন রক্ষার জন্য। হত্যা প্রতিকারে কঠিন শাস্তির বিধান না থাকলে মানবহত্যা একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই ইসলাম এ ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করে। তবে এ শাস্তি প্রদানের বিষয়টি কঠোর শর্তযুক্ত। যথোপযুক্ত বিবেচনা ব্যতিরেকে এ শাস্তি প্রদান করা যায় না। মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সামগ্রিক ঘটনা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে সামান্যতম সন্দেহের সৃষ্টি হলেই তা রহিত হয়ে যায়। এ ছাড়া নিহতের উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছে করলে দিয়াত বা রক্তপণের বিনিময়ে কিংবা কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়াই অপরাধীকে মাফ করে দিতে পারে।

এ ছাড়া শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্র একটি সাধারণ নীতি হলো,

إِدْرَءُوْا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِئَ فِيْ الْعُقُوْبَةِ.

অর্থাৎ, 'যতদূর সম্ভব তোমরা মুসলিমদের থেকে 'হদ' (নির্ধারিত শাস্তি) প্রতিহত করো। যদি রেহাই দেয়ার কোনো সুযোগ থাকে তবে অপরাধীর পথ ছেড়ে দাও। কারণ ইমামের শাস্তি প্রয়োগ করে ভুল করার তুলনায় ক্ষমা করে ভুল করা উত্তম।'[১] নবী করিম স. আরো বলেছেন, إِدْرَءُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ-'সন্দেহের ক্ষেত্রে হদ রহিত করো।'[২]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْهُ-'হদ' কার্যকর করা তোমার জন্য সংশয়পূর্ণ হলে তা রহিত করে দাও।'[৩] আনাস ইবনে মালিক রা. বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট কিসাসের কোনো মামলা উত্থাপিত হলেই আমি দেখেছি যে, তিনি তা ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।'[৪]

উল্লেখ্য যে, আল কুরআনে ফৌজদারি আইনের উপাদান খুবই সীমিত। আবার উপাদান যে সামান্য কয়টি রয়েছে সেগুলোর প্রয়োগবিধি সম্পর্কে কুরআন প্রায়

---

[১]জামে আত-তিরমিযি, আবওয়াবুল হুদুদ; হাকিম ও বায়হাকি।

[২]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৭।

[৩]শারহু ফাতহিল কাদির, খ. ৫, পৃ. ৩২।

[৪]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, বাবুল ইমামি ইয়ামুরু বিল আফবি ফিদদাম।

www.pathagar.com

নিশ্চুপই বলা চলে। সেখানে ইসলামী আইনবিজ্ঞানের উদার হবার যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেছে।[১]

১৯.২. ব্যভিচারের শাস্তি ও তা প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কল্যাণ

মানুষের বংশধারার পবিত্রতা সংরক্ষিত না হলে মানবজাতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে। তাই ইসলামী শরী'আহ্‌তে বংশধারার পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারিত। খোলা চোখে এ শাস্তিকে কঠোর মনে হতে পারে তবে এর চেয়ে কঠিন হলো ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণ করা। প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে জনসমক্ষে কেউ এহেন কর্ম না করলে তা প্রমাণ করা অসম্ভব প্রায়।

একজন কুমারী মেয়েকে অন্তঃসত্ত্বা দেখেই তাকে দণ্ড দেয়া যাবে না– যতক্ষণ না সে ব্যভিচার করার স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। অথবা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হচ্ছে। অন্যথায় সন্দেহের সুযোগ তাকে দিতে হবে ও হদ অকার্যকর থাকবে। আবার যে ব্যভিচার অপরাধীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সেসব ক্ষেত্রে অপরাধী তার স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিলেও যিনার হদ কার্যকর করা যাবে না।

ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণের জন্য সচ্চরিত্রবান চারজন বালিগ ও বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্যের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তারা যদি একযোগে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক বালিগ ও সুস্থ বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় দেখেছে তবেই কেবল ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণিত হয়। সাক্ষীগণের সাক্ষ্যে তথ্যের কোনোরূপ গড়মিল হলে হদ বা নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। তবে সেক্ষেত্রে তাযিরি শাস্তি প্রয়োগ করা যায়। আবার সাক্ষীদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে, উল্টো তাদেরকেই কাযাফের (ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ) দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রদণ্ড ভোগ করতে হবে। এ ছাড়া অবিবাহিত ব্যভিচারীদেরকে অপেক্ষাকৃত হালকা প্রকৃতির শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ্‌তে কথায় কথায় ব্যভিচারের কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না। এ শাস্তি প্রয়োগ করার পূর্বে যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতি মানুষকে অপরাধে লিপ্ত হতে প্রলুব্ধ করে ইসলাম সেগুলো দূর করার পদক্ষেপ নেয়। ব্যভিচারের শাস্তি

---

[১]মুরাদ হফম্যান, ইসলাম দি অলটারনেটিভ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯, পৃ. ৩১০।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সামাজিক সংস্কার ও মানুষের নৈতিক অবস্থার উন্নয়নের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ স. কখনো এই অপরাধের শাস্তি কার্যকর করেননি। ব্যভিচারে প্ররোচিত করার যেসব যৌন উত্তেজক উপাদান রয়েছে, যেমন অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, অশ্লীল গল্প-নাটক, উপন্যাস, নাচগান, সুড়সুড়ি সৃষ্টিকারী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে সমাজকে মুক্ত করা গেলে এবং যারা উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করতে চায় তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা গেলে, মোহরের পরিমাণ কমানো হলে, বাসস্থান ও আসবাবপত্র সহজলভ্য হলে এবং বিয়ের অনুষ্ঠান খরচ কমানো হলেই কেবল ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা যুক্তিসঙ্গত হয়।

দীন ইসলাম যৌন-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দাবিকে গুরুত্বের সাথে স্বীকার করে এবং জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বৈধ পন্থা তথা বিবাহের সহজ বিধান দেয়। তাই ইসলাম অবিলম্বে বিবাহের ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহিত করে।[১] মহানবী স. বলেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে সে যেনো বিবাহ করে।'[২]

১৯.৩. চুরির শাস্তি ও তা প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কল্যাণ

মানুষের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইসলামে চুরির শাস্তি নির্ধারিত। তবে ইসলামী পরিবেশ ছাড়া চুরির শাস্তিও কার্যকর করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেখানে চুরি প্রতিরোধকল্পে গৃহীত ইসলামী ব্যবস্থা কার্যকর নেই সেখানে চুরির শাস্তি কার্যকর করার যুক্তি নেই। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, আল কুরআনে চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিয়ে মাত্র একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য দিকে চুরি রোধকল্পে যাকাত ও ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্র নির্দেশ দিয়ে মিসকিনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে, অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে নিষেধ করে, কৃপণতা, সুদ, জুয়া ও যাবতীয় জুলুম নিষিদ্ধ করে সুবিচার ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়ে দশের অধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। কাজেই বেকারের কর্মসংস্থান না করে, ভুখাদের খাবারের ব্যবস্থা না করে চুরির শাস্তি বিধান করা সমীচীন নয়।[৩]

চুরির শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্ বহু কঠোর শর্ত আরোপ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো কিছু চুরি

---

[১]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৭।

[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মান লাম ইয়াস্তাতিল বায়াতা ফাল ইয়াসুম।

[৩]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

www.pathagar.com

করলেই চোরের হাত কাটা যাবে না। কেবলমাত্র যথার্থ মূল্যবান ও সুরক্ষিত বস্তুর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। কোনো মূল্যবান বস্তু অরক্ষিত অবস্থায় কেউ ফেলে রাখলে লোভ সংবরণ করতে না পেরে তা কেউ নিয়ে নিলে এটি চুরির আওতায় পড়বে না। চুরির শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ রকম অনেক কঠিন শর্ত রয়েছে। এসব শর্তের সবগুলো একযোগে সমাবেশ ঘটলেই কেবল চুরির শাস্তি হিসেবে হাতকাটার বিধান প্রযোজ্য হয়। কোনো একটি বা একাধিক শর্ত পূর্ণ না হলে হাতকাটার শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তাই রাসূলুল্লাহ্ স.-এর জীবদ্দশায় এবং খিলাফতে রাশেদার আমল পর্যন্ত মাত্র দুই বা তিনটি হাতকাটার শাস্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ঘটনাটি আদালতে পৌঁছার পূর্বে চোরকে ক্ষমা করার সুযোগ পায়।

চুরির শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে আরো কতগুলো বিষয় রয়েছে যা অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য। যেমন কোনো ব্যক্তি দারিদ্র্য, চরম বেকারত্ব বা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে চুরি করলে সেই ক্ষেত্রে কোনোরূপ শাস্তিই প্রযোজ্য হবে না। উমর ফারুক রা-এর খিলাফতকালে কয়েক যুবক ক্ষুৎপিপাসার শিকার হয়ে তাদের মালিকের উট চুরি করলে তিনি যুবকদের বেকসুর খালাস দেন এবং যুবকদের প্রয়োজনীয় পানাহারের ব্যবস্থা না করার অপরাধে উটটির মালিকের ওপর জরিমানা করেন।[১]

যেসব অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে মানুষ চুরি করে ইসলাম সেসবের সংশোধন করার চেষ্টা করে। ইসলাম সম্পদের ইনসাফপূর্ণ সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। কারো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে বা কেউ শ্রম বিনিয়োগে অক্ষম হলে বায়তুল মাল থেকে তার জন্য সাহায্য-সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এতসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি কেউ চুরি করে তবেই কেবল হাতকাটার শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব হলো ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তদের চাহিদা পূরণ করা। তারা এ দায়িত্ব পালন না করলে ক্ষুধার্তদের অধিকার আছে জোরপূর্বক ধনীদের সম্পদ নিয়ে নিজেদের ক্ষুধা নিবারণ করার। এ কারণে তাদের ওপর কোনো দণ্ড আরোপ করা যাবে না। আর ধনীরা দায়িত্ব পালন না করার কারণেই তাদেরকে বরং দণ্ডের আওতায় আনা যাবে। এ প্রসঙ্গে স্পেনের প্রখ্যাত ফকিহ ইবনে হাযম র. তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুহাল্লা'য় লিখেছেন : যদি কারো নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী থাকে, অপর দিকে

---

[১]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৯।

www.pathagar.com

কোনো লোক ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়, তাহলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য মৃত মানুষের কিংবা শূকরের গোশত ভক্ষণ করা জায়েয হবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির খাদ্যসামগ্রী থেকে প্রয়োজন মত জবরদখল করে ব্যবস্থা করা জায়েয হবে। বিত্তবান লোকটি মুসলমান কিংবা জিম্মি (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) যে কেউ হোক না কেন। এরূপ করা এ জন্য জায়েয হবে যে, বিত্তবান ব্যক্তিরই অবশ্যকর্তব্য ছিল ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া, কিন্তু সে তা দেয়নি। এরূপ পরিস্থিতিতে নিরূপায় অবস্থার অজুহাত দাঁড় করিয়ে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে শূকর কিংবা মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার বৈধতার ফতোয়া দেয়া যাবে না।

যাই হোক, এরূপ পরিস্থিতিতে অভাবীদের জন্য জায়েয হবে বিত্তবানদের সাথে সংগ্রাম করে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ জবর-দখল করে নেয়া। এই সংগ্রামে যদি বিত্তবানরা কোনো অভাবগ্রস্তকে মেরে ফেলে, তাহলে তাকে এজন্য 'কিসাস' বা প্রাণের বদলে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু কোনো বিত্তবান যদি মারা যায়, তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা, সে তার ওপর ফরযকৃত দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিত্তবান ব্যক্তির বিধান হবে 'বিদ্রোহী গোত্রের' বিধানের অনুরূপ আর এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'মুসলমানদের একপক্ষ যদি অপরপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাহলে বিদ্রোহী পক্ষ আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধ করে যাবে।' এ কথা সুস্পষ্ট যে, অধিকার লাভকারীর তুলনায় অধিকার দিতে অস্বীকারকারী বিদ্রোহী! এজন্যই আবু বকর রা. যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন।[১]

১৯.৪. ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননার শাস্তি প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কল্যাণ

দীন সংরক্ষণের জন্য ধর্মত্যাগ ও ধর্ম অবমাননার শাস্তি নির্ধারিত। এ শাস্তিবিধান না থাকলে ধর্মে ধর্মে হানাহানি, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

ইসলামে ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ—'ধর্ম সম্পর্কে জোরজবরদস্তি নেই।'[২]

---

[১] মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনুবাদ- মাওলানা আবদুল আউয়াল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

[২] আল কুরআন, ২ : ২৫৬।

www.pathagar.com

আরো বলা হয়েছে, فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ —'যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরি করুক।'[১] সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামী শরী'আহ্ কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বাধীন, প্রত্যেকেই চিন্তাভাবনার সুযোগ পায়। কিন্তু কেউ ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভের পর স্বেচ্ছাসম্মতিক্রমে ইসলাম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করলে তাকে অবশ্যই ধর্মত্যাগের শাস্তি ভোগ করতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে তাকে পুনর্বার চিন্তাভাবনাপূর্বক তাওবা করে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়।

কেউ চাপের মুখে অথবা পরিস্থিতির শিকার হয়ে ইসলাম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করলে সেক্ষেত্রে কোনোরূপ শাস্তি প্রযোজ্য হয় না। কোনো ব্যক্তি বারবার দীন ইসলাম গ্রহণ ও ত্যাগ করলে তার বেলায়ও ধর্মত্যাগের শাস্তি প্রযোজ্য হয় না, যতক্ষণ না তার ধর্মত্যাগ স্থায়ী হয়। কিন্তু কেউ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিম সমাজে ভাঙন এবং মুসলিমদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্মত্যাগ করলে তা ইসলামে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। দীন ইসলাম প্রথমেই সতর্ক করে দেয় যে, তার কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করা বা না করা যে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। এ ব্যাপারে দীন ইসলাম তার ওপর কোনোরূপ চাপ প্রয়োগ করবে না। কিন্তু কেউ এই কাঠামোর মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করলে বের হয়ে যেতে পারবে না, বের হয়ে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।[২]

ধর্মত্যাগের শাস্তবিধানের একটি যৌক্তিক কারণও রয়েছে। আর তা হলো, যারা ইসলাম গ্রহণ করার অভিনয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায় তাদের এই অপচেষ্টা থেকে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা। অর্থাৎ, কেউ যেন মুসলিম সেজে গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট থেকে তথ্যসংগ্রহ করে শত্রুদের নিকট ফাঁস করে দেয়ার সুযোগ না পায়। মানবরচিত আইনেও গুপ্তচরবৃত্তি ও দেশ বা জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর কঠোর শাস্তির বিধান অনুমোদিত রয়েছে। আল কুরআনে ধর্মত্যাগের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি দীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তারাই হবে সে লোক যাদের যাবতীয় আমল দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে।'[৩]

---

[১]আল কুরআন, ১৮ : ২৯।

[২]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯১।

[৩]আল কুরআন, ২ : ২১৭।

www.pathagar.com

'যারা ঈমান আনে আবার কুফুরির দিকে ফিরে যায়, আবার ঈমান আনে আবার কুফুরি করে, অতঃপর তাদের কুফুরি প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।'[১]

মুরতাদ বা ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদিসটি হলো : (مَنْ بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلُوْه) 'যে ধর্ম ত্যাগ করবে তাকে হত্যা করো।'[২]

শুধু ইসলাম ত্যাগ করে কেউ চলে গেলে এবং সে যদি ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো ক্ষতির কারণ না হয় তবে তাকে হত্যার ব্যাপারে অলেমগণের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। তাদের অনেকে বলেন, কেবল ধর্ম ত্যাগ করলেই মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানানো যায় না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা ও দুশমনি করা হলে এবং ইসলাম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বিদ্রোহ রোধের মতো জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলেই কেবল এ দণ্ড প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। কুরআনের অনেক আয়াতে স্পষ্টত এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা হয়েছে। এসব আয়াতে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'[৩]

ধর্মত্যাগের শাস্তিবিধানের আরো একটি হাদিস হলো, 'যে মুসলমান ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তার রক্তপাত নিষিদ্ধ, তিনটি কারণ ছাড়া, তাহলো : বিবাহিত ব্যভিচারী, হত্যাকারী ও নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় স্ব ধর্মত্যাগকারী।'[৪]

উক্ত হাদিস থেকে কেউ কেউ বলেন যে, ধর্মত্যাগী যদি তার সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে এবং বৈধ নেতৃত্বের প্রতি হুকমি হয়ে দাঁড়ায়, তবেই কেবল সে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।[৫]

বিশিষ্ট হাম্বলি ফকিহ্ ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. মুরতাদের শাস্তিসংক্রান্ত কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন এবং উক্ত হাদিসে উল্লেখিত শাস্তির বিধান সম্পর্কে বলেন, উল্লেখিত শাস্তি ধর্মত্যাগের (রিদ্দাহ্) জন্য নয়,

---

[১]আল কুরআন, ৪ : ১৩৭।

[২]সহিহ্ আল বুখারি, কিতাবু ইসতিতাবাতিল মু'আনিদিনা ওয়াল মুরতাদিন...,বাবু হুকমিল মুরতাদ...ও আবু দাউদ, কিতাবুল হুদুদ।।

[৩]মোহাম্মদ হাশিম কামালি, ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অনুবাদ : মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৯, পৃ. ১১৫। আরো দেখুন- আল সামারাই, আহকাম আল মুরতাদ ফি আল শারী'আহ্ আল ইসলামিয়া, পৃ. ১১৪।

[৪]সহিহ্ আল বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম, কিতাবুল কাসামাহ্ ওয়াল মুহারিবিন ওয়াল কিসাস ওয়াদদিয়াত, বাবু মা ইয়ুবাহু বিহি দামুল মুসলিম।

[৫]El-Awa, Punishment, p. 52; উদ্ধৃত : মাহাম্মদ হাশিম কামালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

www.pathagar.com

চরম বিশ্বাসঘাতকতার মতো অপরাধের জন্য।[1] তবে তিনি ধর্ম অবমাননার (blasphemy) অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে গালি দিলে এবং ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকাম নিয়ে অবমাননাকর কথা বললে তার বিরুদ্ধে ইসলামী শরী'আহ্র শাস্তিবিধান সম্পর্কে তিনি তাঁর 'আল সারিম আল মাসলুল আলা শাতিম আর-রাসূল' গ্রন্থে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[2]

মালিকি ফকিহ আল বাজি মত প্রকাশ করেন যে, ধর্মত্যাগ একটি পাপের কাজ; যার কোনো সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই এবং এ ধরনের পাপের শাস্তি কেবল স্বেচ্ছামূলক শাস্তি তা'যিরের অধীনে দণ্ডযোগ্য হতে পারে।[3]

প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ আল সারাখসি তাঁর 'আল-মাবসুত' গ্রন্থে লিখেছেন, শুধু ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ ইহলৌকিক শাস্তির যোগ্য নয়। তিনি আরো লিখেছেন, ধর্মত্যাগ এবং কুফুরির পথে ফিরে যাওয়া নিঃসন্দেহে বড় অপরাধ, তথাপি এটি হলো মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যকার বিষয়, তাই এর শাস্তি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেছে। পার্থিব জীবনে যেসব শাস্তি কার্যকর করা হয়, তা জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে, যেমন ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণ, যার লক্ষ্য হচ্ছে জীবন রক্ষা করা।[4]

---

[1]ইবনে তাইমিয়া র., আল-সারিম আল-মাসলুল, পৃ. ৫২। আরো দেখুন- মোহাম্মদ হাশিম কামালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

[2]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

[3]মোহাম্মদ হাশিম কামালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫। আরো দেখুন- আল শারানি, কিতাবুল মিযান, খ. ২, পৃ. ১৩৪।

[4]উদ্ধৃত : মোহাম্মদ হাশিম কামালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ্র কতিপয় উদ্দেশ্য

এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্য সাধন এবং মানুষের সুষ্ঠু, সুন্দর ও পরিমার্জিত জীবন পরিচালনার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উন্নততর জীবনদর্শন হিসেবে তাকে দেয়া হয়েছে ইসলামী শরী'আহ্। এ শরী'আহ্র রয়েছে কতগুলো মৌলিক ও চিরন্তন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। পাঁচটি জরুরি বিষয় সংরক্ষণ করা, মানবসমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সকল ধরনের ক্ষতি ও সংকীর্ণতা দূর করা, জীবনকে সহজ ও সুন্দর করা ইত্যাদি শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করত ইহকাল ও পরকালে তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। তাই বলা যায়, শরী'আহ্র উদ্দেশ্যই হলো–'বিশ্ব-মানবতাকে যথেচ্ছাচার, ভুলভ্রান্তি ও কামনা-লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরতার দিকে নিয়ে আসা, যেন পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু নিয়মে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করা যায়।'[১]

ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মুজতাহিদ, ইমাম ও ফকিহ্গণ কুরআন-সুন্নাহ্ গবেষণাপূর্বক শরী'আহ্র বহু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। ইমাম গাযালি র. ও তাঁর শিক্ষক ইমামুল হারামাইন আবু আল-মা'আলি আল-জুয়াইনি র. দীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ সংরক্ষণকে ইসলামী শরী'আহ্র ওয়াজিব পর্যায়ের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীতে ইমাম শাতিবি র. তাঁদের এই তালিকাকে সমর্থন করেছেন এবং এগুলোকে শরী'আহ্র মূলনীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের কল্যাণে যেসব বিষয়কে হিফাযত করতে হবে সেগুলো পাঁচটি : দীন, প্রাণ, বংশ, সম্পদ ও বুদ্ধি। এসব জিনিসের হিফাযত করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

উক্ত পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটিও ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনপ্রণালী ব্যাহত হতে বাধ্য। যেমন, জীবনসত্তায় ত্রুটি দেখা দিলে মানবঅস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হয়, দীন বা জীবনবিধান অপসৃত হলে অজ্ঞতা ও মূর্খতা সমাজকে গ্রাস করে ফেলে, সম্পদহারা হলে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ে, বংশহারা হলে সে কিছু দিন টিকে থাকলেও পরবর্তী প্রজন্ম পরিচয়হীন হয়ে যায় এবং আকল ধ্বংস হলে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যায়। তাই মহান আল্লাহ্ উক্ত পাঁচটি জিনিসের হিফাযত করার উদ্দেশ্যে শর'ঈ বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন।

---

[১]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, খায়রুন প্রকাশনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

www.pathagar.com

এম. উমর চাপড়া তাঁর 'The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari`ah' শীর্ষক রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম গাযালি ও শাতিবি র. সমর্থিত উক্ত পাঁচটি বিষয়ই শুধু শরী'আহ্র উদ্দেশ্য নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইসলামী শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞগণের চিন্তাধারা আরো অনেক উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাক্ষ্য দেয়। তবে উক্ত পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণকে মূল বা প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে, আর অন্যগুলোকে আনুষঙ্গিক বা অনুগামী (corollary) উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। আবার কখনো কখনো এসব আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যের গুরুত্বও অপরিসীম। সময়ের ব্যবধানে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তাই তিনি বলেন, সময় পরিবর্তিত হয়েছে এবং মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনে পরিবর্তন এসেছে। ফলে আমাদেরকে বর্তমানের আলোকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।[১]

প্রাচীন গ্রন্থাদি তালাশ করলে দেখা যায়, তখনকার সময়েও শরী'আহ্র উদ্দেশ্য শুধু উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সে সময় আরো বহু বিষয়কেই মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যেমন, শিহাব উদ্দিন আল-কারাফি মানুষের সম্মান রক্ষা করাকে (protection of honour) ইমাম গাযালি র.-এর বিদ্যমান উক্ত তালিকায় যোগ করেন। ইবনুল কাইয়্যিম র. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (establishing justice), সমাজকল্যাণ সংরক্ষণ (protection of social welfare) এবং অন্যায় ও অসামাজিক কার্যকলাপের নিষিদ্ধকরণকে (prohibition of injustice and unsocial activities) মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত করেন।

সম্ভবত ইমাম ইবনে তাইমিয়া র.-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র বিদ্যমান তালিকার সাথে বহু নতুন বিষয় যোগ করেন। তিনি চুক্তি সম্পূর্ণকরণ, আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণ, প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয় যেগুলো দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা, আন্তরিকতা, সততা, আত্মিক পরিশুদ্ধি ইত্যাদি যেগুলো আখিরাতের সাথে জড়িত এর সবই মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেন।[২]

আধুনিক ফকিহ্গণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা করেছেন। এসব উদ্দেশ্যের কতগুলো সৃষ্টিগত আবার কতগুলো

---

[১]এম. উমর চাপড়া, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari`ah, ২০০৭, পৃ. ৭।

[২]Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah* Made Simple, IAIS, Malaysia, p. 8.

www.pathagar.com

মানুষের জীবনের প্রয়োজন পূরণকারী ও সৌন্দর্যবর্ধনকারী। আবার কতগুলো মুখ্য ও অনুগামী, সাধারণ ও বিশেষ এবং চিরন্তন ও মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

রশিদ রিজা যেসব বিষয়কে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেন সেগুলো হলো : বিশ্বাসের স্তম্ভসমূহের পুনর্গঠন (reform of the pillars of faith), এই সচেতনার বিস্তার যে ইসলাম হলো বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক প্রবণতা, যুক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পরীক্ষা ও স্বাধীনতার ধর্ম এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।[১]

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত আত-তাহির ইবনে আশুর কুরআন-সুন্নাহ্ গবেষণা করে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ শনাক্ত করেছেন। তিনি শৃঙ্খলা (orderliness), সাম্য (equality), স্বাধীনতা (freedom) ও ফিতরাত বা খাঁটি স্বভাবধর্মের সংরক্ষণকে (preservation pure natural disposition) মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[২]

ড. ইউসুফ আল কারযাভি মানুষের বিশ্বাসের সংরক্ষণ, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা (maintaining human dignity and rights), ইবাদতের প্রতি আহ্বান (calling people to worship), নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ (restoring moral values), ভালো পরিবার গঠন (building good families), নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার (treating women fairly), শক্তিশালী ইসলামী জাতি গঠন (building a strong Islamic nation), সহযোগিতাপূর্ণ বিশ্বগঠন (cooperative world) ইত্যাদিকে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩]

ইমাম গাযালি র. ও তাঁর শিক্ষক আল জুওয়াইনি র. কর্তৃক চিহ্নিত দীন, প্রাণ, জ্ঞান, বংশ ও সম্পদ সংরক্ষণ করাকে অধিকাংশ ফকিহ্ শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করলেও তাঁরা কেউ-ই গাযালির পরম্পরা (sequence) অনুসরণ প্রয়োজনীয় মনে করেননি। এমনকি শাতিবি র.-ও সবসময় তা অনুসরণ করেননি। অবশ্য পরম্পরা সাজানোর বিষয়টি নির্ভর করে আলোচনার ধরন ও প্রকৃতির ওপর। ইমাম গাযালি র.-এর এক শতাব্দী পর প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ফখরুদ্দিন আল-রাজি র. জীবন (নফস) সংরক্ষণকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলির প্রথমে স্থান দেন।[৪] তাঁর বিন্যাসটি ছিল প্রাণ, সম্পদ, বংশ, দীন ও জ্ঞান।[১]

---

[১]Al-Juwayny, al-burhan, vol.2, p. 621, 22, 747; Jasser Auda, Ibid, p. 6.

[২]Jasser Auda, Ibid, Ibid, p. 6.

[৩]Ibid, p. 6-7.

[৪]এম. উমর চাপড়া, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari`ah, ২০০৭, পৃ. ৮।

www.pathagar.com

জীবন (النَّفْسُ) বা প্রাণসত্তাকে ইসলামী শরী'আহ্র প্রথম উদ্দেশ্য হিসেবে দেখালে যে চিত্র দাঁড়ায় তা হলো :

চিত্র-২

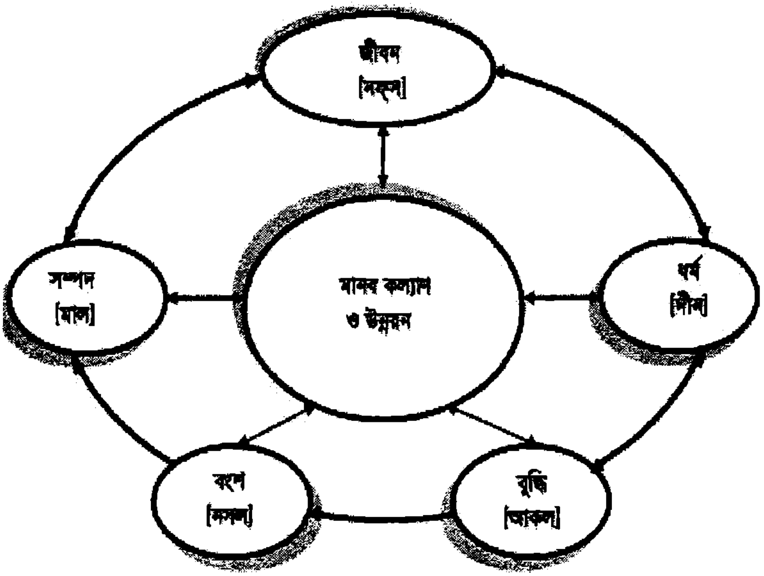

১. হিফয আন্-নফস (حِفْظُ النَّفْسِ) বা জীবন সংরক্ষণ

হিফয আন্-নফস বা জীবন সংরক্ষণ বলতে সম্মানিত ও মর্যাদাবান মানুষের জীবন রক্ষাকে বুঝানো হয়। মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ক্ষেত্রে ইমাম গাযালি র. 'আল-হিফয' (اَلْحِفْظُ) শব্দটি ব্যবহার করেন কিন্তু তাঁর শিক্ষক আল জুয়াইনি র. 'আল-ইসমা' (اَلْعِصْمَةُ) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবি উভয় শব্দের অর্থ হলো, রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা, যত্ন নেয়া, তত্ত্বাবধান করা, হিফাযত করা ইত্যাদি। এ দুটি শব্দের সমার্থক ইংরেজি হলো, safeguard, protection, preservation ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের বিকাশ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'আল-হিফয' ও 'আল-ইসমা' শব্দ দুটি ব্যাপক ও বিস্তৃত ধারণা প্রকাশ করে।

জীবনসত্তার হিফাযত বা নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণ দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত, জীবনের জন্য ক্ষতিকর সকল কিছু থেকে জীবনকে রক্ষা করা। এটিকে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা (protective activity) বলা হয়। দ্বিতীয়ত, সমাজে

---

[1]ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল 'আতি মুহাম্মদ 'আলী, আল মাকাসিদুশ্ শারী'আহ্ ওয়া আসারুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৭, পৃ. ১৬৪।

www.pathagar.com

বসবাসকারী মানুষের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তদের স্বাভাবিক বিকাশধারা সমুন্নত রাখা। এটিকে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা (supportive activity) বলা হয়।

নফস বা জীবন রক্ষার প্রথম দাবি হলো, মানুষকে হত্যা না করা এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন বা জখমসহ সকল প্রকার সীমালঙ্ঘন থেকে তাকে রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, মানুষকে অপবাদ দেয়া, গালমন্দ করা ও তার মর্যাদার জন্য হানিকর এমন সব ধরনের সীমালঙ্ঘন থেকে তাকে রক্ষা করা। তৃতীয়ত, মানুষের কর্ম, চিন্তা, অভিমত ও বসবাসের স্বাধীনতা রক্ষা করা। চতুর্থত, মানুষের জীবনধারা বিকাশের সুব্যবস্থা করা।

প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির অস্তিত্ব, বিকাশ ও সম্মান রক্ষার যাবতীয় বিষয় হিফয আন-নফসের মধ্যে শামিল রয়েছে। আরো সংক্ষেপে বলা যায়, জীবন সংরক্ষণ হলো সমাজে বসবাসকারী বিচিত্র স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানুষের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও বিকাশধারা সমুন্নতকরণের মাধ্যমে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা, যাতে তাদের জীবনধারায় কোনোরূপ হুমকি, ভীতি ও ক্ষতির পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়।

১.১. ইসলামে জীবন দৃষ্টি

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন তথা মানবদেহ মহান আল্লাহ্র এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আমরা শুধু দেহকে মানুষ বলি না আবার শুধু রুহ বা আত্মাকেও মানুষ বলি না। বরং মানুষ হলো দেহ ও আত্মার এক অপূর্ব সমন্বয়। এ দুটির একটির অস্তিত্ব ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব বাস্তবে অসম্ভব। এ দুটির মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্য অপরিহার্য।

প্রকৃতপক্ষে 'মানবদেহ স্রষ্টার এক মহামূল্য সৃষ্টি এবং মানবজাতির জন্য অতিশয় নিয়ামত। এটি মানুষের কাছে আমানত রাখা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এর সংরক্ষণ ও সুস্থতা বিধান এবং যাবতীয় অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। পক্ষান্তরে এর কোনো ক্ষতি, এর প্রতি একবিন্দু উপেক্ষা প্রদর্শন এবং এর অধিকারসমূহ আদায় না করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'[১]

১.২. মানবজীবনের পবিত্রতা ও মর্যাদা

মানবসভ্যতার ভিত্তি যেসব ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রথম ধারা হলো প্রত্যেক মানুষের প্রাণ ও রক্ত পরম পবিত্র ও সম্মানার্হ। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের যত অধিকার রয়েছে তার মধ্যে প্রধান অধিকার হলো বেঁচে থাকার

---

[১]মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, খায়রুন প্রকাশনি, ২০১২, পৃ. ৭৭-৭৮।

www.pathagar.com

অধিকার, আর যত কর্তব্য রয়েছে তার মধ্যে প্রধান কর্তব্য হলো অপরকে বাঁচতে দেয়া। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই, এমন কোনো সভ্য আইন নেই যেখানে মানুষের জীবনকে সবার ওপরে স্থান দেয়া হয়নি। যে ধর্ম ও আইনে মানুষের জীবনকে নিরাপদ করার বিধান নিশ্চিত করা হয়নি সেটাকে ধর্ম ও আইন বলা যায় না। কারণ, ধর্ম ও আইনের মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের জীবনকে নিরাপদ, সহজ ও সুখময় করে তোলা।

মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে একত্রে বসবাস করতে হয়। সমাজে একজনের কাছে যদি অন্যের জীবন নিরাপদ না হয় কিংবা সেখানে পশুদের মতো সবসময় চলে রক্তপাত, তাহলে সমাজ চলতে পারে না, সভ্যতা এগুতে পারে না।

মানবীয় আইনসমূহে শক্তি কিংবা শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানবজীবনের পবিত্রতা, নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইসলাম শুধু আইনের জোরে নয় বরং এমন একটি মূল্যবোধ গড়ে তোলে যেখানে একে অপরের জীবনরক্ষা ও তা নিরাপদ করার প্রচেষ্টাকে পরম ইবাদত বলেই মনে করে। আল কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় মানুষের জীবনের পবিত্রতা ও নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আজকের সভ্য দুনিয়ায় মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদাবোধ যতটা গুরুত্ব লাভ করেছে তার মূলে রয়েছে ইসলামের অবদান। ইসলাম যে জাহিলি চিন্তাধারার মানুষের কাছে এসেছিল তাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য ছিল না। জাহিলি সমাজের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও হিংস্রতার ইতিহাস সকলের জানা। সে সময় আরব ছাড়া আরো যেসব দেশ, সমাজ ও সভ্যতাকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও কৃষ্টির পাদপীঠ হিসেবে বিবেচনা করা হতো সেখানেও মানুষের জীবনকে ততটা মূল্যবান ও পবিত্র মনে করা হতো না।

মানবসভ্যতার ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যায় মানবতার করুণ চিত্র, সম্রাট, রাজা-বাদশাহ্ ও শাসকদের ইচ্ছার শিকার অসহায় মানুষের আর্ত-চিৎকার। এইতো রোমের শাসকদের কাহিনী আজো ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। তারা দাসদেরকে মানুষ বলে বিবেচনা করত না। তাদের কাছে দাসরা ছিল নিছক পণ্যসামগ্রী মাত্র।

প্রাচীন রোমে প্রভুদের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনের জন্য কিছু সংখ্যক দাসের হাতে তরবারি ও বল্লম দিয়ে জোর করে একটি আসরে ঢুকিয়ে দেয়া হতো। এর চারদিকে তাদের প্রভুরা, অনেক সময় সাম্রাজ্যের শাহানশাহ্গণও উপস্থিত থাকতেন। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে দাসদেরকে হুকুম দেয়া হতো প্রত্যেকেই যেন তরবারি দিয়ে অন্যকে ক্ষতবিক্ষত ও টুকরো টুকরো করে ফেলে। তখন শুরু হয়ে

www.pathagar.com

যেত তাদের পারস্পরিক মরণপণ যুদ্ধ। এমনি করে যখন যুদ্ধ শেষ হতো তখন দেখা যেত, হয়তো দু'একজন কোনো রকমে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বেঁচে আছে। আর অন্যদের দেহ শত-সহস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে সমস্ত আসরে ছড়িয়ে আছে। জীবিত দাসদেরকে তারা বিজয়ী ঘোষণা করত এবং বিকট অট্টহাসি ও মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানানো হতো।[১]

একসময় এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশেই মানবতার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কয়েদি ও দাসদের বিভিন্ন উপায়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। শুধু অজ্ঞ ও হিংস্র স্বভাবের রাজা-বাদশাহ্ই নয়, গ্রিস ও রোমের বড় বড় পণ্ডিত, মনীষী ও দার্শনিক পর্যন্ত বিনা অপরাধে নরহত্যার কতিপয় অমানুষিক পন্থা সমর্থন করতেন এবং তা বৈধ মনে করতেন।

অন্য দিকে এক শ্রেণির পণ্ডিত আত্মহত্যাকে খারাপ কাজ বলে বিবেচনা করত না। তারা এ মতবাদকে এতোই সম্মানজনক হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল যে, বড় বড় জনসমাবেশ আহ্বান করে সেখানেই লোকেরা আত্মহত্যা করত। এমনকি প্লেটোর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও একে পাপ মনে করতেন না। হিন্দুধর্মে শূদ্রের প্রাণের কোনো মূল্য ছিল না।... বেদের শব্দ শোনা তার জন্য এত বড় পাপ ছিল যে, তার কানে গলানো সীসা ঢেলে তাকে হত্যা করা শুধু বৈধই ছিল না, বরং জরুরিও ছিল। 'বিসর্জন' প্রথা অনুসারে পিতামাতা তাদের প্রথম সন্তানকে গঙ্গানদীতে ভাসিয়ে দিত এবং একে নিজেদের জন্য মহাপুণ্যের কাজ মনে করত।[২] অথচ এরকম অন্ধকার যুগে এসেও ইসলাম মানবজাতিকে আহ্বান জানাল মানবহত্যা থেকে দূরে থাকার জন্য এবং প্রতিষ্ঠা করল তাদের জীবনের পবিত্রতা ও মর্যাদা।

১.৩. ইসলামে জীবনরক্ষার নিশ্চয়তা

মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো তার জীবন। আর ইসলাম সর্বাগ্রে মানুষের জীবন সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-জাতিগত পার্থক্য বিবেচনা না করে, সকলের জীবনকে সমান করে দেখা হয়। শুধু মুসলিম নয়; বরং ইসলাম সমগ্র মানবজাতির নিরাপত্তা বিধানের কথা বলে। এমনকি পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের নিরাপত্তার কথাও সেখানে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। ইসলাম অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণীকে হত্যা করা বা কষ্ট দেয়া সমর্থন করে না।

---

[১]মুহাম্মদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৬৮।
[২]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র., আল-জিহাদ, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ২৭-২৮।

www.pathagar.com

১.৪. মানুষের জীবনরক্ষা ও বিকাশে শরী'আহ্‌র বিধান

মানুষের জীবনের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে ইসলামে রয়েছে বহু বিধিবিধান ও কৌশল। এসব কৌশল দু'ধরনের। মানুষকে হত্যা না করে তার জীবনকে সকল ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে সুরক্ষার কৌশল এবং জীবনকে পূর্ণরূপে বিকশিত করার মাধ্যমে তার সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করার কৌশল। মানুষের জীবন সুরক্ষার জন্য গৃহীত কৌশলের মধ্যে রয়েছে :

ক. মানুষের জীবনের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ অবৈধ।
খ. হত্যাকাণ্ডের প্রতি প্রলুব্ধকারী সকল পন্থা-পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণ হারাম।
গ. হত্যাকাণ্ড রোধে কিসাস বা হত্যার শাস্তি নির্ধারণ।
ঘ. হত্যাকাণ্ড অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলেই কেবল হত্যাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করা, যাতে নিরপরাধ কোনো ব্যক্তি শাস্তি না পায়।
ঙ. আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দিতে আক্রমণকারীকে বাধ্য করা।
চ. কিসাসের শাস্তি ক্ষমা করার বিধান।
ছ. জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণের অনুমতি।

১.৫. ইসলামে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ

ইসলাম মানবজীবনকে অত্যধিক মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে সুরক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামে অন্যায়ভাবে একজন মানুষের জীবনসংহারকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার শামিল গণ্য করে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا —'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করল সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল আর যে কারো জীবন রক্ষা করল, সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল।'[১]

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ—'আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।'[২]

মানুষের জীবনরক্ষার জন্য মহান আল্লাহ্‌র উক্ত নির্দেশনার পর নবী করিম স.-এর বাণীসমূহ লক্ষণীয়। তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে।'[১]

---

[১]আল কুরআন, ৫ : ৩২।
[২]আল কুরআন, ১৭ : ৩৩।

www.pathagar.com

বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ স. ঘোষণা করেছেন : 'হে লোকসকল! আজ তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর ওপর হস্তক্ষেপ তোমাদের জন্য হারাম করা হলো। তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, তেমনিভাবে উক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পরের হন্তা হয়ে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যেও না যেন।'[২]

বিদায় হজ্বের দিন রাসূলুল্লাহ্ স. শুধু উক্ত বক্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং এ নসিহতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন নিজেই। তিনি বললেন, 'জাহিলি যুগের যাবতীয় হত্যা রহিত করা হলো। প্রথম যে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ আমি রহিত করলাম তা হচ্ছে আমার বংশের রবিআ ইবনুল হারিস-এর দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ, যাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।[৩]

১.৬. আত্মহত্যা নিষিদ্ধ

ইসলামে শুধু মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাই নিষিদ্ধ করা হয়নি; বরং নিজের জীবন ধ্বংস করাকেও হারাম করা হয়েছে। আত্মহত্যার সকল পথ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ্তে আত্মহত্যাকে কবিরাহ্ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ—'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।'[৪] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো জিনিস দ্বারা নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন ঐ জিনিস দ্বারা তাকে শাস্তি দেয়া হবে।'[৫]

১.৭. মায়ের গর্ভে সন্তান ও পরিত্যক্ত শিশুর নিরাপত্তা

মানবীয় আইনে সাধারণত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তার অধিকার সুরক্ষিত হয়, কিন্তু ইসলামে মাতৃগর্ভে সন্তানের অস্তিত্ব আসার পর থেকেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী আইনে সন্তান গর্ভে ধারণের ১২০ দিনের

---

[১]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাসামাহ ওয়াল মুহারিবিন ওয়াল কিসাস ওয়াদদিয়াত, বাবুল মুজাযাতি বিদ্দিমায়ি ফিল আখিরাহ্...।

[২]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু সিফাতি হাজ্জাতিন নাবী স., সহিহ আল বুখারি, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ।

[৩]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু সিফাতি হাজ্জাতিন নাবী স., সহিহ আল বুখারি, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ।

[৪]আল কুরআন, ৪ : ২৯।

[৫]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহরিমি কাতলিল ইনসানি নাফসাহু...।

www.pathagar.com

মাথায় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য করা হয়।[১] এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ স. ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দেয়া সত্ত্বেও এক গর্ভবতী মহিলার শাস্তির নির্দেশ স্থগিত রেখেছিলেন। সন্তান প্রসব ও দুধপানের সময়সীমা অতিক্রমের পর তার শাস্তি কার্যকর হয়েছিল।

ইসলামে পরিত্যক্ত শিশুর জীবন রক্ষা করাকেও সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাযম র. বলেন, কেউ যদি রাস্তায় কোনো পরিত্যক্ত শিশু দেখতে পায় তবে তাকে তুলে নেয়া তার জন্য অবশ্যকর্তব্য এবং একটি বড় পুণ্যের কাজ। এ প্রসঙ্গে তিনি আল কুরআনের নির্দেশনা وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا—(আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করল)[২]—তুলে ধরে বলেন, যদি তাকে তুলে নেয়া না হয় এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় শিশুটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ঐ ব্যক্তি চরম গোনাহ্গার হবে। কেননা, সে একটি নিষ্পাপ শিশুকে অনাহারে, অতি ঠান্ডায় বা প্রচণ্ড গরমে মরে যেতে অথবা হিংস্র প্রাণী কর্তৃক জীবননাশের সুযোগ করে দিয়েছে। এজন্য সে নিঃসন্দেহে ইচ্ছাকৃতভাবে মানব হত্যাকারী হিসেবে গণ্য হবে।[৩]

১.৮. মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা নিষিদ্ধ

জাহিলি সমাজে মানবাধিকারের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সে সময় শত্রুকে দৈহিক ও মানসিক শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত হীন, ঘৃণ ও পৈশাচিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। এমনকি মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করা হতো না। আরব ইতিহাসের এসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে, ইয়ামানের বাদশাহ্ জুনওয়াছ তার রাজ্যের যেসব মানুষ ধর্মত্যাগ করেছিল তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল।

আমর ইবনে মুনজের নামের এক ব্যক্তি মানত করেছিল যে, বনু দারেম গোত্রের অন্তত একশ' ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে। পরে সত্যি সত্যি সে তাদের ৯৯ ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে মারে। তার মানত পূর্ণ হতে তখনো একজন বাকি ছিল। ঘটনাক্রমে একব্যক্তি ঐ জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল। সে গোশতের ঘ্রাণ পেয়ে ভাবলো, খাবারের আয়োজন করা হচ্ছে। তাই সে আমরের বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল। আমর তার মান্নত পূর্ণ করার জন্য ঐ ব্যক্তিকেও আগুনে ফেলে হত্যা করল।[৪]

---

[১]ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

[২]আল কুরআন, ৫ : ৩২।

[৩]আল্লামা ইবনে হাযম র., আল-মুহাল্লা, খ. ৯, পৃ. ১৬২-৬।

[৪]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল-জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

www.pathagar.com

ইসলাম এই অমানবিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছিল। মানুষের জীবনরক্ষায় সকল মানবতাবাদীকে অনুপ্রাণিত করার মতো রাসূলুল্লাহ্ স.-এর একটি অমর বাণী হলো, 'আগুনে পোড়ানোর শাস্তি কেবল আগুনের স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।'[১]

১.৯. জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ইসলামে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানুষকে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হয়েছে। মৃত্যুর পর তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, দু'আ করা, তাড়াতাড়ি কবরস্থ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তার মৃতদেহ অপমানের শিকার না হয়।

জাহিলি সমাজের মানুষেরা শত্রুর লাশের ওপর প্রতিশোধ নিতেও দ্বিধাবোধ করতো না। তারা লাশের নাক-কান কেটে দিত, চোখ তুলে ফেলত। এমনকি সে সময় লাশের সাথে এমন পাশবিক ও লোমহর্ষক আচরণ করা হতো যা কল্পনা করাও কঠিন। ওহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নারীরা মুসলিম শহিদদের কান কেটে মালা বানিয়ে গলায় পরেছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর চাচা শহিদ হামযা রা.-এর কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল।

আসেম ইবনে ছাবিত রা.-এর হাতে মুছাফে ইবনে তালহা ও জাল্লাছ ইবনে তালহা নামের দুই ভাই ওহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তাদের মা ছালাফা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তার সন্তানের হত্যাকারী আসেম রা.-এর মাথার খুলিতে মদ খাবে। পরে রজি নামক স্থানে আসেম রা. শহিদ হলে কুরাইশরা তাঁর লাশের সন্ধানে নেমে পড়ে। উদ্দেশ্য ছিল ছালাফার নিকট তাঁর খুলি বিক্রি করা।[২]

ইসলামে লাশের অবমাননা করা ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হাদিসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ্ স. লুটের মাল গ্রহণ এবং লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন।[৩] এমনকি তিনি মৃতদেহের হাড় ভাঙতেও নিষেধ করেছেন। একদিন একটি কবর খননের সময় কিছু হাড় পাওয়া গেলে খননকারী তা ভাঙতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'এগুলো ভেঙে ফেলো না, মৃত অবস্থায় তা ভাঙা জীবিত অবস্থায় ভাঙার অনুরূপ।'[৪]

---

[১]সহিহ আল বুখারি।

[২]তাবাকাতে ইবনে সাদ, ফাতহুলবারি; উসুদুল গাবাহ; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র., আল-জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

[৩]সহিহ আল বুখারি।

[৪]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, বাবু ফিল হাফফার...।

www.pathagar.com

১.১০. হত্যা রোধে শাস্তি-বিধান

মানুষের জীবন রক্ষার জন্যই ইসলামে জীবন সংহারের শাস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইহকালে যেমন কিসাসের শাস্তি ভোগ করতে হয়, তেমনি তাকে পরকালেও ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি ও যন্ত্রণা। মহান আল্লাহ্ বলেন : 'এবং কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার প্রতি আল্লাহ্র গযব ও অভিসম্পাত এবং তিনি তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।'[১]

ইসলামী আইনে 'কতল বিল হাক্ক' বা সঙ্গত কারণে হত্যা কয়েকটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

ক. ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধীকে তার অপরাধের শাস্তি হিসেবে হত্যা করা, যাকে কিসাস বলা হয়ে থাকে।

খ. জিহাদের ময়দানে সত্যের বিরুদ্ধশক্তি, যারা মুসলমানদেরকে হত্যার জন্য উদ্যত হয় তাদেরকে হত্যা করা।

গ. ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা।

ঘ. বিবাহিত নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের অপরাধে হত্যা।

ঙ. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ধর্মত্যাগীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে হত্যা।

১.১১. জীবন বাঁচানোর জন্য ঈমান গোপন করা ও মৃত জন্তু খাওয়া যাবে

মানুষের জীবন এতোই মূল্যবান যে, কখনো জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দিলে কিংবা চরম নির্যাতনের শিকার হলে ঈমান গোপন করা এবং মৃত জন্তু ভক্ষণ করে জীবন বাঁচানো যাবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহ্র সাথে কুফুরি করলে এবং কুফুরির জন্য তার হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্য নয় যাকে কুফুরির জন্য বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপর অবিচল।'[২] আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যার ওপর আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ নাফরমান বা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৩]

---

[১] আল কুরআন, ৪ : ৯৩।

[২] আল কুরআন, ১৬ : ১০৬।

[৩] আল কুরআন, ২ :১৭৩।

www.pathagar.com

১.১২. যুদ্ধনীতিতে সংস্কার সাধন

যুদ্ধনীতিতে ইসলাম ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছে। সেখানে ঢালাওভাবে মানুষ হত্যার অনুমতি দেয়া হয়নি। সশস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণে রাসূলুল্লাহ্ স. যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন সেখানে বলা হয়েছে[১], আল্লাহ্র নাম নিয়ে, রাসূলুল্লাহ্র আদর্শ ধারণ করে যাত্রা করো, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করো না, ছোট শিশুকে হত্যা করো না, কোনো মহিলাকে হত্যা করো না, মানুষকে শৃঙ্খল বদ্ধ করো না, গাদ্দারি করো না, লাশ বিকৃত করো না, মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না, অন্ধদের হত্যা করো না, ঘর-বাড়ি ধ্বংস করো না, উপাসনালয়ে মানুষকে হত্যা করো না, গাছপালা কেটে ফেলো না, কয়েদিদের প্রতি সদয় হও ইত্যাদি।

১.১৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্

মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মহান আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তার আত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি প্রয়োজন। কেননা, যোগ্য ও সবল ও এবং অযোগ্য ও দুর্বল সমান ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র দাবি হলো মানুষের সার্বিক উন্নতি ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাকে যোগ্য ও সবল করে তোলা। মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বের বিষয়টি অনুধাবন করা যায় রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী থেকে। তিনি বলেছেন, 'শক্তিমান ঈমানদার আল্লাহ্র নিকট দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে অধিক উত্তম ও প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে, যাতে তোমার উপকার রয়েছে তা অর্জনে তুমি আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য কামনা করো। তুমি অক্ষম হয়ো না।'[২]

মানুষ হলো উন্নয়নের চূড়ান্ত ও প্রধান মাধ্যম এবং তারাই হলো সমৃদ্ধির স্থপতি (architect)। মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ— 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।'[৩]

---

[১]মাওলানা মাহমুদুল হাসান, সন্ত্রাস নয়, ইসলাম শান্তির ধর্ম, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন অ্যান্ড সুন্নাহ্, চট্টগ্রাম।

[২]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ক্বদর, বাবু ফিল আমরি বিল কুওয়াতি ওয়া তারকিল আজ্জযি...।

[৩]আল কুরআন, ১৩ : ১১।

www.pathagar.com

মানুষের ভালো কাজ যেমন পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলার মূল কারণ, তেমনি তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যাবলিই মূলত পৃথিবীতে নানা অশান্তি ডেকে আনে। যেমন, আল কুরআনে বলা হয়েছে, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ —'মানুষের কৃতকর্মের ফলে স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে।'[১]

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণ অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হলো মানবসম্পদ। ইসলাম মানুষের পেশাগত দক্ষতা ও সততা সৃষ্টি করে তাকে সম্পদে পরিণত করতে চায়। ইসলামে একজন ব্যক্তির কাজকে ইবাদত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং সে কাজ সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করাকে ফরয হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এম. উমর চাপড়া ইসলামী শরী'আহ্‌র একটি মূল উদ্দেশ্য হিফয আন্-নফস বা জীবন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানবকল্যাণ সাধন ও উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনকে পূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্য ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari`ah, শীর্ষক রচনায়।[২]

এম. উমর চাপড়া নির্দেশিত বিষয়গুলো হলো :

১. মর্যাদা (dignity), আত্মসম্মান, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য
২. আদল (justice) বা ন্যায়বিচার
৩. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি (spiritual and moral uplift)
৪. জানমালের নিরাপত্তা (security of life and property)
৫. স্বাধীনতা (freedom)
৬. শিক্ষা (education)
৭. সুশাসন (good governance)
৮. চাহিদা পূরণ (need fulfilment)
৯. কর্ম-সংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান
১০. আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন
১১. বিবাহ ও সন্তান পালন
১২. পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি
১৩. অপরাধ ও দুর্নীতি রোধ
১৪. মানসিক প্রশান্তি ও সুখ।

---

[১]আল কুরআন, ৩০ : ৪১।
[২]এম. উমর চাপড়া, প্রাগুক্ত পৃ. ৯।

www.pathagar.com

চিত্র-৩

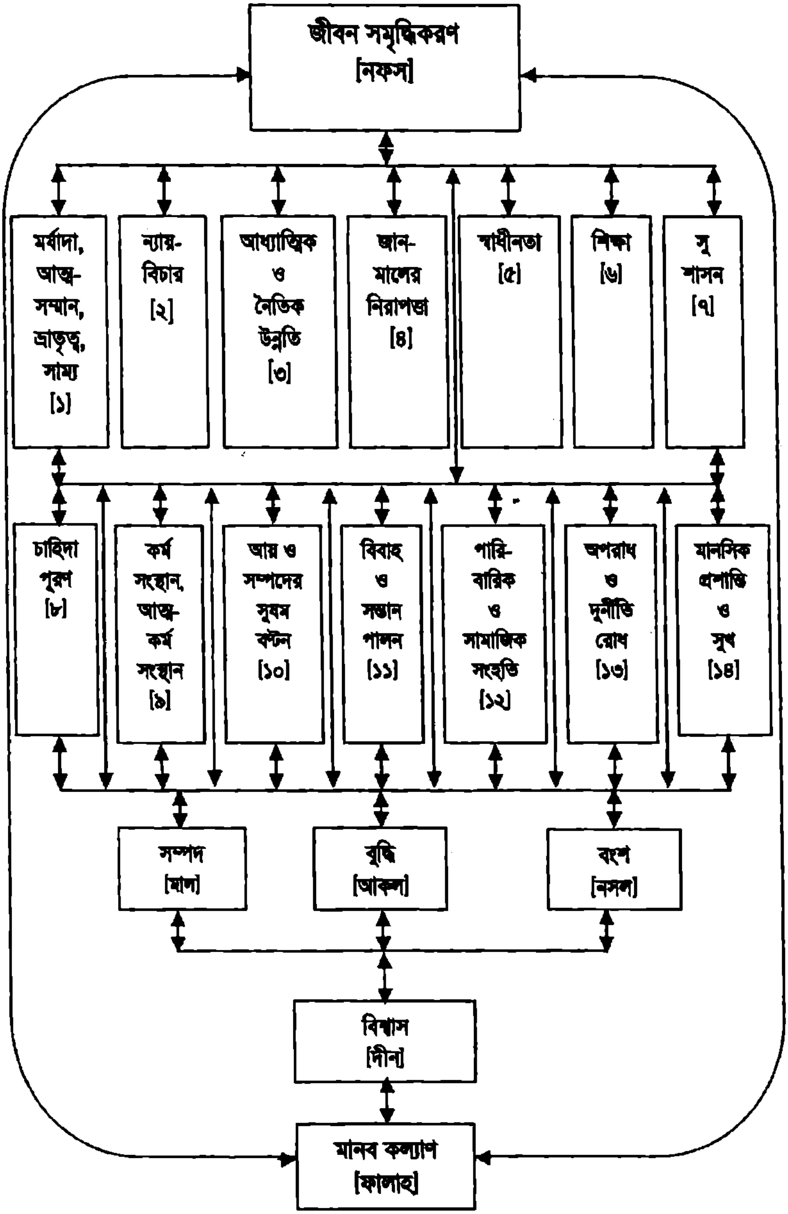
জীবন সমৃদ্ধিকরণ [নফস]
মর্যাদা, আত্ম-সম্মান, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য [১]
ন্যায়-বিচার [২]
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি [৩]
জান-মালের নিরাপত্তা [৪]
স্বাধীনতা [৫]
শিক্ষা [৬]
সু শাসন [৭]
চাহিদা পূরণ [৮]
কর্ম সংস্থান, আত্ম-কর্ম সংস্থান [৯]
আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন [১০]
বিবাহ ও সন্তান পালন [১১]
পারি-বারিক ও সামাজিক সংহতি [১২]
অপরাধ ও দুর্নীতি রোধ [১৩]
মানসিক প্রশান্তি ও সুখ [১৪]
সম্পদ [মাল]
বুদ্ধি [আকল]
বংশ [নসল]
বিশ্বাস [দীন]
মানব কল্যাণ [ফালাহ]

উক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও মানবচরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে জবাবদিহির বিষয়টি ইসলামী শরী'আহ্তে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলামে মানুষ শুধু নিজের কাছে, পরিবার ও রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করে না, বরং তাকে আল্লাহ্র কাছেও জবাবদিহি করতে হয়। দ্বৈত জবাবদিহির এই অনুভূতি মানুষকে যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক ও সামাজিক আচরণ করতে প্রভাবিত করে। এ ছাড়া ইসলামে বিশ্বাসী (Islamic Man) একজন মানুষ হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণ সর্বাধিককারী (Economic and Social Maximiser) উপাদান। আর এই বিশ্বাসী মানুষ গঠনে শরী'আহ্র ভূমিকা অগ্রগণ্য।

১.১৪. অমুসলিমদের জীবনের নিরাপত্তা

ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু মুসলমানদের জীবন নয়, বরং সকল মানুষের জীবনই মহান আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত। আল কুরআনে মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুমে সকল মানুষকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য করা হয়নি। হাদিসে বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন :

'যে ব্যক্তি কোনো বিধর্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।'[১]

'যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিমকে হত্যা করল সে কখনো জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।'[২]

'যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো অমুসলিম নাগরিককে কোনোরূপ কষ্ট দেবে, আমি নিজেই তার বিপক্ষে দাঁড়াব, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।'[৩]

রাসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন, 'সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো জিম্মির ওপর জুলুম করল অথবা তার অধিকার খর্ব করল অথবা সামর্থ্যের অধিক কাজ করতে তাকে বাধ্য করল অথবা স্বেচ্ছাসম্মতি ব্যতীত তার থেকে কিছু গ্রহণ করল, আমি কিয়ামতের দিন ঐ জিম্মির পক্ষে ফরিয়াদি হবো।'[৪]

একবার যুদ্ধকালে মুশরিকদের কতিপয় শিশু নিহত হয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ স. অত্যন্ত মর্মাহত হন। কোনো কোনো সাহাবি বললেন, এরা তো মুশরিকদের সন্তান। তিনি বললেন, 'মুশরিক শিশুরাও তোমাদের চেয়ে উত্তম। সাবধান!

---

[১]সুনান নাসাঈ।

[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুত দিয়াত, বাবু ইসমি মান কাতালা জিম্মিয়ান বিগাইরি জুরমিন।

[৩]আল জামেউস সগির লিসসুয়ুতি, খ. ২, পৃ. ৪৭৩।

[৪]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারাহ, বাবু ফি তা'শীরে আহলিয-জিম্মা...।

www.pathagar.com

শিশুদের হত্যা করো না। সাবধান! শিশুদের হত্যা করো না। প্রতিটি জীবনই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফিতরাতে (সৎস্বভাব নিয়ে) জন্মগ্রহণ করে।'[১]

নবী করিম স.-এর সময় একবার একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল, কিন্তু হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নবী করিম স. এ কারণে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : 'হে লোকসকল! ব্যাপার কি, আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকতেও মানুষ নিহত হচ্ছে এবং হত্যাকারীর পরিচয় মিলছে না! একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য আসমান-জমিনের সমগ্র সৃষ্টিও যদি একত্র হয়ে যায় তবু আল্লাহ্ এদের সকলকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।'[২]

একজন মুসলিম শুধু নিজের তরফ থেকেই অমুসলিমের জীবনের নিরাপত্তা দেয় না; বরং তাদেরকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষারও গ্যারান্টি দেয়। কুরআন-সুন্নাহ্‌তে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্ধৃতির ভিত্তিতে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ বলেন, অমুসলিম নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া ওয়াজিব এবং তাদেরকে কোনোরূপ কষ্ট দেয়া হারাম। ইমাম ইবনে হাযম র. বলেন, 'এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করার জন্য কোনো শত্রু যদি হামলা করতে চায় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো তাদের হিফাযতের জন্য প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা।'[৩]

প্রখ্যাত ফকিহ কারাফি বলেন, 'কেউ যদি অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দেয়, তাদের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলে, তাদের অসাক্ষাতে তাদের ইজ্জতের ওপর একবিন্দু আক্রমণ করে কিংবা তাদের সাথে শত্রুতায় ইন্ধন যোগায় তাহলে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং দীন ইসলামের দায়িত্ব লঙ্ঘন করল।'[৪]

শুধু অমুসলিমদের জীবন নয়, তাদের মৃতদেহ ও হাড়গোড়ও মুসলমানদের নিকট মর্যাদাপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। একবার নবী করিম স.-এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তখন তিনি তার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হলো, এটা ইহুদির জানাযা (মৃতদেহ)। তখন রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'সে কি মানুষ নয়?'[৫]

---

[১]মুসনাদে আহমাদ।

[২]তাবারানি।

[৩]আল ফারুক লিল কারাফি, খ. ৩, পৃ. ১৪। উদ্ধৃত : ড. আবদুল করিম জায়দান, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ৬২।

[৪]উদ্ধৃত : ড. আব্দুল করিম যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

[৫]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল জানায়িয, বাবু মান কামা লি জানাযাতি ইহুদি।

www.pathagar.com

'বাহরুর রাইক' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, 'মৃত জিম্মি ব্যক্তির হাড়গোড়েরও অধিকার রয়েছে মুসলমানের হাড়ের সমমর্যাদা লাভের। তাদের অপবিত্র করা বৈধ নয়। কারণ একজন জিম্মির জীবদ্দশায় যদি তার প্রতি খারাপ আচরণ নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তার মৃত্যুর পর তার অস্থিকে সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করাও একইভাবে বাধ্যতামূলক।'[১]

মানুষের জীবনরক্ষার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ স. ও তাঁর সম্মানিত খলিফাগণের অনুপম দৃষ্টান্ত মানবতার ইতিহাসে বিরল। খোলাফায়ে রাশিদিনের আমলে বিভিন্ন বিজিত অঞ্চলে রক্তপাত ও খুন-খারাবি পরিহারের দৃষ্টান্ত স্মরণ করার মতো।

আলী রা.-এর সময় এক জিম্মিকে হত্যার দায়ে একজন মুসলিমকে অভিযুক্ত করা হলো। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আলী রা. হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দিলেন। যখন নিহতের ভাই রক্তপণের বিনিময়ে অপরাধীকে ক্ষমা করল, কেবল তখনই খলিফা তাকে মুক্তি দিলেন। সে সময় আলী রা. বললেন, যে কোনো জিম্মির রক্ত আমাদের রক্তের মতো পবিত্র এবং আমাদের সম্পত্তির ন্যায় তার সম্পত্তিও নিরাপদ।[২]

২. হিফয আদ-দীন (حِفْظُ الدِّيْنِ) বা দীন সংরক্ষণ

ইসলামী শরী'আহ্র পাঁচটি প্রধান উদ্দেশ্যের একটি হলো হিফয আদ-দীন বা দীনের সংরক্ষণ। দীন পালন ও তাকে যাবতীয় সীমালঙ্ঘন, অন্যায় ও জুলুম থেকে নিরাপদ রাখাকে হিফয আদ-দীন বলা হয়।

মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য দীন অনুসরণ ও সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। প্রকৃত দীন ছাড়া মানবজীবনে শৃঙ্খলা, শান্তি, সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা সম্ভব নয়। অধিকন্তু দীনের অনুসরণ ব্যতীত মানুষ মানবিকতা ও নৈতিকতাবোধ হারিয়ে ফেলে। দীনশূন্য মানুষ কখনো কখনো পাশবিকতার অতলে তলিয়ে যায়। মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দীন রক্ষা ও পালন করা জরুরি।

আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন দীন বা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। মহান আল্লাহ্ বলেন, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ—'তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সঠিক দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি সকল দীনের ওপর

---

[১]উদ্ধৃত : মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী, 'ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার, ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ২১।

[২]প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এ দীনকে জয়যুক্ত করেন।'[১] এ আয়াতে রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, সকল জীবনব্যবস্থার ওপর আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একমাত্র পছন্দনীয় দীন হলো ইসলাম। যেমন, মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ — 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র দীন।'[২] আল কুরআনে 'দীন' শব্দটিকে একটি ব্যাপক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত দীন হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং শারীরিক সহায়তায় সে বিশ্বাসকে বাস্তবায়ন করা। তবে দীন শব্দটি আরো বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, হিসাব-নিকাশ, আত্মসমর্পণ, উপাসনা ও আনুগত্য করা, শক্তি, ক্ষমতা, শাসন কর্তৃত্ব, প্রথা, বিচার, আইন-কানুন, ধর্ম, রীতি-পদ্ধতি, জীবনব্যবস্থা, প্রতিদান, অপরকে আনুগত্যের জন্য বাধ্য করা, অন্যের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা, অন্যকে গোলাম ও আদেশানুগত করা ইত্যাদি।

আল কুরআনে ব্যবহৃত 'দীন' শব্দটির পরিভাষাগত তাৎপর্য হচ্ছে : আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নবীর মাধ্যমে তাঁর বান্দাহ্দেরকে প্রদত্ত বন্দেগি ও জীবনপ্রণালী। প্রকৃতপক্ষে মানুষের এমন কোনো সমস্যা কিংবা জীবনের এমন একটি দিক ও বিভাগ নেই যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 'এই দীন বা জীবনপদ্ধতি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বোধশক্তি এবং অন্তঃকরণের গভীরতম প্রদেশ থেকে শুরু করে তাঁর ইবাদতগাহ ও এর চার দেয়াল, তার বংশ-খান্দান এবং তার সামাজিক ও তামাদ্দুনিক সংস্থাগুলো সমেত তার সমস্ত সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার চরম প্রান্ত অবধি উপনীত হয়। সে প্রতিটি প্রশ্নে, প্রতিটি বিষয়ে এবং প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ দান করে।[৩]

২.১. মানবসম্পদ উন্নয়নে দীন পালনের প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর সকল উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের চূড়ান্ত ও প্রধান হাতিয়ার হলো মানুষ। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি দীন এসেছে মানুষকে উন্নয়ন ও কল্যাণের উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সহায়তা করতে। দীন মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানায়। মানুষের প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের ওপর রয়েছে দীনের একচ্ছত্র আধিপত্য। তার স্বভাব, আচার-আচরণ, জীবনপদ্ধতি, চিন্তা-চেতনার ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দীনের প্রভাব অপরিসীম। শুধু ব্যক্তি

---

[১]আল কুরআন, ৯ : ৩৩।

[২]আল কুরআন, ৩ : ১৯।

[৩]মাওলানা সদরুদ্দিন ইসলাহী, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, অনুবাদ ও সম্পাদনা- মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রকাশক-নকিব পাবলিকেশন, পরিবেশনায়-খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৮, পৃ. ১৪।

www.pathagar.com

জীবন নয়, সামষ্টিক জীবনের ওপরও রয়েছে দীনের সর্বাত্মক প্রভাব। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার বিখ্যাত লেখক পেট্রিক গ্লাইন (Patrik Glynn) তাঁর সাড়া জাগানো 'God : The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Post Secular World'-গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন, 'মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে গবেষণা হয়েছে, তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, ধর্ম মানসিক স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। গবেষণার পর গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, যারা ধর্ম চর্চা করে, তারা আত্মহত্যা, পানাভ্যাস, মাদকাশক্তি, তালাক, বিষণ্নতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার মোকাবেলায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। দাম্পত্য-জীবনে তৃপ্তি পাওয়ার প্রধান শর্তও যে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচর্চা, এ সত্যটি বেরিয়ে এসেছে সেই সব গবেষণা থেকে।'[১]

সমাজকে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য আইনের পাশাপাশি প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ। ধর্ম ছাড়া এ দুটোর উন্নয়ন সম্ভব নয়। নৈতিক চরিত্র মূলত ধর্মবিশ্বাসের অনিবার্য ফলশ্রুতি। ফলে ধর্মের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া মানুষের মুক্তির দ্বিতীয় পথ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সত্ত্বেও ধর্মহীন সমাজ ও সভ্যতা পশুতুল্য হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত এ কথা স্বীকার করেছেন যে, নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার ও অধ্যাত্মবোধের দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া মানবজাতির মুক্তির বিকল্প পথ নেই। উইল এন্ড আরিয়েল বলেন, 'ইতিহাসে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নেই যে, ধর্ম ছাড়া কোনো সমাজ কোনো কালে তার নৈতিক জীবনকে সফলভাবে পরিচালনা করতে পেরেছে।'[২]

মানুষ জন্মগতভাবে একদিকে প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে বন্দি। এ ক্ষেত্রে সে দ্বিপদ জন্তুবিশেষ। অন্য দিকে সে আবার রুহের প্রেরণা দ্বারা সমৃদ্ধ অনেক গুণ, মূল্যবোধ ও মহিমায় নিজের অন্তর্জগৎকে আলোকিত করে রেখেছে। আর এ শ্রেণির মানুষই মূলত সফল। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ —'যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে।'[৩]

উৎকৃষ্টতম মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত গবেষক আবু জাফর বলেন, "এই আলো ও অন্ধকার, প্রবৃত্তিতাড়িত জান্তবতা এবং মহত্তম চৈতন্য, এই বিপরীতমুখী

---

[১]Patrick Glynn, God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Post secular World, Prima Publishing, California,1997, P.60-61.
[২]Will and Ariel Durant, Lesson of History, 1968, P. 51.
[৩]আল কুরআন, ৮৭ : ১৪।

www.pathagar.com

দ্বিমাত্রিকতার মধ্যেই মানবজীবনের অস্তিত্ব ও আবর্তন। যারা পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী বৈধ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী; যারা স্বভাবের কুৎসিত চাহিদাগুলোকে পরাভূত করে জীবনের ক্ষেত্রে মহত্তম গুণাবলিকে বিজয়ী করে তুলেছে, আল্লাহ্ তা'আলার ভাষায় তারাই হলো 'আহসানে তাকভিম' বা উৎকৃষ্টতম অবয়বে উৎকৃষ্টতম মানুষ। আর যারা ইতর প্রবৃত্তির ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে, তারা 'আসফালা সাফিলিন' বা নিকৃষ্টতম অপেক্ষাও হীন ও নিকৃষ্ট।"[১]

সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে দীন পালনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চন্দ্র-সূর্য যেমন পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য, তেমনি মানুষের অস্তিত্ব ও তার স্থিতির জন্য প্রয়োজন ধর্মের আলো। সূর্যের উদয় ছাড়া যেমন দিনের শুরু হয় না, তেমনি দীনের জ্যোতি ছাড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয় না। তাই বৃটিশ ইতিহাসবিদ আরনল্ড যোসেফ টয়েনবি মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা শেষে ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, মানবসভ্যতার বিকাশধারা, পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্ম সবসময়ই কেন্দ্রীয় প্রভাবক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

সমাজতন্ত্রীরা পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তার পতন ঘটেছিল। এ পতনের প্রধান কারণ ছিল 'বিশ্বাসের সংকট'। এ প্রসঙ্গে প্যাট্রিক গ্লাইন লিখেছেন, 'কমিউনিজমের পতনের কারণগুলো খুঁজতে গেলে ইতিহাসবিদদের কাছে এটা আরো স্পষ্ট হবে যে, নিরীশ্বরবাদী সোভিয়েত অভিজাতশ্রেণি 'বিশ্বাসের সংকটে' ভুগছিল। একটি নিরীশ্বরবাদী আদর্শের অধীনে বাস করে, যে আদর্শ অনেকগুলো মিথ্যার ওপরে এবং ওই মিথ্যাগুলো একটি বড় মিথ্যার ওপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল–সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা সকল অর্থেই নীতিভ্রষ্টতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগছিল। দেশটির জনগণ ও শাসকগোষ্ঠী হারিয়ে বসেছিল সব ধরনের নীতি-নৈতিকতার ধারণা এবং আশা।'[২] তাই বলা যায়, মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে প্রয়োজন প্রকৃত দীনের অনুসরণ প্রয়োজন।

এম. উমর চাপড়া বর্তমানের প্রেক্ষিতে মানবসম্পদের উন্নয়ন ও দীনের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যে বিষয়গুলোকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন তা চিত্রে প্রদর্শিত হলো :[৩]

---

[১]আবু জাফর, অসহিষ্ণু মৌলবাদীর অপ্রিয়-কথা, আর আই এস পাবলিকেশন্স, ২০০৫, পৃ. ৭৪।

[২]হারুন ইয়াহিয়া, নাস্তিকতাবাদের পতন, আলিমুল হক অনূদিত, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., চট্টগ্রাম-ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪৪।

[৩]এম. উমর চাপড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

www.pathagar.com

চিত্র-৪

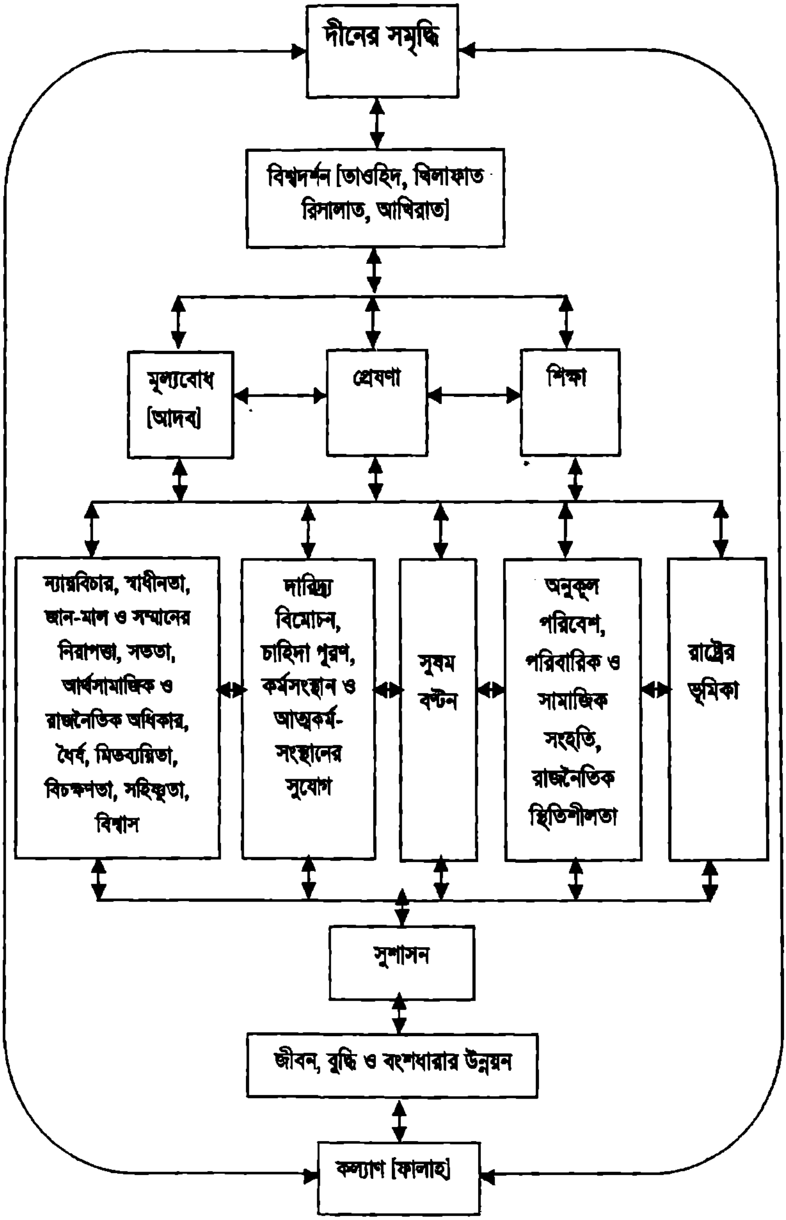

www.pathagar.com

মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে এসেছে অসংখ্য ধর্ম। সকল ধর্মের মৌলিক ও চিরন্তন সত্যের সমন্বিতরূপ হলো সর্বশেষ আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ইসলাম। এ ব্যবস্থাটি মানবজীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে। এটি একাধারে ধর্ম-বিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক জীবনপদ্ধতি। এককথায় মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন জীবনবিধান এটি। আর এই সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা ইসলামের প্রধান লক্ষ্যই হলো মানবকল্যাণ। এটি সত্য, ন্যায়, কল্যাণ, সুন্দর ও সৌন্দর্যের কথা বলে।

২.২. ইসলামে ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলাম চায় সারা পৃথিবীর মানুষ তাকে গ্রহণ করুক কিন্তু এ ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করে না। ইসলাম সকলের ধর্ম-বিশ্বাসের স্বাধীনতা দেয়। যে খৃস্টান খৃস্টান হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় এটা তার অধিকার। যে ইহুদি নিজ ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় এটা তার অধিকার। জোর খাটিয়ে কারো ধর্ম-বিশ্বাস নষ্ট করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্তে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া সাহাবায়ে কিরাম ও খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে ধর্মীয় স্বাধীনতার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, কোনো কোনো ইতিহাসবিদ শত্রুতা কিংবা অজ্ঞতাবশত অপপ্রচার করে যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের এই অপপ্রচারের পক্ষে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। থমাস আর্নল্ড অনুসন্ধানপূর্বক তাঁর বই 'The Preaching of Islam'-এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রচার হয়েছে বলে যে কথা প্রচার করা হয় তা সত্য নয়; সম্পূর্ণ মিথ্যা।[১] তিনি তাঁর বইতে দেখিয়েছেন যে, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইসলাম প্রচারের যে নজির দেখা যায় সেখানে কোনো জোরজবরদস্তি ছিল না; বরং ইসলামী আইন-কানুনের সৌন্দর্য ও মুসলমানদের ভালো আচরণ সেখানকার খৃস্টানদেরকে ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট করেছিল।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের সহনশীলতা ও সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত থাকলেও কোথাও কোথাও নির্যাতনের কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে এটি হয়ে থাকতে পারে রাজনৈতিক কারণে। এর পেছনে ইসলামী আইনের মূলনীতির কোনো সমর্থন ছিল না।[২]

[১] মোহাম্মদ হাশিম কামালি, ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অনুবাদ : মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৯, পৃ. ১১২।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

www.pathagar.com

ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমার রব যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সকলে অবশ্যই ঈমান আনতো, তবে কি তুমি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?'[১]

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ—'সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে কুফুরি করুক।'[২]

ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো মহান আল্লাহ্র আরো একটি বাণী, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ—'দীনের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই; নিশ্চয়ই সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।'[৩] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির র. তাঁর বিখ্যাত তাফসিরে লিখেছেন যে, কাউকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য করো না। কেননা ইসলাম এতোই সুস্পষ্ট ও এর দলিল এতোই উজ্জ্বল যে, এতে কাউকে প্রবেশ করতে বাধ্য করার প্রয়োজন নেই। আল্লামা জামাখশরি তাঁর তাফসিরে কাশ্শাফে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের অবকাশ রাখেননি বরং তা স্বাধীন ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।'

ইমাম রাজি র. তাঁর তাফসিরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু মুসলিম ইস্পাহানি ও কাফফালের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন : 'আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কঠোরতা ও জবরদস্তির অবকাশ রাখেননি, স্বাধীন ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাওহিদের দলিল-প্রমাণ এমন অকাট্যভাবে দিয়ে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে আর কোনো ওজর-আপত্তির অবকাশ নেই। অতঃপর তিনি বলেছেন, এসব অকাট্য প্রমাণ দেয়ার পর কোনো কাফিরের পক্ষে আর কুফুরির ওপর জিদ করার যুক্তি নাই। এ সত্ত্বেও যদি সে ঈমান না আনে তাহলে তাকে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করা ছাড়া ইসলামে দীক্ষিত করার আর কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার জায়গা, তাই এখানে এ শক্তি প্রয়োগ বৈধ নয়। কেননা তাতে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।'[৪]

প্রখ্যাত হাম্বলি ফকিহ ইবনে কুদামাহ বলেন, 'অবিশ্বাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার কোনো অনুমতি নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনো অমুসলিম নাগরিক অথবা নিরাপত্তা হিফাযতে থাকা ব্যক্তিকে জোর করে ইসলাম গ্রহণে

---

[১]আল কুরআন, ১০ : ৯৯।
[২]আল কুরআন, ১৮ : ২৯।
[৩]আল কুরআন, ২ : ২৫৬।
[৪]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র., আল-জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১।

www.pathagar.com

বাধ্য করা হলে; সে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুসলিম বলে গণ্য করা যাবে না। তবে তার মতামত জানার আগেই যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাকে অমুসলিম বলে গণ্য করা হবে।... এর মূল কারণ হলো মহান আল্লাহ্‌র বাণী, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ—'দীনের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই (২ : ২৫৬)।'[১]

রাসূলুল্লাহ্‌ স. ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থেকেছেন। তিনি কখনো কারো ওপর ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে দেননি। এ ব্যাপারে সাহাবিগণ ও অন্যান্য মুসলিম শাসকও অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন। যেসব অঞ্চল মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হয়েছে সেসব অঞ্চলের অমুসলিমরা প্রকাশ্যে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারত। এ ব্যাপারে তারা কোনো বাধানিষেধ ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়নি। তারা নিজ ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত অবাধে এবং ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও পেত অবাধ স্বাধীনতা।

রাসূলুল্লাহ্‌ স. বহু বার অমুসলিমদের ওপর কর্তৃত্ব পেয়েছেন কিন্তু তিনি কখনো তাদের ওপর ইসলাম চাপিয়ে দেননি। কেবল ইসলামের পবিত্রতা ও মহান শিক্ষা দিয়ে তাদের মনের অন্ধকার দূর করতে চেয়েছেন।

হাদিসে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যে, এক বেদুঈন ইসলাম ত্যাগ করলেও রাসূলুল্লাহ্‌ স. তাকে কোনো শাস্তি দেননি। উল্লেখ্য যে, 'এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্‌ স.-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণপূর্বক তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল। পর দিন সে আবার এলো সে সময় তার শরীরে জ্বর ছিল। সে বলল, আমার অঙ্গীকার আমাকে ফিরিয়ে দিন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ স. তা করতে অস্বীকার করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ স. বললেন, মদিনা হলো বায়ু প্রবাহিকার (হাপরের) মতো; যা খাদ নিংড়িয়ে ফেলে শুধু বিশুদ্ধটুকুই গ্রহণ করে।'[২]

এ ঘটনায় ধর্মত্যাগের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ স. আদৌ কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ করেননি এবং বারবার ধর্মত্যাগের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও বেদুঈনকে নিরাপদে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে বাধা দেননি।[৩]

একবার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. রাসূলুল্লাহ্‌ স.-এর অনুমতি ছাড়া বনু জুযাইমা গোত্রে রক্তপাত করলে রাসূলুল্লাহ্‌ স. প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, ঐ ঘটনার

---

[১]ইবনে কুদামাহ, আল মুগনি, খ. ৮, পৃ. ১৪৪।
[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবু ফাযাইলিল মাদিনা, বাবুল মাদিনাতু তানফিল খাবাছ।
[৩]মোহাম্মদ হাশিম কামালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

www.pathagar.com

সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। পরে তিনি সেই গোত্রের নিহত কুকুরের পর্যন্ত দিয়াত প্রদান করেন।[১]

উমর রা.-এর এক গোলাম ওসাক রুমী নিজেই বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. প্রায়ই আমাকে বলতেন, মুসলমান হয়ে যাও। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, তবে আমি তোমার ওপর মুসলমানদের আমানতের দায়িত্ব অর্পণ করবো। কেননা, অমুসলমানকে মুসলমানদের আমানতের কাজে নিয়োগ করা আমার জন্য সঙ্গত নয়। কিন্তু আমি ইসলাম গ্রহণ করিনি। এরপর তিনি বলতেন, দীন সম্পর্কে জোরজবরদস্তি নেই। পরিশেষে তিনি শাহাদতের পূর্বে আমাকে মুক্ত করে দেন এবং বলেন, যেখানে মন চায় চলে যেতে পারো।[২]

একবার উমর রা. বায়তুল মুকাদ্দাসের এক গির্জার কোণে সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি ভাবলেন, মুসলমানরা আমার এই সালাতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে খৃস্টানদেরকে হয়তো এখান থেকে বের করে দেবে। তাই তিনি একটা বিশেষ প্রতিজ্ঞালিপি লিখে দূত মারফত সেখানে পাঠিয়ে দেন। এই অঙ্গীকারনামার আলোকে গির্জাটি খৃস্টানদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। আর এই নিয়ম প্রবর্তন করা হলো যে, প্রয়োজনে শুধু একজন মুসলমান গির্জায় প্রবেশ করতে পারবে।[৩]

একবার কতিপয় মুসলিম প্রতিবেশী উমর রা.-কে চার্চে ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানালে তিনি বললেন, মসজিদে মুসলমানদের ইবাদত করার যতটুকু অধিকার আছে ততটুকু অধিকার আছে চার্চে খৃস্টানদের উপাসনা করার। এ ব্যাপারে তাদের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ হবে কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী। পরে উমর রা. বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে অনুরোধ করেন মুসলমানদের সালাতের সময় ঘণ্টা না বাজানোর জন্য। তারা তাঁর অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিল।[৪]

আবু জাহরানের মতে, প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ কেউ যাতে ধর্মের ব্যাপারে কোনো রকম জোরজবরদস্তি না করে সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন

---

[১]সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, আল জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

[২]ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, খ. ১, পৃ. ১৫৪; ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

[৩]মুহাম্মদ হুসায়েন হায়কাল, উমর ফারুক, পৃ. ৩০২; মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, ইসলামে মানবাধিকার, আধুনিক প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ২৬০।

[৪]Dr. N. K. Singh, Peach Through Non-violent Action in Islam, Adam Publishers & Distributors, Delhi, 1996, P. 77.

www.pathagar.com

করতেন। এ বিষয়ের একটি ঘটনা হলো, একবার এক খৃস্টান মহিলা উমর রা.-এর কাছে একটি আবেদন নিয়ে আসে। তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করেন। পরে তিনি উক্ত মহিলাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। কিন্তু ঐ মহিলা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এ পর্যায়ে খলিফা তার দাওয়াত জোরজবরদস্তির মধ্যে পড়ে কিনা এই আশঙ্কায় বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং এ বিষয়ে তাঁর অনুতাপের ভাষাটি ছিল, 'হে আল্লাহ্ আমি তো তার প্রতি জোরজবরদস্তির কিছু প্রকাশ করিনি, আমি জানি ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।'[১]

ইসলাম শুধু প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েই শেষ করেনি, বরং প্রত্যেকের মনে কষ্ট দিতে এবং তাদের দেবদেবীকে গালমন্দ করতে নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَــدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ—'আর আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না, তাহলে তারা শত্রুতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্কে গালি দেবে।'[২] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ—'তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবিদের সাথে বিতর্ক করবে না।'[৩]

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র. বলেন, 'ইসলাম কাউকে বলপ্রয়োগে নিজের বশ্যতা স্বীকার করায় না। সে কেবল যুক্তি ও দলিল-প্রমাণের আলোকে সত্যপথ ও অসত্যপথকে আলাদা করে দেখিয়ে দেয়। তারপর প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেয় যে, ইচ্ছা হয় ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে কেউ ব্যর্থতার গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত হোক। অন্যথায় সত্য ও সরল পথ অবলম্বন করে কেউ প্রকৃত ও চিরন্তন কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করুক।'[৪]

২.৩. অমুসলিমদের ওপর ইসলামী আইনের প্রয়োগ ও নাগরিক অধিকার

ইসলামের দুটি দিক রয়েছে। প্রথম দিকটি হলো আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদত শ্রেণির। এ বিষয়ে প্রত্যেক নাগরিক তার নিজ ধর্মের ওপর আমল করবে। এ ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আর দ্বিতীয় দিকটি হলো আইনগত দিক। এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক জারিকৃত সার্বজনীন আইনগুলো পরিপালনের ক্ষেত্রে দেশের সকল নাগরিক বাধ্য থাকবে।

---

[১]মোহাম্মদ হাশিম কামালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।
[২]আল কুরআন, ৬ : ১০৮।
[৩]আল কুরআন, ২৯ : ৪৬।
[৪]সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র., আল জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬৫।

www.pathagar.com

কিছুটা ব্যতিক্রম ছাড়া দণ্ডবিধি সকল ধর্মের মানুষের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ইমাম মালিক র.-এর মতে, অমুসলিম নাগরিকদের ওপর যিনার শাস্তি প্রযোজ্য নয়। কেননা, উমর ও আলী রা. অমুসলিম ব্যক্তি যিনা করলে তাকে তার সম্প্রদায়ের নিকট ন্যস্ত করা হবে এবং তারা তাদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী এর বিচার করবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১] আবার মদপানের ক্ষেত্রে অমুসলিম নাগরিকদের শাস্তির আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে।[২] তবে অমুসলিমগণ তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ইসলামী আইন অনুসারে ফয়সালা প্রার্থনা করলে সেই অবস্থায় ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা হবে।

অমুসলিমদের ধর্মীয় এবং পারিবারিক কর্মকাণ্ড, যেমন যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থা, বিবাহ, তালাক, দেবোত্তর সম্পত্তি দান, ওয়ারিশি স্বত্ব বণ্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধান প্রযোজ্য হবে। খোলাফায়ে রাশিদিন ও তৎপরবর্তী আমলে এ নীতিই কার্যকর ছিল। উমর ইবনে আব্দুল আযিয র. হাসান বসরি র.-কে জিজ্ঞেস করেন, 'খোলাফায়ে রাশিদিন অমুসলিম নাগরিকদেরকে নিষিদ্ধ (মাহরাম) নারীর সাথে বিবাহ, মদ, শূকরের ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন কীভাবে? হাসান বসরি র. উত্তর লিখে পাঠান, তারা জিযইয়া দিতে এজন্যই তো সম্মত হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করার সুযোগ দিতে হবে। আপনার কর্তব্য পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুসরণ করা, নতুন পদ্ধতি চালু করা নয়।'[৩]

অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিক। কোনো অবস্থাতেই তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা যাবে না। এমনকি তারা রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো কাজ করলে শাস্তি দেয়া যাবে কিন্তু তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা যাবে না। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে ইয়াযিদ রোমক খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে সাইপ্রাসের অমুসলিম অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ায় পুনর্বাসিত করেন। এতে ফকিহগণ এবং অমুসলিম জনসাধারণ ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং তারা এই দেশান্তরকরণকে একটি মারাত্মক গোনাহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর ওয়ালিদ ইবনে ইয়াযিদ পুনরায় তাদেরকে সাইপ্রাসে নিজ নিজ বসতিতে পুনর্বাসিত করলে তার প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয়, এটাই ন্যায়বিচারের দাবি।[৪]

---

[১]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮২।

[২]প্রাগুক্ত। আরো দেখুন, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২০৮-২০৯; আল-মাবসূত, খ. ৯, পৃ. ৫৭-৫৮।

[৩]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩।

[৪]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৪; দ্র. ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৫৬।

www.pathagar.com

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আলিমগণের ভূমিকা পালনের আরো একটি উদাহরণ হলো, লেবাননের পার্বত্য এলাকার একটি অমুসলিম গোষ্ঠী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাদের দমনের জন্য সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ্ একটি সামরিক বাহিনী পাঠান। সেনা অভিযানের ফলে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সশস্ত্র প্রায় সকল পুরুষ লোক নিহত হয় এবং অবশিষ্ট কতককে দেশান্তরিত করা হয়, আর কতককে স্ব-এলাকায় বহাল রাখা হয়। ইমাম আওযাঈ র. এই জুলুমের জন্য সালেহকে তিরস্কার করে একটি পত্র লিখেন এবং বলেন, 'আমি বুঝি না, কতক বিশেষ অপরাধীর অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সাধারণ মানুষকে কীভাবে উৎখাত করা যায়? অথচ আল্লাহ্ তা'আলার স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى—'আর কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না।'[১] এটি অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। তোমার জন্য আমার সর্বোত্তম উপদেশ এই যে, 'তুমি রাসূলুল্লাহ্র স.-এর এই বাণী মনে রেখো : যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর জুলুম করবে এবং তাদের সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপাবে, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি নিজেই ফরিয়াদি হবো।'[২]

২.৪. অমুসলিমদের অধিকার ব্যাহত হওয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিম নাগরিকদেরকে 'জিম্মি' বলা এবং তাদের ওপর 'জিয্ইয়া' কর আরোপের প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ কেউ ইসলামী শরী'আহ্র বিরুদ্ধে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অভিযোগ করে থাকে। কিন্তু এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। কেননা, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

অমুসলিমদেরকে 'জিম্মি' বলার উদ্দেশ্য তাদেরকে ছোট বা হেয় করা নয়; বরং মুসলিমগণ তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুসহ সবকিছুর নিরাপত্তার জিম্মাদারি গ্রহণ করার কারণে তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয়। আর 'জিয্ইয়া' কর আরোপের কারণ হলো তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য নয়। যারা নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক নয় কেবল তাদের নিকট থেকে 'জিয্ইয়া' কর আরোপ করা হবে আর যারা নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগদান করবে তাদের নিকট থেকে উক্ত কর আরোপ করা যাবে না। সরকার ইচ্ছা করলে নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগদানে অনিচ্ছুক কোনো মুসলিমের ওপরও কর আরোপ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রথিতযশা খৃস্টান পণ্ডিত টি. ডব্লিউ. আরনল্ড লিখেছেন,

---

[১]আল কুরআন, ৬ : ১৬৪।
[২]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৪; দ্র. ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৬৯; সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ।

www.pathagar.com

'মিসরে যখন মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়কে সামরিক দায়িত্ব পালন থেকে রেহাই দেয়া হয়েছিল তখন তাদের ওপর খৃস্টান জনসাধারণের ওপর আরোপিত করের ন্যায় একটি বিশেষ কর ধার্য করা হয়েছিল।' তিনি আরো বলেন, জিয্ইয়া কর শুধু সামরিক দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে সক্ষম পুরুষদের ওপর ধার্য ছিল। এ ধরনের পুরুষ মুসলিম হলে তাদেরকে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হতো। কিন্তু কোনো খৃস্টান সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলে তাকে জিয্ইয়া দিতে হতো না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এন্টিওক নগরীর উপকণ্ঠে বসবাসকারী আল-জারাজিমা নামক খৃস্টান গোত্র মুসলিমদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেছিল যে, তারা জিয্ইয়া দানের পরিবর্তে মুসলিমদের মিত্র হিসেবে তাদের সাথে যুদ্ধে যোগদান করবে এবং বিনিময়ে আনুপাতিক হারে যুদ্ধলব্ধ মালে (গানিমা) অংশ পাবে।'[১]

আবার অমুসলিম নাগরিকগণ জিয্ইয়ার পরিবর্তে যাকাত প্রদান করতে চাইলে উমর রা. তা গ্রহণ করেছিলেন। একবার খৃস্টান গোত্র বনু তাগলিবের লোকেরা জিয্ইয়ার পরিবর্তে দ্বিগুণ যাকাত প্রদানের জন্য উমর র.-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিল। তিনি তাতে সম্মত হলেন এবং এ মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'এ লোকেরা নির্বোধ, তারা অর্থ মেনে নেয় কিন্তু নাম অস্বীকার করে।'[২]

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণ কোনো অবস্থাতেই মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধা পায় না; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেমন, অমুসলিমগণ সামরিক বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য নয় কিন্তু মুসলিমগণ বাধ্য। আবার যাকাত শুধু মুসলিমগণই দিতে বাধ্য, অমুসলিমগণ নয়। অন্য দিকে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য অমুসলিমদের ওপর যেসব কর আরোপ করা হয় সেসব কর মুসলিমদের ওপরও আরোপ করা হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে চাকুরির ক্ষেত্রেও অমুসলিমগণ মুসলমানদের সমান-সুযোগ পেয়ে থাকে। যেমন, উমর রা.-এর খিলাফতকালে মিসর প্রদেশের অর্থ বিভাগ কপ্টিক খৃস্টানদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।[৩] পরবর্তীকালে মুসলিম

---

[১]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯২-৬৯৩।

[২]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, অনুবাদ-মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৪৯।

[৩]ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯২।

www.pathagar.com

শাসকগণ যোগ্যতা অনুসারে অমুসলিমদেরকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগ দিয়েছেন। যেমন খলিফা মু'তাসিমের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন সালামুইয়াহ্ নামের একজন খৃস্টান। খলিফা আব্দুল মালিকের রাজকবি ছিলেন আখতার তাপলিনি নামীয় এক খৃস্টান। আব্বাসীয় খলিফা আল মানসুরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খালিদ ইবনে বারমাক নামীয় এক খৃস্টান। খলিফা আব্দুর রহমান ওয়ালেস ইবনে খাজিয়ান নামক এক খৃস্টানকে বিচারপতি পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। খলিফা মুযাহিজের সেনাপতি ছিলেন হুওয়ার আল মিকেলি নামের খৃস্টান। সে সময় ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ময়দানে অমুসলিমদের অবাধ পদচারণা ছিল। যেমন কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক অধ্যাপক ছিলেন ইহুদি ও খৃস্টান। আব্বাসীয় খলিফা ইজফ-উদ্দৌলা ইবরাহিম ইবনে হেলাল নামের এক অগ্নিপূজককে ইসলামের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[১]

এ ছাড়া অমুসলিমদের অধিকারসংক্রান্ত অধিকাংশ বিষয় ইসলামী শরী'আহ্র পরিবর্তনশীল বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ফলে পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে অমুসলিমদের কল্যাণে যে কোনো ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে ইসলামের অভিপ্রায় হলো, শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকই যেন কোনো ধরনের কষ্টের সম্মুখীন না হয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যেন সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই ইসলামী শরী'আহ্র লক্ষ্য।

৩. হিফয আল-আকল (حِفْظُ الْعَقْلِ) বা বুদ্ধি-বিবেক সংরক্ষণ

হিফয আল-আকল বলতে বুঝায় মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা থেকে রক্ষা করা। কেননা, ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস, বাতিল মতাদর্শ ও চিন্তাধারার নেতিবাচক প্রভাবে বিবেকবান ব্যক্তিও সমাজের বোঝা, মন্দের উৎস ও ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। যার আকল সুষ্ঠু ও বিকারমুক্ত, সে দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে আর যার আকল বিভ্রান্ত ও বিনষ্ট সে সমাজের বোঝাস্বরূপ।

আকল বা বুদ্ধি হলো এমন ক্ষমতার সমষ্টি যার মাধ্যমে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সঠিক কাজটি করা যায়, যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করা যায় এবং যথার্থভাবে সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, বুদ্ধি হলো ব্যক্তির এমন একটি ক্ষমতা বা

[১] অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, ইসলামী সমাজে অমুসলিম সম্প্রদায়, বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫।

www.pathagar.com

যোগ্যতার সমষ্টি যার দ্বারা সে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে, বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং সমস্যার সমাধানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

আকল বা বুদ্ধিকে জ্ঞানার্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় যেখানে শেষ আকল-বুদ্ধি সেখান থেকে কাজ শুরু করে। আবার ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক আকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বিবেক-বুদ্ধি সম্পর্কে হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবি বলেন, 'বিবেক এমন একটি শক্তি, যা দিয়ে মানুষ চিন্তাগত শাস্ত্র উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে। এটা যেন একটা নুর, যা অন্তরে রাখা হয় এবং যা দিয়ে মানুষ উপলব্ধি করার যোগ্য হয়।'[১]

বিবেক কমবেশি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাযালি র. তাঁর এহইয়াউ উলুমিদ্দিন গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি হলো : রাসূলুল্লাহ্ স. এক দীর্ঘ বক্তব্যের শেষে বললেন, 'ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কাছে আরজ করল, ইলাহি, আপনি আরশের চেয়েও বড় কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন কি? ইরশাদ হলো, হাঁ, বিবেক আরশের চেয়েও বড়। প্রশ্ন হলো, এর পরিমাণ কতটুকু? ইরশাদ হলো, তোমরা এর পুরোপুরি জানতে পারবে না। তোমরা বালুকার সংখ্যা জান কি? উত্তর হলো, না। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, 'আমি বিবেককেও বালুকার সংখ্যানুযায়ী বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি করেছি। কেউ এক রতি পেয়েছে, কেউ দু' রতি, কেউ তিন রতি এবং কেউ চার রতি পেয়েছে। আবার কেউ আট সেরের কাছাকাছি এবং কেউ এক উটের বোঝাই পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে।'[২]

৩.১. আকল বা বিবেকের প্রয়োজনীয়তা

বুদ্ধি-বিবেক মহান আল্লাহ্‌প্রদত্ত একটি বড় নিয়ামত। মূলত আকলের কারণেই মানুষকে অন্য সব প্রাণীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, আর এ কারণেই মানুষের ওপর মহান আল্লাহ্ শরী'আহ্ পরিপালনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আল কুরআনে বহু বার মহান আল্লাহ্ বিবেকসম্পন্ন লোকদের সম্বোধন করেছেন এবং সেসব লোকেদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'নিঃসন্দেহে এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।'[৩] 'এমনিভাবে আমি বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের নিকট

---

[১]ইমাম গাযালি র., এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, মদিনা পাবলিকেশন্স, ২০১০, খ. ১, পৃ. ২০১।

[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

[৩]আল কুরআন, ১৩ : ৪।

www.pathagar.com

নিদর্শনাদি বিশদাকারে বর্ণনা করি।'[১] 'একমাত্র বোধসম্পন্ন লোকেরাই বুঝতে পারে।'[২] 'কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবমান অন্তরই চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।'[৩] 'আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের জন্য উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।'[৪] 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? না কি তাদের অন্তঃকরণ তালাবদ্ধ রয়েছে?'[৫]

ইসলামে জ্ঞানের উৎস হিসেবে অহির ওপর বিশ্বাস স্থাপনকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যুক্তি-বুদ্ধির কোনো মূল্যই নেই। অহি ও যুক্তি-বুদ্ধির একটি হলো হৃদয় এবং অন্যটি মন। এদের একটি থেকে অন্যটিকে পার্থক্য করা যায় না। আর এ দুটিই মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্য।

বিশ্বাস আকল বা বুদ্ধিকে সঠিক নির্দেশনা দেয়। বিশ্বাসের নির্দেশনা ছাড়া আকল মানবসভ্যতার ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তাই আকলকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিশ্বাসের নির্দেশনা প্রয়োজন। আবার সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ইসলামী শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়ন ও বিশ্বাসের গতিশীলতার জন্য প্রয়োজন আকল বা বুদ্ধি-বিবেক। ফলে বিশ্বাস ও আকল উভয়ের সমান প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা যায়।

আকল বা বুদ্ধি মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র একটি বড় নিয়ামত। এটি ক্রটিপূর্ণ হলে সমস্ত পৃথিবীটাই বিভ্রান্ত ও অস্বস্তিকর মনে হয়। এ প্রসঙ্গে মুস্তফা শিবলি তাঁর 'তা'লিমুল আহকাম' গ্রন্থে লিখেছেন, আসলে পৃথিবীটা একটা বোধজ্ঞানহীন পশু, কোনো চিন্তাশীল মানুষ নয়। আর বুদ্ধির আলোকেই পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়।[৬]

একটি হাদিসে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক বিষয়ের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার আছে। মুমিনের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার হলো তার বিবেক। প্রত্যেক বস্তুর স্তম্ভ আছে। দীনের স্তম্ভ বিবেক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি রক্ষক আছে। ইবাদতকারীর

---

[১]আল কুরআন, ৩০ : ২৮।
[২]আল কুরআন, ২৯ : ৪৩।
[৩]আল কুরআন, ৪০ : ১৩।
[৪]আল কুরআন, ১৪ : ২৫।
[৫]আল কুরআন, ৪৭ : ২৪।
[৬]ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, আল-মাকাসিদুল আম্মা লিশ-শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ। আরো দেখুন, শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায়, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ২, সংখ্যা ৫, ২০০৬, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

রক্ষক বিবেক। প্রত্যেক সওদাগরের পুঁজি আছে। মুজতাহিদের পুঁজি বিবেক। প্রত্যেক আহলে বায়াতের জন্য একজন ব্যবস্থাপক আছে। সিদ্দিকগণের গৃহের ব্যবস্থাপক বিবেক। প্রত্যেক জনশূন্য স্থানের আবাদি আছে। আখিরাতের আবাদি বিবেক। প্রত্যেক মানুষের পেছনে এক কীর্তি থাকে, যার কারণে তার আলোচনা হয়। সিদ্দিকগণের এরূপ কীর্তি হলো বিবেক। প্রত্যেক সফরের জন্য একটি তাঁবু আছে। ঈমানদারের তাঁবু বিবেক।'[১]

আকল-বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উমর রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'মানুষের উপার্জনের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধির সমান কোনো কিছু নেই। বিবেক-বুদ্ধি মানুষকে হেদায়েতের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মানুষের বিবেক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণ হয় না এবং দীন সঠিক হয় না।'[২]

বিশ্বাস ও বুদ্ধির সমান গুরুত্বের বিষয়টি ফুটে উঠেছে মুসলিম উম্মাহর পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন আলোচনায়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. এ প্রসঙ্গে বলেন, 'মুসলিমগণ কুরআন, সুন্নাহ্ ও পূর্ববর্তী আলিমগণের ঐকমত্য থেকে তাদের আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত এবং দীনের অন্যান্য যে বিষয় গ্রহণ করে তার সাথে আকল বা বুদ্ধির কোনো বিরোধ নেই। যেসব বিষয়ের সাথে আকলের বিরোধ রয়েছে তা বাতিল।'[৩] তিনি আরো বলেন, কুরআন-সুন্নাহ্র যেসব বিষয় আকল ধারণ করতে পারে না তা আকলের দুর্বলতা, কুরআন-সুন্নাহ্র দুর্বলতা নয়। বিখ্যাত পণ্ডিত মুস্তফা আল যারকা বলেন, 'এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বিশ্বাস ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে এমন কিছুই নেই যার সাথে যুক্তি-বুদ্ধির বিরোধ রয়েছে।'[৪]

আকল বা বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইমাম গাযালি র. বলেন, 'আকল হলো প্রবাহিত ঝরনাধারার মতো এবং এটি জ্ঞানের ভিত্তি। বৃক্ষ থেকে যেমন ফল, সূর্য থেকে যেমন আলো এবং নয়ন থেকে যেমন দৃষ্টির উৎপত্তি তেমনি আকল থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি।[৫]

আল ফারাবি আকল-বুদ্ধিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেন, এর চূড়ান্ত স্তরটি হলো চালকবুদ্ধি (আল-আকল আল-ফা'আল)। তিনি চালকবুদ্ধিকে 'পবিত্র আত্মা' বলে

---

[১]ইমাম গাযালি র., এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৯।
[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।
[৩]ইমাম ইবনে তাইমিয়া র., মাজমু আল-ফাতওয়া, খ. ১১, পৃ. ৪৯০।
[৪]মুস্তফা আল-যারকা, আল-আকল ওয়া আল-ফিকহ, ১৯৯৬, পৃ. ১৪।
[৫]ইমাম গাযালি র., এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

www.pathagar.com

অভিহিত করেছেন। এ বুদ্ধি আত্মিকজগৎ থেকে আগত এবং এর অবস্থান মানবমনের বাইরে। এর সাহায্যেই কেবল সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। তার মতে, কোনোকিছুকে দেখার বিষয়টি যেমন সূর্যের আলোর ওপর নির্ভরশীল, তেমনি কোনোকিছুর সঠিক জ্ঞান চালকবুদ্ধির জ্যোতির ওপর নির্ভরশীল।[১] আকল-বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার আরো কিছু দিক নিচে আলোচনা করা হলো :

৩.১.১. প্রতিটি মানুষ সমাজগৃহের একটি ইটের মতো : প্রতিটি ব্যক্তির আকল তার একার সম্পদ নয়; এটি সকল মানুষের সম্পদ। এই দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজগৃহের একটি ইটতুল্য। কাজেই একজনের আকল নষ্ট হলে তার দ্বারা পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর প্রতিটি সুস্থ আকল সমাজের সংশোধনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.১.২. বিকল আকলসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের বোঝা : বিকল আকলসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূপ। আয়-রোজগার থেকে শুরু করে সে সমাজের কোনো কাজে আসে না। বরং সে সমাজের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। এ জন্য আকল রক্ষা করা প্রয়োজন।

৩.১.৩. বিকল আকলসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের কষ্টের কারণ : আকল বিনষ্ট ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা ও সম্পদ ধ্বংসসহ নানাবিধভাবে মানুষের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য আকল রক্ষা করা প্রয়োজন।

৩.১.৪. কুরআন-সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ : কুরআন-সুন্নাহ্র বিভিন্ন শব্দের মর্ম উদ্ধার এবং বিভিন্ন আয়াত ও বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আকল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আকলের মাত্রার ওপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের গুণমান অনেকখানি নির্ভরশীল।

৩.১.৫. ইজতিহাদের ক্ষেত্রে : ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের আলোকে নতুন সমস্যাদি সমাধানের ক্ষেত্রে আকলের ভূমিকা অপরিহার্য। আকলের কার্যকরী ব্যবহার ছাড়া নিত্য-নতুন সমস্যাদির সমাধান, নতুন নীতিমালার উদ্ভাবন যথার্থ হয় না।

৩.২. আকল হিফাযত ও বিকাশের উপায়

আকল বা বুদ্ধি-বিবেক সুস্থ না হলে সমাজকে সুন্দররূপে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ জন্য আকল সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। আকল রক্ষার উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে :

---

[১]রহমাতুল্লাহ খন্দকার, আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস ও যুক্তিপ্রমাণ, আইইআরএফ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৮।

www.pathagar.com

চিত্র-৫

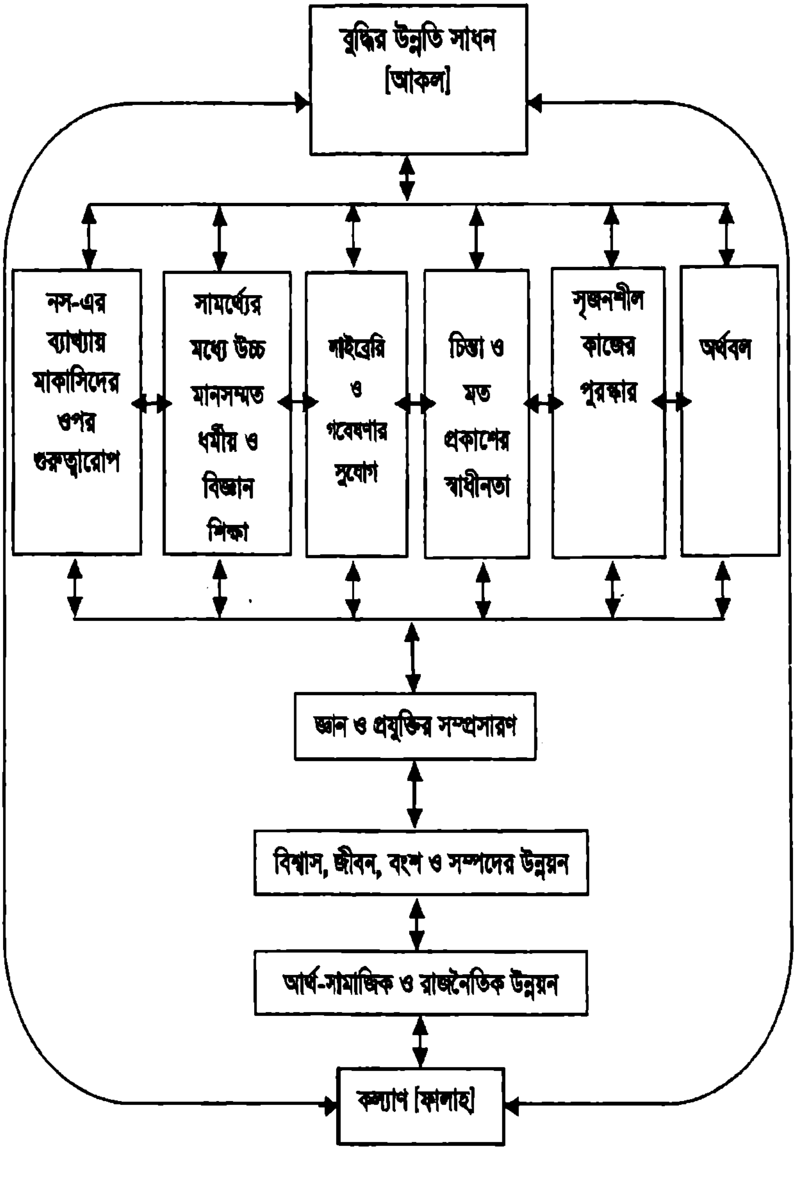

৩.২.১. আকল বিনষ্টকারী বাহ্যিক উপকরণ থেকে একে হিফাযতে রাখা : আকল বিনষ্টকারী বাহ্যিক উপকরণের মধ্যে রয়েছে মদ, গাঁজা, ড্রাগ, হেরোইন প্রভৃতি

www.pathagar.com

নেশাজাতীয় দ্রব্য। এ কারণে ইসলামে মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য, চুরি, ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে।

আল কুরআনে বলা হয়েছে : 'হে মু'মিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং এগুলো বর্জন করো—যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো চায় মদ-জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'[১]

৩.২.২. আকল বিনষ্টকারী অভ্যন্তরীণ উপকরণ থেকে আকলকে রক্ষা করা : বাতিল ধর্ম-মতবাদ, কুফর, শিরক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ, মানবরচিত বিধান দ্বারা পরিচালিত রাজনীতি ও অর্থনীতি আকলকে বিভ্রান্ত করে। আকলের হিফাযতের জন্য এসব বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে।

৩.২.৩. ইবাদত : মানুষের আকল সুরক্ষার জন্য ইসলামে নানাবিধ ইবাদত-বন্দেগির কথা বলে দেয়া হয়েছে। এগুলো মানুষের নফসকে পরিমার্জিত করে এবং আকলকে শানিত করে। যেমন বলা হয়েছে, إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ—'নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[২]

৩.২.৪. সুশিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা : আকলের সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সুশিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতি বিনির্মাণ জরুরি। মানুষকে সভ্য করে গড়ে তোলা ও তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য ইসলাম সবার জন্য শিক্ষা অর্জন করা বাধ্যতামূলক করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেকে তার আকল-বুদ্ধি বিকাশের সুযোগ পায়, যা দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র লাভবান হয়ে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি উঠে এসেছে আল কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলোতেই। যেখানে বলা হয়েছে, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ—'পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।'[৩] এ ছাড়া প্রত্যেকের জন্য জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।'[৪] আকল বিকাশের জন্য যেমন দীনি শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি মানুষের পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাও প্রয়োজন।

---

[১]আল কুরআন, ৫ : ৯০-৯১।
[২]আল কুরআন, ২৯ : ৪৫।
[৩]আল কুরআন, ৯৬ : ১।
[৪]ইবনে মাযাহ।

www.pathagar.com

৪. হিফয আন্-নসল (حفظ النسل) বা বংশধারা সংরক্ষণ

পিতামাতার সাথে সন্তানের জন্মগত সম্পর্ককেই বংশপরিচয় বলা হয়। বংশ রক্ষা করা ইসলামী শরী'আহ্র একটি মূল উদ্দেশ্য। মানবজাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষায় সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য ইসলামী শরী'আহ্ বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। পৃথিবীতে মানবজাতি মহান আল্লাহ্র এক অমূল্য সম্পদ। এখানে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করা না গেলে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। মানুষের বংশধারা রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সুস্থ ও পবিত্র জীবনযাপনের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের বংশধারা রক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সন্তান জন্মদান, লালন-পালন ও তার জীবনযাপনকে সুন্দর করার সুব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলার বিধান ইসলামে রয়েছে । এ শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা হলে মানুষ ও পশুর মাঝে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না এবং সুসভ্য জাতি গঠন ব্যাহত হয়।

৪.১. বংশধারা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বংশধারা হিফাযত করা মানবজাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানুষের আবাদ চলছে বহুকাল ধরে। মানবিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব এবং পৃথিবীতে মানুষের খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতা নির্ভর করে বংশবৃদ্ধি ও প্রজনন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ওপর। এ জন্য বংশধারা সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। তাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য তাকে অনেক গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী করা হয়েছে। এসবের মধ্যে বংশবিস্তারের ক্ষমতাও একটি। এইসব যোগ্যতা ও গুণাবলিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যানুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু শুধু একজন মানুষের পক্ষে সৃষ্টিকুলের প্রতি সার্বিক ন্যায়বিচার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন বহু মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা। তাই এই পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্র যে পরিকল্পনা রয়েছে তা সফল করতে হলে মানুষের বংশধারা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে হবে।

নারী-পুরুষের পবিত্র মিলনের মাধ্যমে মানুষের বংশধারা ব্যাপকভাবে বিস্তার করা মহান আল্লাহ্র পরিকল্পনা। কিন্তু শুধু বহু মানুষ হলেই হবে না তাদের মধ্যে থাকতে হবে ঐক্য, সংহতি, ভালোবাসা, পবিত্র বন্ধন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা বাস্তবায়নে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা। এ সকল যোগ্যতা অর্জনে ইসলামের পারিবারিক জীবনব্যবস্থা আশানুরূপ ফল প্রদান করে।

www.pathagar.com

৪.২. বংশধারা রক্ষার উপায়

৪.২.১. বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান : যৌনতা মানুষের একটি জন্মগত ক্ষমতা। এটি মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। এই ক্ষমতাকে জীবিত, কার্যকর ও সক্রিয় রাখার মাধ্যমে মানুষের বংশধারা রক্ষা করা যায়। তাই নিজেকে প্রকৃতির ধর্ম আখ্যাদানকারী ইসলাম এই যৌনক্ষমতার দাবি পূর্ণকারী একমাত্র সঠিক পদ্ধতি বিবাহকে কেবল বৈধই করেনি, বরং বিবাহ করতে মানুষকে উৎসাহিত করেছে, উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছে এবং একে এড়িয়ে চলাকে তিরস্কার ও নিন্দা করেছে।[১] রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'বিবাহ আমার একটি সুন্নাহ্। কাজেই যে আমার সুন্নাহ্ মেনে চলবে না সে আমার দলভুক্ত হবে না।'[২]

পৃথিবীতে মানুষের বংশধারা সংরক্ষণের জন্য ইসলাম নারী-পুরুষের পবিত্র মিলনের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করেছে। বংশধারা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আল কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র বাণী, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ — 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। কাজেই তোমাদের শস্যক্ষেত্রে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা যেতে পারো।'[৩] এ আয়াতে স্ত্রীকে শস্যক্ষেত্র হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেয়া। কেননা, শস্যক্ষেত্রের আসল উদ্দেশ্য হলো তা চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা।

মানুষের বংশধারা রক্ষার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র বিধান পালন করায় আজও দুনিয়াতে মুসলিম সমাজের ভিত সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পাশ্চাত্যবাসীরা দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেয়নি। তাদের অবাধ যৌন স্বাধীনতার কারণে যত্রতত্র মানব সন্তানের জন্ম হয়। ফলে তাদের বংশ পরিচয় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং বংশপরিচয়ের সূত্র ধরে একে অপরের সাথে সুদৃঢ় ও আত্মীয়তার বন্ধন বলতে সেখানে কিছু নেই বললেই চলে।

৪.২.২. যিনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা : যিনা-ব্যভিচার পরিহার করে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেয়ার দ্বারা বংশধারার পবিত্রতা রক্ষা পায়।

---

[১]মওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব, অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ-১, সংখ্যা-৩, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

[২]ইবনে মাযাহ।

[৩]আল কুরআন, ২ : ২২৩।

www.pathagar.com

বংশধারার পবিত্রতা রক্ষায় ইসলামে যেমন যিনা-ব্যভিচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, পাশাপাশি তা প্রতিকারের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার বংশধারার পবিত্রতা রক্ষার জন্য যিনা-ব্যভিচারের অপবাদ দেয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এর জন্যও শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৈবাহিক সম্পর্ক বাদ দিয়ে অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে একদিকে যেমন বংশধারার পবিত্রতা বিনষ্ট হয় অন্য দিকে এতে গোটা মানবসমাজে নগ্নতা, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, পারস্পরিক হিংসাবিদ্বেষ ও রক্তপাত বৃদ্ধি পায়। যে সমাজে অবাধ যৌনাচার সমর্থন পায়, সে সমাজ অনিবার্যভাবে উন্নত মানবীয় মূল্যমান হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। বর্তমান বিশ্বের অনেক স্থানে বিশেষ করে সেক্যুলার দেশসমূহে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে যৌনকর্ম চলছে। এ কারণে এইডস-এর মতো নানা মানবঘাতী রোগের বিস্তার ঘটছে। ফলে মানুষের পবিত্র বংশধারা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই বর্তমানে বিশ্বের বহু প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে ব্যভিচার পরিহার করে বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার কথা।

৪.২.৩. পারিবারিক বন্ধন : বংশধারা সংরক্ষণের জন্য পারিবারিক বন্ধন অপরিহার্য। অনুগত ও বিশ্বাসী স্ত্রী, বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান স্বামী, স্নেহশীল পিতা, মমতাময়ী মা এবং অনুগত রুচিবান সন্তান-সন্ততি নিয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সুদৃঢ় বন্ধন সম্পন্ন পরিবার সৃষ্টির মাধ্যমে বংশধারার পবিত্রতা রক্ষা করা সহজ হয়। বংশধারা রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি পারিবারিক বেষ্টনী। আইনগত, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও বংশানুক্রমিক মূল্যবোধের ওপর এই পরিবার পরিবেষ্টনীর ভিত্তি সংস্থাপিত। পারিবারিক পরিবেষ্টনী একটা ক্ষুদ্রায়তন সংস্থা। প্রচার ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এই পরিবার পরিবেষ্টনীর ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক পরিবেষ্টনীকে পবিত্র, সুশৃঙ্খল রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীকে নিজেদের কর্তব্য পালনে পূর্ণমাত্রায় আন্তরিক ও সদা তৎপর হতে হবে।[১]

বংশধারার বিস্তার ও তার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি স্থিতিশীল কাঠামো। নর-নারী ও শিশু সকলের প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠান। পরিবার হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান যা উক্ত উদ্দেশ্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে

---

[১]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯০।

www.pathagar.com

পারে। সেই দিকে ইঙ্গিত করে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।'[১]

৪.২.৪. নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার বৈধ নয় : বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্ত্রী তার স্বামীর শয্যায় যে সন্তান প্রসব করে, স্বামী তার পিতৃত্ব অস্বীকার করতে পারে না। পিতৃত্বের অস্বীকার যেমন বংশধারার পবিত্রতা নষ্ট করে তেমনি তা স্ত্রী ও তার সন্তান উভয়ের জন্য লজ্জার কারণ এবং তাদের জীবনের জন্য ক্ষতিকর। নিছক কুধারণা ও সন্দেহের কারণে সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা ইসলামী শরী'আহ্ সমর্থন করে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'সন্তান তার, যার বিছানো শয্যায় তার জন্ম হয়েছে।'[২] একইভাবে পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাও ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা একটি বড় অবিচার। কেননা, তারা ছোটবেলায় সন্তানকে পরম আদরে লালন-পালন করেছে আর আজ সে পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। এটা মানবজাতির জন্য লজ্জাকরও।

৪.২.৫. কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ সৃষ্টি : ইসলাম যেমন যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেয়াকে হারাম করে বংশধারার পবিত্রতা রক্ষা করেছে তেমনি স্বামীর শুক্রাণু ছাড়া অন্যের শুক্র দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ সঞ্চারের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেয়াকে অবৈধ করেছে। শায়খ শালতুত ফতোয়া দিয়েছেন, আসলে এ কাজ যিনা ছাড়া আর কিছু নয়, কেননা উভয়ের প্রকৃতি এক ও অভিন্ন।[৩] প্রকৃতপক্ষে স্বামীর শুক্র ছাড়া অন্যের শুক্র দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে সন্তান জন্ম দেয়ায় বংশধারার পবিত্রতা নষ্ট হয় এবং একজনের সন্তানের দায়দায়িত্বও অন্যের ওপর চাপানো হয়। এটা একটি মারাত্মক অপরাধ। ড. উমর চাপড়া বংশধারা সংরক্ষণ ও তার উন্নয়নের জন্য কতগুলো উপায় তুলে ধরেছেন। সেগুলো চিত্রের মাধ্যমে নিচে তুলে ধরা হলো :

---

[১]আল কুরআন, ৪ : ১।

[২]সহিহ্ আল বুখারি, কিতাবুল ফারায়িয, বাবু আল ওলাদু লিল ফারাশি ও সহিহ্ মুসলিম।

[৩]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৩১৪।

www.pathagar.com

চিত্র-৬

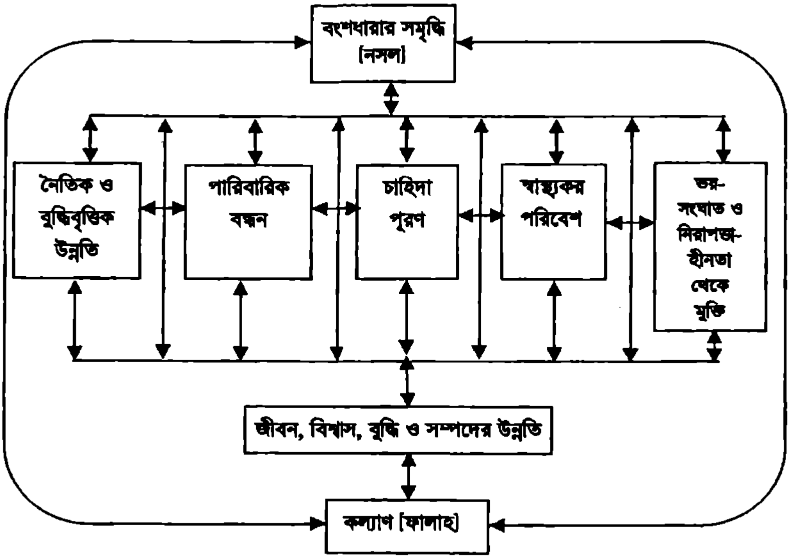

৫. হিফয আল-মাল (حِفْظُ الْمَالِ) বা সম্পদ সংরক্ষণ

হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ বলতে বুঝায় চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদ রক্ষা করা, ন্যায়নীতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেনদেন পরিচালনা করা এবং এমন হাতে তা আমানত রাখা যে হাত তা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে। আবার আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ অর্জনের যেসব পন্থা-পদ্ধতি হালাল করেছেন, তার বাইরে গিয়ে মানুষের সম্পদ গ্রাস না করাও হিফয আল-মালের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম গাযালি ও শাতিবি র. উভয়ই হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণকে পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের সর্বশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব কম। প্রকৃতপক্ষে সম্পদের গুরুত্ব এতই অধিক যে এটি ছাড়া অন্য চারটি উদ্দেশ্যের মাধ্যমে মানুষের পূর্ণ কল্যাণ সাধন করা যায় না। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাজি হিফয আল-মাল-কে হিফয আন-নফস-এর পরেই উল্লেখ করেছেন।[১]

---

[১]আল রাজি, আল-মাকসুল , ১৯৯৭, খ. ৫, পৃ. ১৬০। উদ্ধৃত : এম. উমর চাপড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

www.pathagar.com

৫.১. ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা

পার্থিব জীবনধারণের জন্য সম্পদ একান্ত প্রয়োজন। সমাজ ও সমাজভুক্ত প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল পর্যায়েই সম্পদের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সম্পদ ছাড়া জীবনের গতি স্থবির হয়ে আসে, উন্নয়নের চাকা থেমে যায়। সম্পদ ছাড়া অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয় না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও একই কথা প্রযোজ্য। প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে ব্যক্তি জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্য। ব্যক্তি দারিদ্র্যের প্রভাব সমগ্র জাতির ওপর পড়ে। এভাবে ব্যক্তিসমষ্টির দারিদ্র্যের প্রভাব গোটা জাতিকে সংকটাপন্ন করে তোলে এবং জাতি মান-মর্যাদা হারায়।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যও প্রয়োজন সম্পদ। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি, সাজ-সরঞ্জাম ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে আর তাদের ছাড়া অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা চেন না।'[১] এ আয়াতে শত্রুর মোকাবেলার জন্য সম্পদ থাকার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করা যায়।

সম্পদহীনতা দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। স্বেচ্ছায় দরিদ্র হয়ে থাকা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম ধনাঢ্যতাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত হিসেবে বিবেচনা করে এবং দারিদ্র্যকে বিপদ মনে করে তা থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেয়। ইসলামে সম্পদ প্রাপ্তিকে ইবাদতের অগ্রিম ফল হিসেবে চিত্রিত করতেও দেখা যায়।

অন্য দিকে দরিদ্র মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, চিন্তাচেতনা, পরিবার-পরিজন ও সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি সম্পদহীন মানুষ অভাবের দহনে দগ্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে কুফুরির পথে পা বাড়ায়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের পথে ধাবিত করে।'[২]

মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্পদ অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ, নিজের মৃত্যুর পরে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করা, বিপদাপদ থেকে নিজেকে বাঁচানো, দান-খয়রাত করা, ফকির-মিসকিনকে সাহায্য করা, আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা, শিল্প-কারখানা নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে সম্পদ অর্জন

---

[১]আল কুরআন, ৮ : ৬০।

[২]বায়হাকি।

www.pathagar.com

করা শুধু বৈধ নয়, বরং ছওয়াবের কাজও। মসজিদ-মাদ্‌রাসা, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল নির্মাণসহ নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে প্রয়োজন সম্পদ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সম্পদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। এ কারণে সম্পদের সঠিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করে সুফিয়ান র. বলেছেন, 'বর্তমানে সম্পদ হলো হাতিয়ারস্বরূপ।'[১]

সম্পদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার পক্ষে আরো কিছু দলিল-প্রমাণ :

ক. 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হলো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।'[২]

খ. 'আর তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।'[৩]

গ. 'সৎ ব্যক্তির জন্য হালাল সম্পদ কতই না উত্তম বস্তু।'[৪]

ঘ. নবী করিম স. আনাস রা.-এর জন্য দু'আ করে বললেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি তাঁর ধনসম্পদ বাড়িয়ে দাও।'[৫]

৫.২. সম্পদ সংরক্ষণের উপায়

হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ ইসলামী শারী'আহ্‌র মৌলিক ও চিরন্তন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত, যা জরুরিয়াতের পর্যায়ভুক্তও। হিফয আল-মাল পরিভাষাটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এটি মূলত সম্পদ অর্জন, উন্নয়ন ও বণ্টন, মূলধন গঠন, সম্পদের সঞ্চালনসহ পুরো সম্পদ ব্যবস্থাপনাকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে বহু দিক-নির্দেশনা রয়েছে এবং ইসলামী শরী'আহ্ এ ব্যাপারে বহু আইন-কানুন প্রণয়ন করেছে। এখানে তা থেকে ক'টি তুলে ধরা হলো :

৫.২.১. মালিকানা রক্ষার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি হলো তা কারো জিম্মায় বা মালিকানায় দিয়ে দেয়া। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ইসলামী শরী'আহ্‌তে সম্পদের মূল মালিক হচ্ছেন মহান

---

[১]তাফসিরে কুরতুবি, আয়াতুত দায়িন (সূরা আল বাক্বারাহ : আয়াত-২৮২-২৮৩)-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; উদ্ধৃত : ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা, জাবাল-এ-নূর প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ১০।

[২]আল কুরআন, ১৮ : ৪৬।

[৩]আল কুরআন, ৭১ : ১২।

[৪]মুসনাদে আহমাদ।

[৫]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুত দা'আওতি, বাবু দা'আওতিন নাবী স. লিখাদিমিহি বি তুলিল উমুরি...।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ কিন্তু উক্ত সম্পদ ব্যয়-ব্যবহারের মালিকানা মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে। অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়।'[১]

কোনো ব্যক্তি নিজের পরিশ্রম, মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে অধিক সম্পদ অর্জন করলে সে তার অধিকারী হবে। হালালভাবে অর্জিত কারো সম্পদ কেড়ে নেয়ার অধিকার সরকারকেও দেয়া হয়নি। সরকার কারো ব্যক্তিগত সম্পদ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে হুকুম-দখলের প্রয়োজন মনে করলে মালিকের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তা করতে পারে। মদিনায় মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছিল তার মালিক ছিল দুই বালক। তারা স্থানটি মসজিদের জন্য বিনামূল্যে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মহানবী স. তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী জমিটির মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করেছিলেন।[২]

সরকার কর্তৃক কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ র. তাঁর 'কিতাবুল খারাজ'-এ লিখেছেন, 'আইনসম্মত কারণ ছাড়া কারো ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের নেই।'[৩]

৫.২.২. সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি হলো মানুষের হাতে অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ-সম্পদ একত্র করে মূলধন গঠন করা। ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল অগ্রগতির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পুঁজি। আর পুঁজি যোগাড় করার মোক্ষম পদ্ধতি হলো সঞ্চয় করা। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত পুঁজি বা গচ্ছিত অর্থ দিয়ে বড় আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বড় ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে বৃহৎ পুঁজি গঠন করা।

আর্থিক সঙ্কট ও বাজারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা বৈধ নয় কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করা বৈধ।

---

[১]আল কুরআন, ৩৬ : ৭১।

[২]নঈম সিদ্দিকী, মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পৃ. ১৪৭; ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

[৩]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

www.pathagar.com

সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশনাগুলো হলো :

ক. 'আর তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না আবার তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করে একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।'[১]

খ. 'তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া অধিক উত্তম, তাদেরকে মানুষের মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়া থেকে।'[২]

গ. 'কিছু সম্পদ নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম।'[৩]

উল্লিখিত কুর'আনের আয়াত ও হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও আয়বৈষম্য সৃষ্টি করা, মানুষের ওপর নিজের অবৈধ প্রভাব বিস্তার করার মতো কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলে সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করা সওয়াবের কাজ। এ কারণে আমরা দেখি যে, নবী-রাসূল, ছাহাবি, তাবেয়ি ও ইসলামের জন্য নিবেদিত ব্যক্তিবর্গ সৎ উদ্দেশ্যে সম্পদ অর্জন করেছেন। এ বিষয়ে তাফসিরে কুরতুবিতে উল্লেখিত কিছু বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো[৪] :

ক. আবদুর রহমান ইবন 'আউফ রা. মৃত্যুর সময় বিপুল সম্পদ রেখে যান।

খ. হযরত ত্বালহা রা. মৃত্যুর সময় তিনশ উটের বোঝা পরিমাণ সম্পদ রেখে যান।

গ. হযরত জুবাইর ইবনুল 'আওয়াম রা. আড়াই লাখ টাকার সমপরিমাণ সম্পদ উত্তরাধিকারস্বরূপ রেখে যান।

ঘ. হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রা. চারশত স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান, যার বর্তমান মূল্য প্রায় দশ-বারো লাখ টাকা।

ইসলামে 'আমানত' পরিভাষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তার মূল্যবান অর্থকড়ি নিরাপদে অন্যের কাছে আমানত রাখে। এভাবে মানুষের হাতে বিক্ষিপ্ত ও অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ-সম্পদ একত্র করে মূলধন গঠানপূর্বক তা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখা যায়।

---

[১]আল কুরআন, ১৭ : ২৯।

[২]সহিহ্ আল বুখারি, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, বাবু কাওলিন নাবী স. আল্লাহুম্মা আমদি লি আসহাবি হিজরাতাহুম ওয়া মারসিয়াতিহি লিমান মাতা বি মাক্কা।

[৩]সহিহ্ আল বুখারি, কিতাবুল ওসায়া, বাবু ইযা তাসাদ্দাকা আও আওকাফা বা'আদা মালিহি...।

[৪]ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা, জাবাল এ-নূর প্রকাশনী, মার্চ ২০০৭, পৃ. ৯-১০।

www.pathagar.com

৫.২.৩. পবিত্রকরণের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

ব্যক্তি ও সমষ্টির ধন-সম্পদের ধ্বংস ও ঝুঁকি হ্রাসকরণের একটি পদ্ধতি হলো তা থেকে আল্লাহ্ ও গরিবের হক বের করার মাধ্যমে তা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। তাই ইসলামে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে তার জন্য তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ যেন গরিব, নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে : 'এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।'[১]

যাকাত, উশর, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র ও রক্ষা করা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا—'তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।[২]

ধনীর মালে গরিবদের অধিকারের সম্পর্ক খুবই দৃঢ় ও অবিছিন্ন। যাকাত মূল মালের মধ্যে শামিল। মূল মালটাই ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকবে যতক্ষণ না তা থেকে যাকাত বের করা হবে। নবী করিম স. বলেন, 'তুমি যখন তোমার মালের যাকাত দিয়ে দিলে তখন তা থেকে তুমি খারাবিটা দূর করে দিলে।'[৩] তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ যাকাত দ্বারা সংরক্ষিত করো।'[৪] 'যদি তুমি (যাকাত) বের করে না দাও তাহলে হারামটা হালালটাকে ধ্বংস করবে।'[৫]

৫.২.৪. সঞ্চালনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি পদ্ধতি হলো একে আটক না রেখে এর স্বাভাবিক সঞ্চালন নিশ্চিত করা। সমাজের কতিপয় ব্যক্তির হাতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত হওয়া ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ থাকার পরিবর্তে সুষম বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সকলের হাতে সম্পদের আবর্তনই শরী'আহ্র উদ্দেশ্য। আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'মহান আল্লাহ্ যা কিছু জনপদের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য, রাসূলের জন্য, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন ও পথচারীদের জন্যে, (সম্পদ

---

[১]আল কুরআন, ৫১ : ১৯।
[২]আল কুরআন, ৯ : ১০৩।
[৩]সহিহ ইবনে খুজাইমা, হাকিম।
[৪]সুনান আবু দাউদ, বায়হাকি ও তাবারানি।
[৫]উদ্ধৃত : ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, ইসলামের যাকাত বিধান , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১।

www.pathagar.com

এমনভাবে বণ্টন করো) যেন তা কেবল তোমাদের বিত্তশালী লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয়।'[১]

৫.২.৫. সম্পদ অর্জন ও এর উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আগে আসে তা অর্জন ও তার উন্নয়ন সাধনের কথা। মানুষের বৈধ চাহিদা পূরণ ও তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের সুযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের বিকল্প নেই। এ জন্য ইসলামী শরী'আহ্‌তে সম্পদ অর্জন, এর উন্নয়ন সাধন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সম্পদকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুযোগ ও সামর্থ্য থাকার পরও সম্পদ অর্জন না করার অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। এ জন্য ফরয ইবাদতসমূহ সম্পাদনের পরই প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব হালাল রিযিক অর্জন করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, 'অতঃপর যখন সালাত আদায় শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র তা'আলার অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করো।'[২]

'এবং আমি দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করতে পারো।'[৩]

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'অন্যান্য ফরয আদায়ের পর হালাল রুজি অন্বেষণ করাও একটি ফরয।'[৪]

কুরআন-সুন্নাহ্‌র উক্ত নির্দেশনা থেকে নির্দ্বিধায় বলায় যায়, কৃষিকাজ, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছারই বাস্তবায়ন।

সম্পদ অর্জন ও এর উন্নয়ন সাধনকে ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মৃত ভূমিকে জীবিত করবে; সে জমি তার জন্যই হবে।'[৫]

ড. উমর চাপড়া সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে যে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তা হলো :

---

[১]আল কুরআন, ৫৯ : ৭।
[২]আল কুর'আন, ৬২ : ১০।
[3]আল কুর'আন, ১৭ : ১২।
[৪]বায়হাকি, কিতাবুল ইজারা।
[৫]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল মুজারা'আত, বাবু মান আহইয়া আরদান মাওয়াতান।

www.pathagar.com

চিত্র-৬

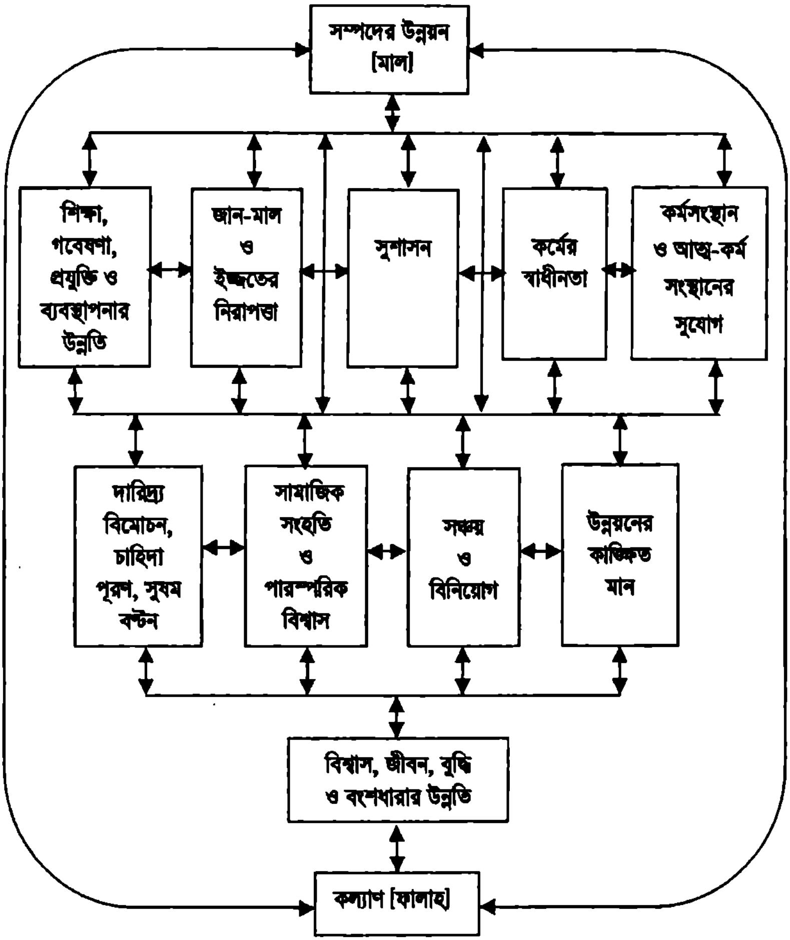

৫.২.৬. ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তাই তা ধ্বংস করার অধিকারও তার নেই। ইসলামী শরী'আহ্ মানুষকে সম্পদ অর্জন ও তা ভোগ করার অধিকার প্রদান করেছে এবং পাশাপাশি সকল ধরনের ক্ষতি, ঝুঁকি ও ধ্বংসের হাত থেকে সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাকে প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব অবহেলার কারণে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সম্পদ ধ্বংস না করার নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন:

www.pathagar.com

'আল্লাহ্ তা'আলা যে ধন-সম্পদ তোমাদের প্রতিষ্ঠালাভের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন, তা নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না।'[১]
'তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেরদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।'[২]

৫.২.৭. অন্যায় ও আত্মসাৎ থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি উপায় হলো তাকে অন্যায় ও আত্মসাৎ থেকে রক্ষা করা। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে উত্তম উপার্জন হচ্ছে তাই যা কোনো ব্যক্তি নিজের শ্রমশক্তি ব্যবহার করে অর্জন করে। অন্য দিকে ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিতে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করে সম্পদ অর্জন করা যাবে না যাতে অন্যের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ ন্যায়নীতি বহির্ভূত পন্থা যেমন সুদ, প্রতারণা, জুয়া, ধোঁকাবাজি ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে সম্পদ আহরণ করা বৈধ নয়।

ইসলামে হারাম বা অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন ও ব্যয় উভয়ই নিষিদ্ধ। আবার বৈধভাবে অর্জিত কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়াও অবৈধ। মহান আল্লাহ্ বলেন, لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ—'তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না।'[৩]

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলিমের রক্তপাত, ধন-সম্পত্তি হরণ ও মান-সম্মানের হানি করা হারাম।'[৪]

৫.২.৮. ভোগবিলাস ও অপচয় থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

মাত্রাতিরিক্ত ভোগবিলাস ও লাগামহীন অপচয় এক দিকে যেমন সম্পদ নষ্ট করে অন্য দিকে তা আবার অর্থনৈতিক মন্দা ডেকে আনে। তাই ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপরতা দূর হলে মানুষ অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনের জন্য লেগে থাকবে না এবং অপচয়ের মাধ্যমে তা নষ্টও করবে না। এ জন্য ইসলাম মানুষকে ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের পরিবর্তে সহজসরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। ইসলাম ঘোষণা করে, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا—'তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না', إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيَـٰطِينِ—নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।'[৫]

---

[১]আল কুরআন, ৪ : ৫।
[২]আল কুরআন, ২ : ১৯৫।
[৩]আল কুরআন, ৪ : ২৯।
[৪]সহিহ মুসলিম।
[৫]আল কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭।

www.pathagar.com

৫.২.৯. সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি ও দুর্নীতি থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

জীবনধারণের জন্য সম্পদ প্রয়োজন কিন্তু অনেক সময় ধনলিপ্সা ও উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহ মানুষকে স্বার্থবাদী করে তোলে। ফলে তারা দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, জবরদখল ইত্যাদি অবৈধ পন্থায় অগাধ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেবুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না।'[১]

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'ঘুষখোর ও ঘুষদাতা উভয়ের অবস্থান হবে জাহান্নাম।'[২] 'যে ধোঁকা বা প্রতারণা করে সে আমাদের দলের নয়।'[৩]

৫.২.১০. সম্পদের মূল্যমান রক্ষার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি পদ্ধতি হলো এর মূল্যমান রক্ষা করা। পণ্যদ্রব্য ও অর্থের মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি আবশ্যিক শর্ত। মূলত এর ওপরই আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে। ইসলামী শরী'আহ্তে অর্থকে পণ্য হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হলেও এর মূল্যস্তর রক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পণ্যদ্রব্য ও অর্থমূল্যের স্থিতিশীলতার ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'পরিমাপ ও ওযন পূর্ণ করো ন্যায্যভাবে।'[৪] 'আর তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ করো এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিয়ো না।'[৫] 'মাপ পূর্ণ করো এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'[৬]

রাসূলুল্লাহ্ স. এক ব্যক্তিকে খায়বরে তহসিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খায়বারের সকল খেজুরই কি এরূপ উত্তম?' লোকটি বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহর শপথ! সকল খেজুর এরূপ নয়। আমরা এগুলোর এক ছা' অন্যগুলোর দু' ছা'র বিনিময়ে এবং এগুলোর দু' ছা' অন্যগুলোর তিন ছা'র

---

[১]আল কুরআন, ২ : ১৮৮।
[২]তাবারানি।
[৩]সহিহ্ মুসলিম।
[৪]আল কুরআন, ৬ : ১৫২।
[৫]আল কুরআন, ৭ : ৮৫।
[৬]আল কুরআন, ২৬ : ১৮১।

www.pathagar.com

বিনিময়ে নিয়ে থাকি।' রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'এরূপ করবে না। বরং পাঁচমিশালি খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে উত্তম খেজুর উক্ত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করবে।'[১]

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ স. খেজুরের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটা করা না হলে উক্ত পণ্যের অবমূল্যায়নের আশঙ্কা থেকে যেত।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হাতিব ইবনে বালতাআর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন মদিনার বাজারে নিজের শুকনো আঙুর (বাজার মূল্য থেকে কম দামে) বিক্রি করছিলেন। উমর রা. তাকে বললেন, 'হয় মূল্য বাড়িয়ে দাও অথবা বাজার ছেড়ে উঠে যাও।'[২]

৫.৩. ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্

ইসলামী শরী'আহ্তে অর্থনীতিকে আলাদা কোনো বিষয় মনে করা হয় না; বরং এটিকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। ইসলামে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী অর্থনীতির অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে আয়বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস এবং পূর্ণ বিনিয়োগ, কাম্য উৎপাদন ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম র.-এর মতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য হলো[৩] :

- ক. আদল বা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।
- খ. আল মাসলাহা আল আম্মাহ্ বা জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা।
- গ. জনস্বার্থ ও সুবিচার বিরোধী কাজ প্রতিহত করা।

এখানে ইসলামী অর্থনীতির ক'টি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা করা হলো :

৫.৩.১. মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবনমান উন্নত করা : সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা এবং তাদের জন্য সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করা ইসলামী শরী'আহ্ভিত্তিক অর্থনীতির একটি উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেছেন, 'নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল বুয়ূ', বাবু ইযা আরাদা বাইয়ান তামরিন বিতামরিন খাইরিম মিনহু।

[২]মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল বুয়ূ' ফিত তিজারাত ওয়াস সালাম।

[৩]উদ্ধৃত : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৩৪।

www.pathagar.com

একটি প্রধান দায়িত্ব। বায়তুল মাল হতেই এই উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া বেকারত্ব দূর হবে না। এ জন্য সরকারকে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।'[১]

৫.৩.২. সর্বাধিক বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পূর্ণকর্মসংস্থান : মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর সব সম্পদ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে সে সম্পদের যথাযথভাবে ব্যবহার করবে। সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে পূর্ণকর্মসংস্থান এবং নিশ্চিত হবে সর্বাধিক উৎপাদন ও উন্নয়ন।

ইসলাম সম্পদের ওপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করেছে কিন্তু সে সম্পদ ফেলে রাখার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর তোমাদের ঐ সম্পদ নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিয়ো না যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন।'[২]

৫.৩.৩. অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম করা : ইসলামী অর্থনীতির একটি উদ্দেশ্য হলো আয় ও সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম করা। সব ধরনের অর্থনৈতিক জুলুম ও বল্গাহীন মুনাফা অর্জনের পথ বন্ধ করা। শুধু ব্যক্তিস্বার্থ নয়, বরং গোটা সমাজের কল্যাণ সাধন করাই ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য।

৫.৩.৪. সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা : ইসলামী অর্থনীতির একটি উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা। ইসলাম এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে সকলের সামাজিক অধিকার পূরণ হবে, কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না এবং সকলের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে ইসলামী সমাজে গড়ে উঠবে সাহায্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ।

সামাজিক সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পদশালীদেরকে তাদের সম্পদ থেকে যাকাতদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামে বাধ্যতামূলক এই যাকাতদানের পাশাপাশি ঐচ্ছিক দানের নির্দেশও রয়েছে যাতে ধনীদের সম্পদে অভাবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা কখনো নেকি অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন কিছু (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাস। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সবিশেষ অবহিত।'[৩]

---

[১]মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

[২]আল কুরআন, ৪ : ৫।

[৩]আল কুরআন, ৩ : ৯২।

www.pathagar.com

৫.৩.৫. অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধ করা : অর্থনৈতিক অস্থিরতা মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। কৃত্রিম মুনাফা, ফটকাবাজি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ (concentration), স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত হয়ে বারবার সর্বস্বান্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক মানুষ। ইসলামী অর্থনীতি সকল ধরনের অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধের মাধ্যমে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট থাকে।

অর্থনৈতিক মন্দা ও অস্থিরতা রোধে ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা। যেমন এম. উমর চাপড়া বলেন, 'ইসলামী পদ্ধতি সম্পদের সুষম বণ্টন, সঞ্চয় ও মূলধন গঠন, অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতাসহ অন্যান্য পরিকল্পনা ভালভাবে সম্পাদন করে।'[১]

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মন্দা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিকারের জন্য প্রতিরোধমূলক (preventive) ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সুদ, মুনাফাখোরি, মজুতদারি, ফটকাবাজি ইত্যাদি অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণ ইসলামে নিষিদ্ধ। আর্থিক লেনদেন ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টিকারী এসব উপাদানকে পরিহার করা হলে অর্থনৈতিক মন্দা তার ডানা বিস্তারে সক্ষম হবে না। অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো হলো :

এক. গারার বা অনিশ্চয়তা : গারার (غَرَرٌ) হলো কোনো ব্যবসায় অথবা ব্যবসায়িক চুক্তিতে কিংবা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। এ কারণে ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়কে বাই আল গারার বলা হয়। গারার বা অস্পষ্টতার কারণে ব্যবসাবাণিজ্য, স্টক ও শেয়ার বাজারে ফটকাবাজির উদ্ভব হয়। এটি দূর করা হলে ফটকাবাজি ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হবে না। ইসলামে গারার নিষিদ্ধ। 'রাসূলুল্লাহ্ স. গারার বা অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[২]

দুই. মাইসির বা জুয়া : মাইসির (مَيْسِرٌ) বা জুয়ার মাধ্যমে একপক্ষ অন্যায়ভাবে লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে মু'মিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং এগুলো বর্জন করো—যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[৩]

---

[১]ড. এম. উমর চাপড়া, টুয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারি সিস্টেম, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, লন্ডন, ইউকে, ১৯৮৫।

[২]মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, কিতুবুল বুয়ু ফিত তিযারাতি ওয়াস সালাম।

[৩]আল কুরআন, ৫ : ৯০।

www.pathagar.com

তিন. জাহালাহ্ বা অজ্ঞতা : জাহালাহ্ (جَهَالَةٌ) বা অজ্ঞতাও এক ধরনের গারার। জাহালাহ্ হচ্ছে এমন ধরনের লেনদেন যেখানে ক্রেতা জানে না যে, সে কী ক্রয় করছে অথবা বিক্রেতা জানে না যে, সে কী বিক্রয় করছে। জাহালাহ্র একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো বিক্রীত পণ্যের নির্দিষ্টতা, পণ্যের মূল্য, বিক্রয়ের সময় এবং কোথায় পণ্যটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে তা স্পষ্ট না থাকা। একইভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট না হলে সেখানেও জাহালাহ্র সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় এবং চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহ্কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, অনুমান করে পানির নিচের মাছ বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। কেননা, এখানে মাছের পরিমাণ অজ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, পানির নিচের মাছ বিক্রয় করো না। কেননা, এটি অনিশ্চিত বা গারার।[১]

চার. রিবা বা সুদ : রিবা (رِبًا) বা সুদ একটি বড় জুলুম। অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, আয়বৈষম্য বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবিচার সৃষ্টিতে সুদের জুড়ি নেই। এ কারণে ইসলাম চিরতরে সুদ নিষিদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا—'আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।'[২]

পাঁচ. বাই আদ-দাইন বা ঋণ বিক্রয় : ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করাকে বাই আদ-দাইন (بَيْعُ الدَّيْنِ) বলে। ডিসকাউন্টিং-এর ভিত্তিতে ঋণ বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা, 'রাসূলুল্লাহ্ স. ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৩]

ছয়. ইহতিকার বা মজুতদারি : মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুত করাকে ইহতিকার (اِحْتِكَارٌ) বা মজুতদারি বলা হয়। ফটকাকারবারী সস্তায় পণ্য কিনে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রয়ের জন্য তা মজুত করে। ফলে উৎপাদনকারী কম দামে পণ্য বিক্রয় করতে এবং ক্রেতা চড়া দামে তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ সংকটের সময় পণ্য মজুদ করে না।'[৪]

---

[১]মুসনাদে আহমাদ।

[২]আল কুরআন, ২ : ২৭৫।

[৩]ইবনে আবি শায়বা, ইসহাক ও বাযযায তাঁদের মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

[৪]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাহ্, বাবু তাহরিমিল ইহতিকার ফিল আকওয়াত।

www.pathagar.com

৫.৪. ইসলামী ব্যাংকিং-এ মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্

ইসলামী ব্যাংক তার কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহ্র নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। এ প্রক্রিয়ায় তার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সুদ পরিহার করে ও শরী'আহ্সম্মত পন্থায় মানবগোষ্ঠীর সম্পদের বৈধতা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করা, তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও জনগণের বৃহত্তর কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকের সকল কার্যক্রম নিবেদিত করা। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে :

এক. সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার, শোষণ, জুলম ও বৈষম্য দূর করা।

দুই. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সকল ব্যাংকিং কার্যক্রমে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

তিন. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া।

চার. মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সকলের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

পাঁচ. সুদের কুফল থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করে মুনাফাভিত্তিক একটি কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করা।

ছয়. সামষ্টিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

সাত. পুঁজি সমাবেশকরণ ও তা বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করা।

উক্ত উদ্দেশ্য ছাড়াও ইসলামী ব্যাংক তার কাজের সর্বস্তরে ইসলামী শরী'আহ্র সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ইসলামী ব্যাংক প্রধানত দু'ধরনের কাজ করে থাকে। সঞ্চয় গ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদান।

৫.৪.১. সঞ্চয় গ্রহণের ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্

ক. ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব হলো মুদারাবা ও অন্য জমাকারীদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণ করা।

খ. সঞ্চয় গ্রহণের ক্ষেত্রে ধনী ও গরিব সকলকে সমান সুযোগ প্রদান করা।

গ. মানুষের হাতে থাকা উদ্বৃত্ত ও অলস অর্থ-সম্পদ সংগ্রহপূর্বক মূলধন গঠন করে তা শরী'আহ্ অনুমোদিত পন্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন।

ঘ. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে নিম্ন আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আপৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করা।

www.pathagar.com

৫.৪.২. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্

সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র যেসব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তা হলো :

ক. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার : সম্পদ অলসভাবে ফেলে না রেখে তার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধনের প্রতি ইসলামে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন : 'যে ব্যক্তি কোনো সম্পদশালী ইয়াতিমের অভিভাবক হয়েছে, সে যেন তার সম্পদকে ব্যবসায় নিয়োজিত করে এবং ফেলে না রাখে। অন্যথায় যাকাতে তার সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে।'[১]

এমনকি ব্যক্তির কষ্টার্জিত সম্পদও রাষ্ট্র ক্রোক করে নিতে পারে যদি তা ফেলে রাখা হয়। নবী করিম স. 'আকিক' নামক স্থানের বিশাল জমির এলাকা বিলাল ইবনে হারিস রা.-কে চাষাবাদের জন্য দান করেছিলেন। উমর রা. তার খিলাফতকালে তাকে ডেকে বললেন, নবী করিম স. তোমাকে এই জমি বেকার ফেলে রাখার ও জনগণকে তা থেকে উপকৃত না হবার জন্য দান করেননি। বরং দিয়েছেন এ জন্য যে, তুমি তা আবাদ করবে। অতএব যে পরিমাণ জমি আবাদ করবার সামর্থ্য তোমার আছে তাই তুমি রাখো। অবশিষ্ট জমি সরকারের নিকট প্রত্যর্পণ করো।[২]

অতএব মানুষের হাতে পড়ে থাকা অলস ধন-সম্পদ সংগ্রহপূর্বক তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তাকে উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা ইসলামী ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

খ. ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ বিবেচনা : সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখে। ব্যক্তির জন্য খুবই লাভজনক কিন্তু সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন খাতে বিনিয়োগ মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র পরিপন্থি।

গ. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা : শুধু মুনাফা নয়, বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণের দিক থেকে অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করা শরী'আহ্র একটি উদ্দেশ্য।

৫.৪.৩. অংশীদারি কারবারের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ

ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল অগ্রগতির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পুঁজি। উৎপাদনের অন্যতম

---

[১]জামে আত-তিরমিযি, আবওয়াবুয যাকাত আন রাসূলিল্লাহ্ স., বাবু মা জায়া ফি যাকাতি মালিল ইয়াতিম।

[২]মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

www.pathagar.com

উপাদানও এই পুঁজি। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পুঁজি ও নিজের সীমাবদ্ধ যোগ্যতা দিয়ে সবসময় বড় আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বড় ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে বৃহৎ পুঁজি গঠন করা। বৃহৎ পুঁজি গঠনের একটি প্রধান মাধ্যম হলো অংশীদারি কারবার। এ অংশীদারি কারবারের মাধ্যমে অনেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে এবং সকলের যোগ্যতাকে সমন্বয় করে বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়। এতে করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল অংশীদার লাভবান হতে পারে। সর্বোপরি ইসলামী সমাজের ভ্রাতৃত্ব ও ভালো কাজে সহযোগিতার বিষয়টিও অংশীদারি পদ্ধতির মাধ্যমে বেড়ে যায়। তাই বলা যায়, মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামে অংশীদারি ব্যবসাকে বৈধ করা হয়েছে।

অংশীদারি কারবার থেকে ব্যক্তি ও সমাজ যেভাবে উপকৃত হতে পারে :

ক. অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধ : অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বভিত্তিক পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

খ. মুনাফা ও ক্ষতি ভাগাভাগি : অংশীদারি পদ্ধতির মূলনীতি হলো, ঝুঁকির সাথে লাভ এবং লাভের সাথে ঝুঁকি।'[১] এ নীতির আলোকে অর্থায়নকারীকেও ঝুঁকি বহন করতে হয়। ফলে ঝুঁকি শুধু উদ্যোক্তার প্রতি বর্তায় না। এভাবে লাখ লাখ অংশীদার লোকসান গ্রহণ করলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ কমই হয়, যা বহন করা প্রত্যেকের জন্য সহজ এবং কেউ দেউলিয়া হয় না।

গ. ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে বিনিয়োগ : সকল অংশীদার পুঁজি সরবরাহ ও ঝুঁকি বহন করে বলে বড় ধরনের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্ভব হয়।

ঘ. দক্ষতাপূর্ণ বিনিয়োগ বরাদ্দকরণ : অংশীদারি পদ্ধতিতে সরবরাহকারীগণ মূলধনের আনুপাতিক হারে ক্ষতি বহন করে বলে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকের দক্ষতা ও কারবারের উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করতে হয়। এ কারণে অনুৎপাদনশীল ও বিলাসিতামূলক খাতে বিনিয়োগের অর্থ ব্যবহারের সুযোগ খুব একটা থাকে না।

---

[১]জামহারাতুল কাওয়ায়েদিল ফিকহিয়্যা ফিল মু'আমালাতিল মালিয়া, খ. ১, সংকলক- ড. আলী আহমাদ নদভী, আলরাজী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, রিয়াদ, ২০০০, পৃ-১৮৩।

www.pathagar.com

৫.৪.৪. ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ

কোনো মানুষই এককভাবে নিজের সকল প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। একজনের কাছে হয়তো এক ধরনের পণ্য আছে কিন্তু তার প্রয়োজন অন্য ধরনের পণ্য। এই প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই পরস্পরের মধ্যে ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেন জরুরি। তাই বলা যায়, ক্রয়বিক্রয় ও ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যেই ইসলামী শরী'আহ্তে এটিকে বৈধ করা হয়েছে। ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : 'তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত নিহিত। বাকিতে বিক্রয়, মুকারাদাহ্ (মুদারাবাহ্) এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঘরে খাওয়ার উদ্দেশ্যে যবের সঙ্গে গম মেশানো।'[১]

সুদের বিনিময়ে ঋণের আদান-প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ। অর্থ ঋণ দিয়ে কৃত্রিম উৎপাদন সৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত লেনদেন ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতি অনুশীলনে প্রতিটি লেনদেন হয় বস্তুনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল। যে কারণে সমাজে কৃত্রিম অর্থ সৃষ্টির সুযোগ কমে যায় এবং আর্থিক মন্দা ও অস্থিতিশীলতার কবল থেকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পদ নিরাপদ হয়।

কৃত্রিম লেনদেন হ্রাসের জন্য ইসলামী শরী'আহ্ ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কতগুলো শর্ত আরোপ করেছে। একটি সহিহ বা বিশুদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের শর্ত হলো :

- ক. পণ্য বিক্রেতার অধিকারে আসার পূর্বে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।
- খ. বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় পণ্য নষ্ট হলে এর দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।
- গ. বিক্রীত পণ্য অবশ্যই বাস্তব হতে হবে, কাল্পনিক কিংবা কৃত্রিম হওয়া যাবে না।
- ঘ. লেনদেন অবশ্যই প্রকৃত (genuine) হতে হবে এবং পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে হতে হবে।
- ঙ. অস্তিত্বহীন, অজ্ঞাত ও হস্তান্তর অযোগ্য বস্তু ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত শর্তাবলি পরিপালিত হলে অর্থনীতি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোনো ধরনের আর্থিক সংকটই অর্থনীতিকে সহজে দুর্বল করতে পারে না।

---

[১]সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত।

www.pathagar.com

৫.৫. ইসলামী ব্যাংকিং, সামষ্টিক সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র সাথে আধুনিক যুগের সামষ্টিক সামাজিক দায়বদ্ধতা বা Corporate Social Responsibility বা CSR-এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক মুনাফা অর্জনের জন্য কাজ করলেও মানুষের কল্যাণে তার অনেক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়-দায়িত্ব পালন করা ইসলামী শরী'আহ্র একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বহু আয়াত ও হাদিস রয়েছে। সিএসআর-এর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক নিম্নের কাজগুলো সম্পাদন করতে পারে।

এক. ইসলামী ব্যাংক এমন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে না যা দেশ, জাতি ও সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও জনগণের স্বাস্থ্য হানির কারণ হয়।

দুই. অন্য দিকে সিএসআর-এর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ, প্রান্তিক শ্রেণি ও সুবিধাবঞ্চিতদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-চিকিৎসা-কৃষির মতো অগ্রাধিকার খাতগুলোকে গুরুত্ব দিতে পারে।

তিন. অগ্রাধিকারমূলক খাতের পাশাপাশি বিনিয়োগ বহির্ভূত ক্ষেত্রে দুর্যোগকালীন সাহায্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, দরিদ্র ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়কে ইসলামী ব্যাংকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

চার. ইসলামী ব্যাংক তার যাকাতযোগ্য সম্পদ ও সুদের সন্দেহযুক্ত বিভিন্ন আয়ের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমেও সামষ্টিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারে।

পাঁচ. ইসলামী ব্যাংক ডিপোজিটরদের অর্থ অধিক সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ করে, যাতে তাদের অর্থের সর্বাধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং সঙ্গত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।

ছয়. সাহিবুল মালের স্বার্থসংরক্ষণের পাশাপাশি এমন সব প্রকল্প হাতে নেয়া যাতে ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের স্বার্থও সংরক্ষিত হয়।

সাত. ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি সিএসআর-এর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত যাতে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে এবং নৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

আট. কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন, সহজ শর্তে ঋণ দান, অবকাশ যাপনের জন্য ছুটি, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

৫.৬. অমুসলিমদের সম্পদ সংরক্ষণ

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামী শরী'আহ্‌র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ্ স. তাঁর গোটা জীবনে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও তাদের সম্পদ সংরক্ষণের অধিকার বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি হুনায়ন যুদ্ধের সময় সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নিকট থেকে কয়েকটি বর্ম গ্রহণ করতে চাইলে সে বলল, 'হে মুহাম্মদ! এটা কি বলপূর্বক নেয়া হলো?' তিনি বললেন, 'না, বরং ধারস্বরূপ গ্রহণ করলাম। এর কোনো একটি নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।'[১]

খাইবার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম কেল্লা ঘেরাও করলে একজন রাখাল কেল্লার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। তার সাথে ছিল বকরির পাল। সে মুসলিম বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং একজনকে জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদ স. কোথায়? একজন তাকে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর তাঁবুটি দেখিয়ে দিল। রাখালটি বলল, আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি যে, খেজুর পাতার তৈরী এই মামুলি ঝুপড়ির মতো তাঁবুতে তিনি অবস্থান করছেন। তাঁর মতো একজন বড় নেতা, এত বড় একজন নবী এই ক্ষুদ্র তাঁবুতে থাকবেন কেন? আমি তাঁবুর ভেতরে ঢুকলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কী পয়গাম নিয়ে আগমন করেছেন? তিনি আমাকে একত্ববাদ সম্পর্কে বললেন। আমি বললাম, যদি এই পয়গাম গ্রহণ করি তাহলে আমার কী হবে? রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বুকের সাথে মিলিয়ে নেব। তুমি তখন আমার ভাই হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এখন অন্যরা যে অধিকার পাচ্ছে, সুযোগ পাচ্ছে, তা তুমিও পাবে।

রাখাল বলল, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? আমি একজন ক্রীতদাস। আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর আমাকে বুকের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন? অথচ আমি যেখানে আছি সেখানে সর্বত্রই হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছি, নিগৃহীত হচ্ছি। সেখানে সামান্যতম মর্যাদার কথাও কল্পনা করতে পারি না। আচ্ছা বলবেন কি, আপনারা কেন আমাকে বুকের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন? রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, আমরা সবাই এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আমাদের ছোট ও বড়'র মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। কাজেই তুমি যদি মুসলিম হয়ে যাও, তাহলে তুমি আমাদের ভাই হয়ে যাবে। ভাই হিসেবে আমরা তোমাকে বুকের সাথে মিলিয়ে নেব। সে বলল, আচ্ছা আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে আমার পরিণতি কী হবে?

---

[১]আমীন আহ্‌সান ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসাত, ১৯৫০, পৃ. ১৩; ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি যদি এই যুদ্ধেই শাহাদাত বরণ করো তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমার চেহারার এই কৃষ্ণবর্ণ দূর করে দেবেন। তোমার মুখমণ্ডল হবে আলোকোজ্জ্বল। তোমার শরীরের দুর্গন্ধকে সুগন্ধিতে পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। এ কথা শুনে সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং বলল, এখন আমি তো মুসলিম, আমাকে যা নির্দেশ দেবেন আমি তাই অনুসরণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ স. সর্বপ্রথম তাকে যে নির্দেশ দিলেন তা হলো– দেখ! তোমার সঙ্গে যে বকরির পাল রয়েছে তা তোমার নয়, এগুলো তোমার মালিকের। প্রথমে এগুলো তার কাছে ফেরত দিয়ে এসো, তারপর তোমাকে তোমার কর্তব্য সম্পর্কে বলব।[১] এখানে শিক্ষণীয় হলো যুদ্ধের ময়দানে হলেও রাসূলুল্লাহ্ স. শত্রুপক্ষের সম্পদ বেআইনিভাবে গ্রহণ করেননি।

খলিফা উমর রা.-এর আমলে এক ইহুদির একখণ্ড জমি একজন মুসলিম অন্যায়ভাবে দখল করে এবং সেই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এই খবর শুনে খলিফা নিজে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং ঐ জমি ইহুদিকে ফিরিয়ে দিতে বললেন। 'বায়তুল ইয়াহুদ' নামে ঐ ভবনটি এখনো বিদ্যমান রয়েছে। লেবাননের একজন খৃস্টান পণ্ডিত প্রফেসর কারদাহি ১৯৩৩ সালে ইসলামের ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে প্রদত্ত লেকচার সিরিজে বিষয়টি স্বীকার করেন।[২]

অমুসলিমদের সম্পদ সংরক্ষণে উমর ইবনে আবদুল আযিয র.-এর শাসনকালের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর একটি হলো, জনৈক উমাইয়া শাসক মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য একটি গির্জা দখল করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযিয র.-এর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করা হলো তখন তিনি মসজিদের উক্ত অংশ ভেঙ্গে ফেলার এবং গির্জাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আদেশ জারি করলেন। কিন্তু খৃস্টানগণ নিজেরাই আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণই অধিক পছন্দ করল।[৩]

ইসলামী আইনে হারাম বস্তু 'মাল'-এর সংজ্ঞাধীন নয়। যেমন শূকর, মদ ইত্যাদি। কিন্তু যেসব ধর্মে এগুলোকে মাল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে সেসব রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। 'কোনো মুসলিম তাদের এসব সম্পত্তির ক্ষতি করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।'[৪]

---

[১]মুফতি তকি উসমানি, ইসলাহী খুতুবাত, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, খ. ২, ২০১২, পৃ. ২১৫।
[২]মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
[৩]প্রাগুক্ত।
[৪]দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২৭৩-২৭৪; ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩।

www.pathagar.com

৫.৭. অমুসলিমদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা শুধু মুসলিমদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম জনসাধারণও বায়তুল মাল থেকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সাহায্য পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ স., উমর রা. ও উমর ইবনে আবদুল আযিয র.-এর আমল থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। উমর রা. জাতীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে জিম্মিদের ব্যাখা দিতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহ্র শপথ! আমি জীবিত থাকলে সানআর পার্বত্য অঞ্চলে মেষ চালকও স্বস্থানে বসে তার অংশ পেয়ে যাবে তার চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ ব্যতিরেকে।'[১] উমর রা.-এর এ বাণী থেকে প্রমাণিত যে, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারীর অবস্থান যত দূরেই হোক বা তার মান-মর্যাদা যত কমই হোক, বায়তুল মাল থেকে তার অধিকার ও প্রয়োজন অনুসারে তার প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেয়া ইমামের অবশ্য কর্তব্য।[২]

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ইরানের হিরাবাসী খৃস্টানদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন সেখানে অমুসলিমদের দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি ও বয়সকালের নিরাপত্তার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে, 'যদি কোনো বয়স্ক ব্যক্তির কর্মক্ষমতা কমে যায় বা বিপদ-আপদে আক্রান্ত হয় অথবা কেউ ধনী থেকে দরিদ্র হয়ে যায় এবং তার ধর্মীয় লোকদের সাদাকার মুখাপেক্ষী হয়ে যায় তাহলে তাকে জিয্ইয়া দিতে হবে না বরং সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে।'[৩]

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযিয র. বসরার 'আদি বিন আরতার-এর কাছে যে পত্র লিখেছিলেন সে পত্র থেকে অমুসলিমদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। উক্ত পত্রে উল্লেখ ছিল, তুমি লক্ষ রাখবে 'আহলে জিম্মা' বা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের কেউ বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছে কিনা, দুর্বল হয়েছে কিনা, কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কিনা। হয়ে থাকলে মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে তাদের উপযুক্ত অনুদান প্রদান করো। কারণ আমি জানতে পেরেছি যে, আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আহলে জিম্মার ভিক্ষারত এক বৃদ্ধলোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। প্রথমে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু দান করেন,

---

[১]ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২১২; মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

[২]নাইলুল আওতার, খ. ৮, পৃ. ৭৯।

[৩]ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৪৪।

www.pathagar.com

অতঃপর বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষকে ডেকে এনে তাকে এবং তার মতো অন্যান্য অভাবীকে দৈনিক ভাতা নির্ধারণের নির্দেশ দেন এবং বলেন, 'আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাদের যৌবনকালে তাদের থেকে জিয্ইয়া আদায় করে ভোগ করব আর তাদের বার্ধক্যে তাদেরকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব–এটা কখনো ইনসাফ বা ন্যায়বিচার হতে পারে না। সাদাকাহ্ তো নিঃসন্দেহে অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের জন্য। আর এ হচ্ছে আহ্লি কিতাবের নিঃস্ব ব্যক্তি।'[১]

উমর রা. দামেস্ক সফরকালে একস্থানে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত কিছু খৃস্টানকে দেখতে পান। সে সময় তিনি সরকারি ধনভাণ্ডার থেকে তাদেরকে সাহায্য ও জীবনজীবিকা সরবরাহের নির্দেশ দেন।[২]

উমর ইবনে আবদুল আযিয র. ইরাকের গভর্নর আব্দুল হামিদ ইবনে আব্দুর রহমানকে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'জনগণকে তাদের ভাতা দিয়ে দাও'। এই পত্রের জবাবে গভর্নর লিখেন, 'আমি জনগণের নির্ধারিত ভাতা পরিশোধ করেছি এবং তারপরও বায়তুল মালে অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে।' তদুত্তরে উমর ইবনে আবদুল আযিয র. লিখলেন, 'এখন ঋণগ্রস্ত লোকদের তালাশ করো, তারা অপব্যয় কিংবা অসৎ কাজের জন্যে ঐ ঋণ গ্রহণ না করলে বায়তুল মালের উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও।' জবাবে গভর্নর খলিফাকে লিখেন, 'আমি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করেছি। অথচ এখনো বায়তুল মালে যথেষ্ট অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে।' জবাবে খলিফা তাকে লিখলেন, 'এখন অবিবাহিত যুবকদের তালাশ করো, যারা সম্বলহীন এবং যারা পছন্দ করে যে, তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও। তাহলে তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও এবং মোহর আদায় করো।' জবাবে গভর্নর লিখলেন, 'আমি তালাশ করে অবিবাহিত যুবক পেয়েছি এবং তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু এখনো বায়তুল মালে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে।' খলিফা উত্তরে লিখলেন, 'এখন তালাশ করো যাদের ওপর জিয্ইয়া ধার্য করা হয়েছে কিন্তু অর্থাভাবে জমি চাষাবাদ করতে পারছে না। এসব জিম্মিদের এতটা পরিমাণ ঋণ দাও যাতে তারা তাদের ভূমি সঠিকভাবে চাষাবাদ করতে পারে। কেননা, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এক-দুই বছরের জন্য নয়।'[৩]

ইমাম আবু ইউসুফ র. অমুসলিমদের অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বলেন, 'মিসকিন, অন্ধ, বৃদ্ধ, ধর্মজাযক, উপাসনালয়ের কর্মচারী, স্ত্রী ও শিশুদের জিয্ইয়া

---

[১] ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকি, ইসলাম কা নাযরিয়ায়ে মিলকিয়াত, ১৯৮৬, খ. ২, পৃ. ১১০; সাইয়েদ কুতুব শহীদ র., বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১৭৭-৭৮।

[২] সাইয়েদ কুতুব শহীদ র., বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১ ৭৮।

[৩] কিতাবুল আমওয়াল, খ. ১, পৃ. ৪১৪; মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৮৭।

www.pathagar.com

কর থেকে মুক্তি দিতে হবে। জিম্মিদের সম্পত্তি ও পশুপালনের ওপর কোনো কর ধার্য করা যাবে না। কর আদায়ের ক্ষেত্রে তাদেরকে মারপিট করা জায়েয নেই। জিয্ইয়া প্রদানে অস্বীকৃতির শাস্তি হিসেবে বড় জোর তাদেরকে শুধু আটক করা যাবে। নির্ধারিত জিয্ইয়ার অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হারাম। অচল-অক্ষম ও অভাবী জিম্মিদের লালন-পালন সরকারি ভাণ্ডার থেকে করা উচিত।'[১]

৫.৮. অমুসলিমদেরকে সাদাকাহ্ ও যাকাতের অর্থ প্রদান

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদেরকে যাকাত ও সাদাকাহ্‌র অর্থ দেয়া প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন[২]। এখানে তা থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো :

অমুসলিমদেরকে নফল দান-খয়রাত করার ক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ নেই যতক্ষণ না তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুধ্যমান হবে। এটা মানবতা ও মানবিকতার দৃষ্টিতেও যুক্তিযুক্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করেত নিষেধ করেন না যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বেরও করে দেয়নি।'[৩]

এ ছাড়া মুসলমানগণ যখন তাঁদের বংশের ও আত্মীয় মুশরিক লোকদেরকে দান-সাদাকাহ্ দেয়াটা অপছন্দ করছিলেন। তখন তাঁরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ স.-কে অবগত করলে তিনি তাঁদের অনুমতি প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় :[৪]

'আর তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে থাক। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করো তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।'[৫] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির র. বলেন, 'সাদাকাহ্ দানকারী যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে, তা হলে তাতেই শুভ ফল আল্লাহ্ তা'আলা দেবেন; কিন্তু তা কে পেল, সে নেককার পরহেজগার ব্যক্তি, না পাপী, সে তা পাওয়ার যোগ্য কি অযোগ্য–এ ব্যাপারে তার ওপর কোনো দায়িত্ব নেই।'[৬]

---

[১] ইমাম আবু ইউসুফ র., কিতাবুল খারাজ, আল-মাতবা'আসুস সালাফিয়্যাহ, মিশর, পৃ. ১২২-১২৬।

[২] ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, ইসলামের যাকাত বিধান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫-২১০।

[৩] আল কুরআন, ৬০ : ৮।

[৪] তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা মুমতাহিনার ৮ নং আয়াতের তাফসির দ্র.।

[৫] আল কুরআন, ২ : ২৭২।

[৬] ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, ইসলামের যাকাত বিধান , প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা, মুহাম্মদ র. ও আরো কিছু ফকিহ সাদকাতুল ফিতর, ক্বাফ্ফারা ও মানতের অর্থ 'জিম্মি'দের দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা যেসব আয়াতে সাদাকাহ্ (২ : ২৭১), কাফ্ফারা (৫ : ৮৯) ব্যয়ের খাত উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে মুসলিম ও অমুসলিম মিসকিনদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা তারতম্য করা হয়নি বলে মন্তব্য করেন।

যাকাতের অর্থ অমুসলিমদের দেয়া যাবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে উমর রা. একজন বৃদ্ধ ইহুদির জন্য বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সাহায্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর দলিল ছিল কুরআনের যাকাত বণ্টনের আয়াত (৯ : ৬০) যেখানে ফকির-মিসকিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে আবি শায়বা উমর রা. সম্পর্কিত বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন, 'এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, উমর রা. আহলি কিতাবের লোকদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয মনে করতেন। আল মানার তাফসিরকারকও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তারা কুরআনে 'আল ফুকারা' শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক বলে মনে করেন। কেউ কেউ জিম্মিদেরকে যাকাত দেয়ার ব্যাপারে এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, যাকাতদাতা যদি যাকাত গ্রহণকারী মুসলমান না পায়, তবেই তা জায়েয হবে।[১]

ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, যারা বলেছেন, জিম্মিদের যাকাতের সম্পদ দেয়া যাবে না, তার অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে অনশন ও বস্ত্রহীনতার মধ্যে রেখে তিল তিল করে মরতে দেয়া হবে। কখনই নয়। তাদেরকে বায়তুল মালের অপরাপর আয়–যেমন ফাই, গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ, খনিজ সম্পদ, খারাজ প্রভৃতি থেকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। আবু উবাইদ তাঁর 'আল-আমওয়াল' গ্রন্থে উমর ইবনে আবদুল আযিয র.-এর লিখিত ফরমানের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, তাতে ছিল : 'তোমার নিজের দিক থেকে জিম্মিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর; যাদের বয়স বেশি হয়ে গেছে, শক্তিহীন বা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাদের কামাই-রোজগার সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এরূপ লোকদের জন্যে মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সাহায্য চালু কর। সত্য কথা এই যে, তিনি জিম্মিদেরকে সাহায্য চাওয়া ও অপেক্ষায় রাখাটা পছন্দ করেননি। বরং খলিফাতুল মুসলিমিন নিজেই আঞ্চলিক প্রশাসককে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তাদের দাবি-দাওয়া জানবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন বায়তুলমাল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করা যায়। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের সুবিচার।'[২]

---

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

[২]ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, ইসলামের যাকাত বিধান , প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

www.pathagar.com

৬. ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন

ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা ইসলামী শরী'আহ্‌র সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরী'আহ্ হলো সেই জীবনবিধান ও নীতিমালা যা মহান আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য প্রণয়ন, প্রবর্তন ও বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এর উদ্দেশ্য হলো মানুষেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনে তদনুযায়ী জীবনযাপন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

৬.১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য : মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা আর তিনিই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ— 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।'[১] ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন।'[২] তিনি আরো বলেছেন, আর আমি তোমার আগে এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি তার প্রতি এই অহি ছাড়া যে, 'আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, কাজেই আমার ইবাদত করো।'[৩]

উক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহগণকে তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬.২. ইবাদতের উদ্দেশ্য : আল কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব সফলভাবে সম্পাদনের জন্য তাকে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করতে হয়, তেমনি তাকে জীবজন্তুর মতো পাশবিকতা থেকে মুক্ত হতে হয়। এ লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে যেমন নফসের পরিশুদ্ধি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধন। আর মানুষের শরীর ও মনের পরিশুদ্ধির জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে নানান ইবাদত।

ইসলামের প্রত্যেকটি ইবাদতের একটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে নফসকে পরিমার্জিত করা ও সামাজিক বন্ধনসমূহকে সুদৃঢ় করা। মানবহৃদয়কে কলুষমুক্ত করে মুমিনের সাথে মুমিনের বন্ধুত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও রয়েছে ইবাদতের ভূমিকা। ইবাদতের মাধ্যমে সমাজ থেকে জুলুম ও অশ্লীলতা দূর করা ইসলামী শরী'আহ্‌র আরো একটি উদ্দেশ্য।

ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ যেমন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তেমনি সে জাগতিক কল্যাণও অর্জন করতে পারে। ইসলামের প্রধান ইবাদতগুলোর মধ্যে

---

[১]আল কুরআন, ৫১ : ৫৬।
[২]আল কুরআন, ২ : ২১।
[৩]আল কুরআন, ২১ : ২৫।

www.pathagar.com

রয়েছে সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্ব। এই ইবাদতগুলো এর সম্পাদনকারীর পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

মানুষের একটি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো সে সাধারণত ছোটকে সম্মান করতে চায় না। সে সবসময় বড়কেই সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকে। বাস্তব জীবনে সে নিজের চেয়ে বড় কারো কথায় নিজেকে পরিচালিত করতে ভালোবাসে। আল্লাহ্ মহান, তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। তাই তিনি মানুষকে তাঁর ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন, যার মাধ্যমে মানুষ পার্থিব কল্যাণও অর্জন করতে পারে। আবার এমন অনেক কল্যাণকর কাজও রয়েছে যেগুলো সরাসরি ইবাদত না হলে মানুষ তা করতে হয়তো ততোটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো না। কিন্তু কল্যাণকর বিভিন্ন কাজকে ইবাদতের মর্যাদায় ভূষিত করার কারণে মানুষ তা বাধ্যতামূলকভাবে সম্পাদন করে থাকে। ফলে ইবাদতকারী নিজের অজান্তেই সেই ইবাদতের সঙ্গে জড়িত কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হয়। যেমন, ওষুধ উপকারী কিন্তু অনেক শিশুই আছে যারা ওষুধ খেতে চায় না। এসব শিশুকে চিনির সাথে ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। ফলে ঐ শিশু চিনির পাশাপাশি ওষুধের উপকারিতাও লাভ করে। একইভাবে ইবাদতের মাধ্যমে বান্দাহ্ মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পাশাপাশি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণও অর্জনে সক্ষম হয়।

৬.৩. ইবাদত একটি ব্যাপক ধারণা : উলামায়ে কিরাম ইবাদতের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সবগুলো সংজ্ঞার সমন্বয় লক্ষ করা যায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. প্রদত্ত সংজ্ঞার ভেতর। তিনি বলেছেন, 'ইবাদত যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা ও কাজের নাম, যা মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট।'[১]

ইসলামে ইবাদতের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইবাদতকে সীমিত করা হয়নি; বরং যে কোনো নিষ্ঠাপূর্ণ সৎকাজ, আল্লাহ্র হুকুম পালনার্থে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হলে তাকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এ জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হয়। বস্তুত প্রকৃত ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, নির্দোষ অবকাশ যাপন, এমনকি যাবতীয় জাগতিক কাজ– যা মানুষের দৈহিক চাহিদা মেটায় এবং ইন্দ্রিয় সুখানুভূতিমূলক কাজ, সবকিছুই ইবাদত হিসেবে গণ্য।[২]

---

[১] تعريف العبادة -http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=130ae6d2fedb4a95 ।

[২] মুস্তাফা আহমদ আল যারকা, ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত, খুরশিদ আহমদ, ইসলামের আহ্বান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ১১০।

www.pathagar.com

কারো কারো মাঝে ইবাদত সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে, কেবল ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্বের মতো কাজগুলোই ইবাদত এবং এগুলোই কেবল আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কিন্তু ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। শরী'আহ্ নির্দেশিত পন্থায় ও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের সকল কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে ব্যথিত মানুষের ব্যথা দূর করা, দুঃখীর অশ্রু মুছে দেয়া, ভারগ্রস্তের ভার লাঘব করা, ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবারণ করা, মজলুমের জুলুম দূর করা, ঋণগ্রস্তের ঋণের বোঝা লাঘব করা, পথহারাকে পথ দেখানো, পথের কাঁটা দূর করা, কোনো প্রাণীর কষ্ট দূর করা ইত্যাদি সকল সৎকাজই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়। এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে ইসলাম ঈমান ও ইবাদতের মধ্যে শামিল করে ছওয়াব পাওয়ার উপায় সাব্যস্ত করে।

যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : 'প্রত্যেক সুস্থ মানুষের ওপর প্রতি সূর্যোদয়ের দিনে সাদাকাহ্ করা কর্তব্য রয়েছে। দু'জনের মধ্যে সুবিচার করা সাদাকাহ্ বলে গণ্য হবে। কোনো মানুষকে তার পশুর ব্যাপারে সাহায্য করা বা তাকে তার পিঠে ওঠাতে সহযোগিতা করা অথবা তার পিঠের ওপর মালামাল তুলতে সাহায্য করা সাদাকাহ্ বলে গণ্য হবে। ভালো কথা সাদাকাহ্ বলে গণ্য হবে। সালাতের জন্য যতো কদম এগুবে প্রত্যেক কদম সাদাকাহ্ বলে গণ্য হবে। রাস্তা হতে কাঁটা সরাবে তাও সাদকাহ বলে গণ্য হবে।'[১]

মানুষের দেহে তিনশ' ষাটটি জোড়া রয়েছে। তাকে তার প্রতি জোড়ার জন্য একটি সাদাকাহ্ করতে হবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তা কে আদায় করতে পারবে?' আসলে তাঁরা তাকে আর্থিক সাদাকাহ্ মনে করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'মসজিদে কেউ থুথু ফেললে তা দাফন করে ফেলো এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও' (তা সাদাকাহ্ বলে গণ্য হবে)।[২]

'নিশ্চয় মানুষ মহৎচরিত্রের গুণে রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনে রোযাদারের মর্যাদা পায়।'[৩]

'আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপকারী। আর আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো, এমন আনন্দ যা তুমি কোনো মুসলমানের অন্তরে প্রবেশ করিয়েছ, কিংবা তার কোনো কষ্ট দূর

---

[১]সহিহ আল বুখারি ও সহিহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু বায়ানি আন্নাসমাস সদাকাহ ইয়াকাউ আলা কুল্লি নাউয়িম মিনাল মা'রুফ।

[২]সুনান আবু দাউদ।

[৩]মুসনাদে আহমাদ।

www.pathagar.com

করেছ, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছ, বা তার ক্ষুধা নিবারণ করেছ। আমি যদি আমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে যাই, তাহলে এটা আমার মসজিদে এক মাস ই'তিকাফ করার চেয়ে শ্রেয়।'[১]

প্রকৃতপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ্‌তে বর্ণিত ইবাদত সংক্রান্ত সকল বর্ণনা সমন্বয় করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইবাদত সমগ্র দীনের অনুসরণের নাম। দীনের কোনো অংশই তা স্তবস্তুতি ধরনের হোক আর আনুগত্য ধরনের হোক- এ কথা বলা যাবে না যে, এটা ইবাদতের কাজ নয়।

৬.৪. আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মর্যাদা ও গুরুত্ব : মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সকল কল্পনা ও কাজই ইবাদত। তাই বলে আনুষ্ঠানিক বা নিরেট ইবাদতকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোনো যুক্তি নেই। কেননা, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্বের মতো আনুষ্ঠানিক ইবাদতকে ইসলামের স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এগুলো প্রকৃত ঈমানদার ও ধর্মবিরোধীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে দেয়।

কেউ কেউ অত্যাবশ্যকীয় নিরেট ইবাদতের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে বলে যে, অন্তরের বিশুদ্ধতা, সদিচ্ছা, মানুষের উপকার করা ইত্যাদিই মূলত ঈমানের মূল ভিত্তি, এখানে নামায-রোযার তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। তাদের এমন ধারণা মূলত ইসলামকে বিকৃত করার নামান্তর এবং কুফুরির শামিল। কারণ, তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিলে একজন প্রকৃত ধর্মবিরোধী ব্যক্তিও দুনিয়াবি কিছু ভালো কাজ করে নিজেকে বড় ঈমানদার হিসেবে দাবি করার সুযোগ পাবে।

৬.৫. ইবাদতের কল্যাণ পায় ইবাদতকারী নিজে : ইবাদত করা হয় আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে কিন্তু এর উপকার ও কল্যাণ পায় ইবাদতকারী নিজে। ইবাদতের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কল্যাণের কোনো উপকারিতাই আল্লাহ্ তা'আলার দিকে যায় না। সকল কল্যাণের উপকারিতা বান্দাহর জন্য নির্ধারিত। আর মানবিক স্বার্থের দাবিও এটিই। কারণ প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে নিজের কল্যাণ কামনা করে। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম তাঁর 'আল মাকাসিদুল আম্মা লিশ্ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ' গ্রন্থে লিখেছেন : যখন সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য হয় সৃষ্টজীব তাঁর ইবাদত করবে, তখন উদ্দেশ্যের ফলাফল উদ্দেশ্য পোষণকারীর দিকে আসতে বাধ্য নয়। এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ বিশ্ব-জাহানের কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ

---

[১]তাবরানি।

www.pathagar.com

إِنَّ النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ—'হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।'[১]

কেউ ইবাদত করুক আর না করুক তাতে আল্লাহ্ তা'আলার কোনো লাভ-ক্ষতি নেই। ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য করা হয় কিন্তু এর কল্যাণ ইবাদতকারীর নিজের জন্য। 'আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কাছে আনুগত্য দাবি করেন তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য নয়; বরং মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি তা চাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌র মতো নন, দুনিয়ার রাজা ও রাজকর্মচারীগণ তো মানুষকে শুধু নিজেদের মর্জির গোলাম বানাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কোনো স্বার্থ নেই, তিনি সকল রকম স্বার্থের নীচতা হতে পবিত্র।... তিনি মানুষকে তাঁর হুকুম মেনে চলতে ও তাঁর আনুগত্য করতে বলেন, শুধু তাদের মঙ্গলের জন্য... তাদের কল্যাণ করতে চান তিনি।'[২]

৭. ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধন

ইসলামী শরী'আহ্ ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। ফলে দুনিয়াকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে চায় যাতে দুনিয়া যথার্থই আখিরাতের শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় এবং মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণলাভে সমর্থ হয়।[৩] এই কল্যাণলাভের জন্য মানুষকে প্রচেষ্টা সাধনের আহ্বান জানিয়ে মহান আল্লাহ্ তাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। তা হলো : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً—'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও।'[৪]

৭.১. কল্যাণের ধারণা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী : ইসলামী শরী'আহ্ যে কল্যাণ সাধনের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে সে কল্যাণ ইহকাল ও পরকালব্যাপী বিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে শরী'আহ্‌র বিধানসমূহ সকল প্রকার ইহকালীন, পরকালীন, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। ইসলামী শরী'আহ্ এমন কোনো দুনিয়ার ধারণা দেয় না যার সাথে আখিরাতের সম্পর্ক নেই। আবার এমন কোনো আখিরাতের ধারণা দেয় না যার সাথে দুনিয়ার সম্পর্ক নেই। ব্যষ্টি

---

[১]আল কুরআন, ৩৫ : ১৫।

[২]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৮৩।

[৩]ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, আল মাকাসিদুল আম্মা লিশ্ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ। আরো দেখুন, ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ২, সংখ্যা ৫, ২০০৬, পৃ. ১৫।

[৪]আল কুরআন, ২ : ২০১।

www.pathagar.com

বা ব্যক্তি হচ্ছে অংশ ও অঙ্গ এবং সমষ্টি বা সমাজ হচ্ছে সমগ্র ও দেহ। ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এ অবস্থায় ইসলামী শরী'আহ্ মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনে ভারসাম্য পদ্ধতি অনুসরণ করে। আবার এই পদ্ধতি দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যেও ভারসাম্য সৃষ্টি করতে চায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো। আর দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না।'[১] এ প্রসঙ্গে ইবনে উমর রা. বলেন, 'তুমি দুনিয়ার জন্য এমনভাবে জমি কর্ষণ করো যেন মনে হবে তুমি চিরকাল জীবন যাপন করবে এবং তুমি আখিরাতের জন্য এমনভাবে কাজ করো যেন মনে হবে তুমি আগামী কালই মারা যাবে।'[২]

মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বার্থে দুনিয়ার কল্যাণের সাথে আখিরাতের কল্যাণকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই লাভবান হয়। কারণ অস্থায়ী কল্যাণের ওপর স্থায়ী কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়ার ফলে মানুষের স্বার্থচিন্তা ও দুনিয়াপ্রীতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভের আশায় সে ত্যাগ স্বীকার করে এবং অন্যদের স্বার্থে কাজ করে।

৭.২. ইসলামী শরী'আহ্র প্রতিটি বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর : ইসলামী শরী'আহ্র প্রতিটি বিধানই প্রণীত হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং তাকে সভ্য করে গড়ে তোলার জন্য, যাতে সে নিজের এবং সমাজের জন্য কল্যাণের উৎস হতে পারে এবং সে যেন কোনোভাবেই অকল্যাণের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকৃতপক্ষে, মানবতার কল্যাণ সাধন ও কল্যাণ কামনা করাই দীন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'দীন হলো কল্যাণ কামনা করা।'[৩]

৭.৩. মুহাম্মদ স. ও কুরআন উভয়ই বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণস্বরূপ : কল্যাণের বিষয়টিকে ইসলামে এতটাই গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়েছে যে, শরী'আহ্র উপস্থাপক মুহাম্মদ স. ও এর প্রধান উৎস আল কুরআনকে রহমত বা কল্যাণরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন, ইসলামী শরী'আহ্র উপস্থাপক মুহাম্মদ স. সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।'[৪]

---

[১]আল কুরআন, ২৮ : ৭৭।
[২]তাফসিরে কুরতুবি, খ. ১৩, পৃ, ২১৪।
[৩]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল ঈমান, বাবু কাওলিন নাবী আদদীনু আন্নাসিহাহ্।
[৪]আল কুরআন, ২১ : ১০৭।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে ইসলামী শরী'আহ্র প্রধান উৎস কুরআনকেও মানবকুলের জন্য রহমতস্বরূপ আখ্যায়িত করে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ (বিশিষ্ট কিতাব) ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময় এবং মুমিনের জন্য হিদায়াত ও রহমত।'[১]

সূরা আম্বিয়ার উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ স.-কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ এবং সূরা ইউনুসে ইসলামী শরী'আহ্র মূল উৎস আল কুরআনকে মানবজাতির জন্য হিদায়াত ও রহমত বলা হয়েছে। আর 'রহমত' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা দুনিয়া ও পরকালের সকল কল্যাণ ও উপকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ছাড়া রহমতের ভিত্তি হলো কল্যাণ অর্জন (جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ) ও ক্ষতির প্রতিরোধ করা (دَفْعُ الْمَضَرَّةِ)।[২] তাই বলা যায়, বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত রাসূলুল্লাহ্ স. ও কুরআনের মূল উদ্দেশ্যই হলো বিশ্ববাসীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করা।

৭.৪. মনীষীদের দৃষ্টিতে ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য : ইসলামী শরী'আহ্র একটি উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও সমষ্টির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। কল্যাণের এ বিষয়টি মুসলিম উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নিকট অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ক'জন মুসলিম চিন্তাবিদের অভিমত তুলে ধরা হলো :

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ সম্পর্কে ইমাম গাযালি র. বলেন, 'The very objective of the Shariah is to promote the welfare of the people, which lies in safeguarding their faith, their life, their intellect, their posterity and their wealth.' অর্থাৎ, 'শরী'আহ্র গূঢ় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করা।'[৩] এ পাঁচটি জিনিসের হিফাযতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয়ই মাসলাহা বা কল্যাণ আর এগুলোর জন্য ক্ষতিকর প্রতিটি জিনিসই অকল্যাণ। ক্ষতিকর জিনিসের প্রতিরোধ করাও কল্যাণ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেছেন, 'ইসলামী শরী'আহ্ এসেছে কল্যাণ অর্জন ও তার পূর্ণতা সাধন এবং অকল্যাণ দূরীভূত ও তার হ্রাসকরণের জন্য। আর দুটি কল্যাণের মধ্যে অধিক কল্যাণকর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে

---

[১]আল কুরআন, ১০ : ৫৭।

[২]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরীয়তের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

[৩]M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester : The Islamic Foundation, 2000), 118.

www.pathagar.com

হবে যখন দুটিকে একত্রে অর্জন করা সম্ভব না হয় এবং দুটি মন্দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর মন্দকে সর্বাগ্রে প্রতিহত করতে হবে যখন দুটিকে একত্রে প্রতিহত করা সম্ভব না হয়।

মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, 'শরী'আহ্র ভিত্তি হচ্ছে মানুষের প্রজ্ঞা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। আর কল্যাণ নিহিত রয়েছে সার্বিক আদল, দয়া-মমতা, কল্যাণকামিতা ও প্রজ্ঞার মধ্যে।'[১]

ইমাম শাতিবি র. বলেন, (الشَّرِيْعَةُ وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ) 'শরী'আহ্ প্রণীত হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।'[২]

ইমাম ইয্য ইবনে আবদিস সালাম র. বলেন, (إِنَّ الشَّرِيْعَةَ كُلُّهَا مَصَالِحُ) 'শরী'আহ্র পুরোটাই হলো কল্যাণ।'[৩]

৮. যাবতীয় অন্যায় ও অকল্যাণ দূর করা

শুধু কল্যাণ সাধনই নয়, বরং যাবতীয় অন্যায় ও অকল্যাণ দূর করাও ইসলামী শরী'আহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। যেসব বিষয় ও কাজ সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সুখ-সমৃদ্ধি ও মানবকল্যাণের অন্তরায় সেগুলো নির্মূলকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো ইসলামী শরী'আহ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে ও ধর্মে ধর্মে শান্তি স্থাপন করা ইসলামের অভীষ্ট লক্ষ্য। ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও সমস্ত অকল্যাণ দূর করা জরুরি। গুটিকয়েক দুর্বৃত্ত অনাচার, অত্যাচার, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মাধ্যমে যেন সমাজের একজন ব্যক্তির জীবনও দুর্বিষহ করে তুলতে না পারে সে জন্য ইসলাম যাবতীয় অকল্যাণ দূর করার প্রয়াস নেয়। সমাজ থেকে ফেতনা-ফাসাদ দূর করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে কঠোর আইন প্রণয়নের পাশাপাশি তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়। শুধু আইন দিয়ে সকল ধরনের অকল্যাণ দূর করা যায় না বলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনেও গ্রহণ করা হয় বহুমাত্রিক উদ্যোগ।

অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা রোধ করা ইসলামী শরী'আহ্র সাধারণ উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। সকল ধরনের অশান্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন :

---

[১]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬, খ. ৩, পৃ. ৫।

[২]ইমাম শাতিবি, আল মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ৬।

[৩]আল কাওয়ায়িদু লি ইয্য ইবনে আবদিস সালাম, খ. ১, পৃ. ৯।

www.pathagar.com

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ— 'আর যখন সে ফিরে যায় তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।'[১]

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও বংশ ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত থাকত। তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিধানপ্রণেতার সৃষ্টিগত ও নির্দেশগত উদ্দেশ্যের বিপরীত। কারণ যে জিনিসের ওপর মানবজাতির জীবন ও জীবিকা নির্ভিরশীল সেই বংশ ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করা শরী'আহ্দাতার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম সর্বদাই অকল্যাণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং যাবতীয় অন্যায় ও অকল্যাণের সকল পথ রোধ করেছে। সমাজে শান্তি স্থাপনের পাশাপাশি সেখানে যেন আর কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সে নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا—'পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।'[২]

অকল্যাণকারীরা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত। অকল্যাণে লিপ্ত থাকার কারণে তাদের ওপর বিভিন্ন শাস্তি নেমে আসে। যেমন বলা হয়েছে, 'তারা সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের ওপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।'[৩] এমনিভাবে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্তে অন্যায় ও অকল্যাণ দূর করার পাশাপাশি এসবের মূলোচ্ছেদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অন্যায় ও অকল্যাণের পথ রোধ করার জন্য ইসলামী শরী'আহ্তে যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয় তার মধ্যে রয়েছে :

৮.১. ইবাদত : ইবাদত মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করে। ফলে ইবাদতকারীর দ্বারা আর কোনো অন্যায় ও অকল্যাণ সংঘটিত হতে পারে না। যেমন সালাত আদায়ের উপকারিতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় সালাত যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।'[৪]

৮.২. শাস্তিবিধান : সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার ও অকল্যাণের পথ রোধ করার জন্য ইসলামী শরী'আহ্তে নানাবিধ বাস্তবমুখী শাস্তিবিধান রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, হত্যা-সন্ত্রাস (৫ : ৩২, ৩৩), চুরি-ডাকাতি (৫ : ৩৮), যিনা-

[১]আল কুরআন, ২ : ২০৫।
[২]আল কুরআন, ৭ : ৫৬।
[৩]আল কুরআন, ৮৯ : ১২-১৩।
[৪]আল কুরআন, ২৯ : ৪৫।

www.pathagar.com

ব্যভিচার (১৭ : ৩২), মদপান-জুয়া (৫ : ৯০), সুদ, (২ : ২৭৫) ইত্যাদির শাস্তি। ইসলামী শরী'আহ্‌র নির্ধারিত এসব শাস্তিবিধান সমাজে প্রয়োগ করা হলে অপরাধপ্রবণতা ব্যাপকভাবে কমে যাবে।

৮.৩. সমন্বিত প্রয়াস : শুধু একক কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় অন্যায় দূর করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন সার্বিক ও সমন্বিত প্রয়াস। তাই ইসলামী শরী'আহ্ প্রত্যেকটি মানুষকে তার সামর্থ্য অনুসারে অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ—'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ করো এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করো।'[১]

৮.৪. রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ : অন্যায় ও অকল্যাণের পথ রোধ করার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি প্রয়োজন সামষ্টিক পদক্ষেপ। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা সামষ্টিক পদক্ষেপেরই একটি অংশ। অন্যায় ও অকল্যাণের পথ রোধ করার জন্য সামষ্টিক পদক্ষেপ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ—'তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা প্রয়োজন যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।'[২]

৯. মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির পরিবেশ সংরক্ষণ

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস, চিন্তা ও মূল্যবোধের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলাম সকল মানুষের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করে এবং এ বিষয়ে বিশ্বজনীন নীতিমালা প্রদান করে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ স. মদিনায় বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে একটি স্থিতিশীল ও গতিশীল রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। এ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মাঝে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌজন্যবোধের ওপর সমাজের অগ্রগতি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নির্ভর করে। এ জন্য ইসলামী শরী'আহ্ পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টির ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয় এবং এটিকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে :

---

[১]আল কুরআন, ৩ : ১১০।

[২]আল কুরআন, ৩ : ১০৪।

www.pathagar.com

৯.১. মূল্যবোধের বিকাশ : সঠিক মূল্যবোধের বিকাশ ছাড়া কোনো জাতি সুসভ্য হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার পরিবেশ অনেকখানি ব্যক্তির চিন্তা-বিশ্বাস ও সঠিক ধর্মবোধের ওপর নির্ভর করে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে দাঙ্গা, অবিশ্বাস, হিংসা-বিদ্বেষ, রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ বেড়ে যায়। এ কারণে ইসলাম নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

পারস্পরিক সম্প্রীতি অনেকখানি উদার ও মুক্তচিন্তার ওপর নির্ভর করে। ইসলাম এই উদারতা ও মুক্তচিন্তার প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করে এবং প্রত্যেক মানুষকে এক আদমের সন্তান হিসেবে বিবেচনা করে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।'[১]

৯.২. আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা : শিষ্টাচার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। শিষ্টাচার ছাড়া প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা যায় না। এ জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার পাশাপাশি মানুষকে আদব-আখলাক বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্যও মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। ইসলামের নবী মুহাম্মদ স. অতীব গুরুত্বের সাথে মানুষকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, 'আমি উত্তম চরিত্র শিক্ষাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[২]

রাসূলুল্লাহ্ স. মানুষকে শিক্ষা দিতেন কীভাবে বড়কে সম্মান এবং ছোটকে স্নেহ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।'[৩]

শিষ্টাচার শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সততা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটে যা সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

৯.৩. যোগাযোগ ও উপঢৌকন বিনিময় : পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও উপঢৌকন বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ্ স. মদিনার আশে-পাশের বিভিন্ন গোত্র ও রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য পত্রযোগাযোগ ও দূত প্রেরণ করতেন। এ ছাড়া তিনি রোম, পারস্য ও মিসরের সম্রাটসহ রাজন্যবর্গের কাছে উপঢৌকন ও হাদিয়া প্রেরণ করতেন। হাদিয়া উপঢৌকন বিনিময়ের নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

---

[১]আল কুরআন, ৪ : ১।

[২]মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবু হুসনিল খুলক।

[৩]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবু ফির রাহমাতি।

www.pathagar.com

'তোমরা উপঢৌকন বিনিময় করো, তাহলে তোমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হবে।'[১]

৯.৪. কটুবাক্য, কলহবিবাদ ও অযথা তর্কবিতর্ক নিষিদ্ধ : আরবি 'মিরা (مِرَاءٌ)', 'জিদাল (جِدَالٌ)' ও 'খুসুমাহ (خُصُوْمَةٌ)' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো কটুবাক্য, কলহবিবাদ ও অযথা তর্কবিতর্ক। মিরা ও জিদালের ব্যবহার হয় এমনসব কথাবার্তার ক্ষেত্রে যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মিরার উদ্দেশ্যই হলো অপরের অজ্ঞতা তুলে ধরে তাকে অপদস্থ করার মাধ্যমে তার ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। আর খুসুমাহ হলো যে বিষয়ে জ্ঞান নেই শুধু বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তির সাথে অযথা তর্কবিতর্কে লিপ্ত হওয়া। এ ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের বক্তব্য খণ্ডন করে অশোভন ও মাত্রাতিরিক্ত কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে। সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির পরিবেশ বিনষ্ট করে বলে ইসলামী শরী'আহ্ এগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন: 'মহান আল্লাহ্র নিকট ঐ লোক সবচেয়ে মন্দ, যে সর্বাপেক্ষা বাক-বিতণ্ডাকারী।'[২]

'যে জ্ঞাতসারে অন্যায়ের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্র তীব্র রোষানলে থাকবে।'[৩]

কটুবাক্য ও অযথা তর্কবিতর্ক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমরা যখন বিতর্কে লিপ্ত হই; তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাছে চলে আসেন। তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন, 'তোমরা মিরা বা কটুবাক্য পরিত্যাগ করো, কারণ এতে কোনো উপকার নেই; মিরা পরিত্যাগ করো, কারণ এতে কোনো কল্যাণ নেই এবং যা ভাইদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে।'[৪]

৯.৫. মীমাংসা ও শান্তিমূলক ব্যবস্থা : ইসলামী শরী'আহ্ সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য শিক্ষা ও পরামর্শমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও যদি কোনো কারণে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয় তাহলে তা দ্রুত মীমাংসার মাধ্যমে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। যেমনটি নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।'[৫]

---

[১]আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, বাবুল আইন।
[২]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম, বাবু ফিন আলাদ্দিল খাসিম।
[৩]মুসনাদে আহমাদ।
[৪]ইমাম গাযালি, কিতাবুল আদাব; ইবনে কুদামাহ, আল মুগনি, খ. ২, পৃ. ১৬।
[৫]আল কুরআন, ৪৯ : ১০।

www.pathagar.com

১০. মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান

ইসলামী শরী'আহ্ মানুষের মান-সম্মান-ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়। মানুষের কাছে তার জীবন ও সম্পদ খুবই প্রিয়। আবার কখনো কখনো তার জীবন ও সম্পদের চেয়ে মান-মর্যাদা বড় হয়ে দেখা দেয়। ইসলামী শরী'আহ্ প্রত্যেক ব্যক্তির মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং যেসব বিষয় এগুলোকে ক্ষুণ্ন করে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করে।

মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবরুর বিষয়টি হিফয আন-নফসের অন্তর্ভুক্ত হলেও অনেকে এটিকে ইসলামী শরী'আহ্র স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মালিকি ফিকাহবিদ শিহাব আল-দীন আল-কারাফি সর্বপ্রথম মানুষের সম্ভ্রম রক্ষাকে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে আলী আল-শাওকানি র. এটিকে সমর্থন করেন।

মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন ইসলামী শরী'আহ্র একটি বিশেষ দিক। ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন ও মর্যাদার স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে ও আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ—'আমি তো বনি আদমকে মর্যাদা দান করেছি।'[১]

মহান আল্লাহ্র অত্যন্ত প্রিয় সৃষ্টি মানুষ। তিনি মানুষকে মর্যাদাবান করেছেন এবং তাকে দিয়েছেন বিপুল পরিমাণ নিয়ামত। মানুষকে এতই সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকটতম ও অতি সম্মানার্হ সৃষ্টি ফেরেশতাকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এই মানুষকে সিজদাহ্ করতে।

মহান আল্লাহ্ মানুষকে খলিফা বা প্রতিনিধির মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً — 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি'[২]—এর ব্যাখ্যায় সাইয়েদ কুতুব শহীদ বলেন, 'যখন মহান আল্লাহ্ তাঁর সর্বোচ্চ ইচ্ছা অনুযায়ী এই নতুন সৃষ্টির হাতে পৃথিবীর দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করার বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলেছেন তখন তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষের হাতকে ক্ষমতাশালী করে দিয়েছেন। তার কাছে ন্যস্ত করেছেন নব নব উদ্ভাবন ও

---

[১]আল কুরআন, ১৭ : ৭০।

[২]আল কুরআন, ২ : ৩০।

www.pathagar.com

আবিষ্কার, বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ ও সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান শক্তি ও খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন এবং গোটা সৃষ্টিজগৎকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে অনুগত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছার বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা। এটাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তার কাছে অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সকল সুপ্ত শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভা দান করলেন যাতে সে পৃথিবীর শক্তিকে এবং সকল খনিজ দ্রব্য ও কাঁচামালকে ব্যবহার করতে পারে। আর আল্লাহ্র ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দিতে যে প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার প্রয়োজন তাও তাকে দিলেন। তখন মানুষ অর্জন করল এক সুমহান মর্যাদা। এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষ হয়ে দাঁড়াল এক পরম সম্মানিত ও মর্যাদাবান সৃষ্টি।[১]

ইসলাম মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে থাকতে শেখায় এবং কোনোভাবেই কারো সামাজিক মান-মর্যাদা যেন নষ্ট না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে বলে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'হে মু'মিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী হতে উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কাউকে মন্দ নামে ডাকা কতোই না গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে ফিরে না আসে তারাই জালিম। হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর।'[২]

উক্ত আয়াতদ্বয়ে মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবরু রক্ষার জন্য কতগুলো বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো : কাউকে উপহাস ও দোষারোপ না করা, মন্দনামে না ডাকা, কারো সম্পর্কে অমূলক ধারণা না করা, এবং কারো গোপন দোষ প্রকাশ না করা।

রাসূলুল্লাহ্ স. ইজ্জত ও সম্মানহানিকে কাবাঘর ধ্বংস করার চেয়েও খারাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. একদিন রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ স. বায়তুল্লাহ্কে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে

---

[১]সাইয়েদ কুতুব শহীদ র., তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন, সূরা বাকারাহ ৩০তম আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
[২]আল কুরআন, ৪৯ : ১১-১২।

www.pathagar.com

বায়তুল্লাহ্! তুমি কতই না পবিত্র, কতই না সম্মানিত!' অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে প্রশ্ন করে বললেন, 'হে আব্দুল্লাহ্! কত মহান পবিত্র এই সম্মানিত ঘর! কিন্তু তুমি জান, এই ঘরের চেয়েও সম্মানিত বিষয় রয়েছে? আর সেটা হলো, একজন মুসলমানের জীবন ও ইজ্জতের ওপর হামলা করা আর তার এ আচরণ কাবাঘর ধ্বংস করে ফেলার চেয়েও বড় অপরাধ।'[১]

রাসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে অপমানিত, লাঞ্ছিত অথবা সম্মানহানি হতে দেখেও যদি তার সাহায্য না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এমন জায়গায় তার সাহায্য ত্যাগ করবেন যেখানে সে নিজে সাহায্যপ্রার্থী হবে। আর যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে অপমানিত অথবা বেইজ্জতি, লাঞ্ছিত ও হেয় হতে দেখে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে।'[২]

সাহাবিগণের হৃদয়ে মানুষের প্রতি অফুরন্ত সম্মানবোধ ছিল। তাঁরা সবসময় পরনিন্দা, অন্যের পেছনে লেগে থাকা, কারো দোষ খোঁজা ইত্যাদি নেতিবাচক কাজ থেকে সবসময় দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। উমর রা. শাসকগণকে বিদায় প্রদানের সময় যেসব উপদেশ দিতেন তার মধ্যে ছিল, 'সাবধান! মুসলমানদেরকে মারপিট করে তাদের অপমানিত করবে না।'[৩]

আবু মুসা আশআরী রা. গনিমতের মাল বেশি দাবি করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে বিশটি চাবুক মেরেছিলেন এবং তার মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছিলেন। সে ব্যক্তি উমর রা.-এর কাছে মদিনায় চলে আসে। খলিফার দরবারে মানহানির অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি আবু মুসা আশআরীকে লিখিত আদেশ দেন : 'আপনি যদি এই কাজ জনগণের সম্মুখেই করে থাকেন তাহলে আপনাকে শপথ করে বলছি যে, অনুরূপভাবে জনতার সম্মুখে বসে তার প্রতিবিধান করুন। আর যদি নির্জনে এরূপ করে থাকেন তাহলে নির্জনে তার প্রতিবিধান করুন।' লোকেরা ক্ষমা করে দেয়ার জন্য তাকে অনেক বুঝালো কিন্তু সে তাতে কর্ণপাত করল না। পরিশেষে আবু মুসা রা. সর্বসাধারণের সামনে প্রতিদান দেয়ার জন্য বসে যান। তখন অভিযোগকারী আকাশপানে মুখ তুলে বলল, 'হে আল্লাহ্! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।'[৪]

মানুষের মান-সম্ভ্রম ও ইজ্জত-আবরু রক্ষার জন্য ইসলামী শরী'আহ্তে অনেক বিধিবিধান রয়েছে। এর মধ্যে ক'টি হলো :

---

[১]উদ্ধৃত: মুফতি তকি উসমানি, ইসলাহী খুতুবাত, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৫-২১৭।

[২]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবুররাজুলি ইয়াজুব্বু আন ইরজি আখিহি।

[৩]ইমাম আবু ইউসুফ র., কিতাবুল খারাজ।

[৪]মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩১।

www.pathagar.com

১০.১. মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংরক্ষণ : ইসলামী শরী'আহ্ মানুষের মান-সম্ভ্রম রক্ষার পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও রক্ষা করে। ইসলাম প্রত্যেকের ঘর কিংবা আবাসস্থলকে একটা সুরক্ষিত দুর্গের মর্যাদা দেয়। সে দুর্গের মালিক সে ব্যক্তি নিজেই। সেখানে কারো হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। এমনকি রাষ্ট্র সেখানে বৈধ অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশের অধিকার রাখে না। কারো বাড়িতে প্রবেশের ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশনা হলো : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا—'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে—সে ঘরের মালিকের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে কখনো প্রবেশ করো না।'[১]

নবী করিম স. নিজের ঘরে প্রবেশ করতেও আওয়াজ দিয়ে কিংবা দরজা খটখটিয়ে শব্দ করার উপদেশ দিয়েছেন যাতে ঘরের ভেতরে সকলে সতর্ক হতে পারে। নারীরা যেন নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারে, যাতে তাদেরকে অপ্রস্তুত ও অপ্রত্যাশিত অবস্থায় না দেখতে হয়। কোনো প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে তা চেয়ে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা যখন নবী সহধর্মিণীদের নিকট থেকে কোনো বস্তু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নেবে।'[২]

কারো ঘরে প্রবেশ করে অহেতুক বসে থাকা কিংবা অপ্রয়োজনে কাউকে বিরক্ত করা অথবা কারো গোপনীয়তা ভঙ্গ না করার প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল কুরআনে বলা হয়েছে : 'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা খাদ্যদ্রব্য তৈরীর জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করবে না।'[৩]

রাষ্ট্রীয় কিংবা বিচারসংক্রান্ত কাজে তদন্তের স্বার্থে কারো ঘরে প্রবেশ করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার যেন মামুলি কারণেই ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উমর রা.-এর একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে।

একরাতে উমর রা. নাগরিকদের খোঁজখবর নেয়ার জন্য বের হলেন। হঠাৎ তিনি এক ব্যক্তির ঘরে গানের শব্দ শুনতে পেলেন। সন্দেহ হলে তিনি দেয়ালের ওপর

---

[১]আল কুরআন, ২৪ : ২৭।
[২]আল কুরআন, ৩৩ : ৫৩।
[৩]আল কুরআন, ৩৩ : ৫৩।

www.pathagar.com

আরোহণ করে দেখলেন যে, ওখানে শুরা মজুত আছে, তার সাথে আছে এক নারী। তিনি সজোরে বললেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুই কি মনে করেছিস যে, তুই নাফরমানি করতে থাকবি; আর আল্লাহ্ তা ফাঁস করে দেবেন না? লোকটি উত্তরে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন! ব্যস্ত হবেন না, আমি যদি একটি অপরাধ করে থাকি তবে আপনি করেছেন তিনটি অপরাধ। আল্লাহ্ গোপনীয় বিষয়াদি অন্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন। আর আপনি সেই কাজটি করে ফেলেছেন। আল্লাহ্ আদেশ করেছেন সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে, আর আপনি প্রবেশ করেছেন দেয়াল টপকে। আল্লাহ্ আদেশ করেছেন নিজের বাড়ি ব্যতীত অনুমতি ছাড়া অন্যের বাড়িতে প্রবেশ না করতে আর আপনি অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেছেন।

এ কথা শুনে উমর রা. তাঁর ভুল স্বীকার করলেন এবং গৃহকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। অবশ্য তার নিকট থেকে সৎপথ অবলম্বন করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন।[১]

১০.২. দোষ-ত্রুটি গোপন করা কল্যাণকর : কারো ব্যক্তিগত দোষত্রুটি ও দুর্বলতা গোপন রাখা কুরআন-সুন্নাহ্ প্রদত্ত নৈতিক শিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপরের দুর্বলতা গোপন করাকে অতি উত্তম কাজ হিসেবে ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্যের দোষত্রুটি দেখে তা গোপন করে রাখল সে যেন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জীবন দান করল।'[২] আরেক বর্ণনায় রয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি যদি পার্থিব জীবনে অপরের দুর্বলতা গোপন রাখে, তাহলে পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা তার দুর্বলতা গোপন রাখবেন।'[৩]

উমর রা.-এর খিলাফতকালে এক যুবতী শরী'আহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেবার তার জীবন রক্ষা পেল। পরে সে কৃত অপরাধের জন্য খাঁটিভাবে তাওবা করল। পরে এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাল। সে উক্ত মহিলার অপকর্মের কথা জানত না। যুবতীর অভিভাবক উমর রা.-এর কাছে আরজ করল, হে আমিরুল মুমিনিন! আমি সেই ঘটনা তাকে বলে দেব? খলিফা বললেন, 'মহান আল্লাহ্ যে বিষয়টি গোপন রেখেছেন তুমি কি তা ফাঁস করে দিতে চাচ্ছ? আল্লাহ্র শপথ! তুমি তার কাছে এ কথা ফাঁস করে

---

[১]মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

[২]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবু ফিসসাতরি আলাল মুসলিম।

[৩]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াসসিলাহ্ ওয়াল আদাব, বাবু বিশারাতি মান সাতারা আল্লাহু তা'আলা আইবাহু ফিদদুনিয়া... ও সুনান আবু দাউদ।

www.pathagar.com

দিলে আমি তোমাকে সমুচিত জবাব দেব। একজন সতীসাধ্বী নারীর ন্যায় তার শাদির ব্যবস্থা করো।'[১]

এ বিষয়ে আরো একটি ঘটনা হলো, উমর রা. একরাতে ঘুরে বেড়ানোর সময় একজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। পরদিন তিনি অন্যান্য সাহাবির সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন যে, নিজের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উক্ত যিনাকারীর ওপর যিনার হদ কার্যকর করা যাবে কিনা। এ প্রসঙ্গে আলী রা. বললেন যে, ইসলামী আইনে যিনার শাস্তি কার্যকর করার জন্য চারজন সাক্ষী থাকা অপরিহার্য এবং এ বিধান খলিফার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অন্যান্য সাহাবি তাঁর সাথে একমত পোষণ করলেন। এ ঘটনা উদ্ধৃত করে ইমাম গাযালি র. অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শরী'আহ্ যে পাপের বিষয় গোপন রাখার দাবি করে, এটি তার অকাট্য প্রমাণ।[২]

তবে যারা খারাপ লোক এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর তাদের অপরাধ গোপন না করার এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানানোর অনুমতি রয়েছে। কারণ এ ধরনের লোকের দোষত্রুটি গোপন করার অর্থই হলো দুর্নীতি ও পাপাচারকে সমর্থন করা।

১০.৩. উপহাস না করা : উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে মানুষকে হেয় ও অপমান করা হয় বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজ থেকে সকলকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ—'কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে।'[৩]

১০.৪. মন্দ নামে না ডাকা : অপরকে মন্দ নামে ডাকার দ্বারা তাকে হেয় ও অপমান করা হয়। তাই ইসলামে কাউকে মন্দ নামে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেছেন, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ—'তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।'[৪]

১০.৫. অমূলক ধারণা বর্জন করা : কারো সম্পর্কে যথাযথ প্রমাণ ব্যতিরেকে কু-ধারণা না করার জন্য ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ—'তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক, কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ।'[৫]

---

[১]মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

[২]ইমাম গাযালি র. এহইয়াউ উলুমিদ্দিন ও কিতাবুল আদাব।

[৩]আল কুরআন, ৪৯ : ১১।

[৪]আল কুরআন, ৪৯ : ১১।

[৫]আল কুরআন, ৪৯ : ১২।

www.pathagar.com

১০.৬. কাযাফ বা মিথ্যা অপবাদ দেয়া নিষিদ্ধ : কোনো ভালো মানুষের সম্মান ও সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য তার বিরুদ্ধে কাযাফ বা অপবাদ দেয়া অত্যন্ত খারাপ কাজ। সাধারণভাবে কাযাফ বলতে সব ধরনের অশ্রাব্য কথা বুঝায়, যার মধ্যে পড়ে মিথ্যা অপবাদ, মানহানিকর বিবৃতি, অবমাননা, অভিশাপ প্রদান ইত্যাদি। অবশ্য কুরআনে বর্ণিত কাযাফ বলতে কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়াকে বুঝানো হয়। এ ধরনের অপবাদ দেয়া শুধু নিষিদ্ধই নয়; বরং এর জন্য নির্ধারিত শাস্তির বিধান রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলাম প্রত্যেক মানুষের মান-সম্মান ও গোপনীয়তা রক্ষার গ্যারান্টি দেয়। ইসলামের এ বিধান মেনে চললে এবং এ ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পৃথিবীতে আর টেলিফোনে আড়িপাতা, রুদ্ধদ্বার বৈঠকের চিত্র ধারণ করা, কারো গোপনীয়তা প্রকাশের মতো অপরাধ সংঘটিত হতো না।

১১. সহজপন্থা গ্রহণ ও কঠোরতা বর্জন

ইসলামী শরী'আহ্‌র একটি উদ্দেশ্য হলো চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, আইন-কানুনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহজপন্থা অবলম্বন করা এবং কঠোরতা ও ক্ষতি দূর করা। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হলো এমন একটি জীবনব্যবস্থা যার কোনো জটিল শাস্ত্রতত্ত্ব নেই। এ জীবনব্যবস্থার সকল বিধিবিধানই খুব সহজ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। এতে কোনো কুসংস্কার ও আজগুবি বিশ্বাসের স্থান নেই। ইসলামের সকল বিশ্বাস ও শিক্ষা যুক্তিপ্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে নেই কোনো জটিল আচার-অনুষ্ঠান।

জীবনকে সহজ, সুন্দর, সুখকর ও গতিশীল করে তোলা এবং একে সংকীর্ণতা ও কষ্টমুক্ত করার লক্ষ্যে ইসলামী শরী'আহ্ তার যাবতীয় বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে। ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, আমাদের শরী'আহ্ সহজসাধ্যতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তা কাঠিন্য ও ক্লেশ নির্মূল করতে চায়।[১]

ইসলামী শরী'আহ্‌র একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হলো তা সহজ ও কঠোরতামুক্ত। দীনের কোনো বিধান পরিপালনের ক্ষেত্রে কেউ কোনো যৌক্তিক সমস্যার সম্মুখীন হলে তার জন্য শরী'আহ্‌র বিধানকে হালকা ও সহজ করে দেয়া ইসলামী শরী'আহ্‌র একটি সাধারণ নীতি। ইসলামী শরী'আহ্ মূলত তার সকল বিধানকে সহজ করতে চায়। আল কুরআনে বলা হয়েছে, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, আধুনিক যুগে ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, প্রাগুক্ত, ২০১১, পৃ. ১১২।

www.pathagar.com

الْعُسْرَ—'আল্লাহ্ তা'আলা চান তোমাদের জন্য সহজ করতে, তিনি এমন কিছু চান না যা তোমাদের জন্য কষ্টকর।'[১]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ—'এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ।'[২]

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'তোমরা কাজকর্মে সহজপন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে না, মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না।'[৩]

সহজ করা সংক্রান্ত কুরআন হাদিসের নির্দেশনার বাস্তব প্রতিফলনও দেখি রাসূলুল্লাহ্ স. ও তাঁর সাহাবিগণের আমলের ভেতরে। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নীতি ছিল এই যে−যখন তাঁকে দুটি বিষয়ের মধ্যে ইখতিয়ার দেয়া হতো তখন তিনি দুটির মধ্যে সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি তাতে কোনো গোনাহ্ না হতো।[৪] তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহজপন্থার বিধান অনুসরণ করতেন। একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকজন উঠে তাকে মারতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমরা মানুষের প্রতি সহজ নীতি অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হয়েছ, কঠোরতা অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হওনি।[৫]

মানবজীবনকে সুন্দর, পবিত্র ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম তার বিধিব্যবস্থাকে সরল, সহজ ও সর্বসাধারণের জন্য পালনযোগ্য করে দিয়েছে। মনুষ্যসৃষ্ট কষ্ট ও ক্ষতিকর বিধিবিধান ও রীতিনীতি থেকে মুক্ত করে ইসলাম মানবজীবনকে করে তোলে সুন্দর ও সহজ। মানুষের জীবনকে কষ্টকর ও দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য কুরআন-সুন্নাহ্তে আরো বহু নির্দেশনা রয়েছে। এর ক'টি হলো :

মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।'[৬]

---

[১]আল কুরআন, ২ : ১৮৫।

[২]আল কুরআন, ২ : ১৭৮।

[৩]সহিহ্ আল বুখারি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা কানান্নাবিউ স. ইয়াতাখাওয়ালাহুম বিল মাউয়িযাতি ওয়াল ইলমি কাইলা ইয়ানফিরু ও মুসলিম।

[৪]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল হুদুদ, বাবু ইকামাতিল হুদূদি ওয়াল ইনতিকামি লিহুরুমাতিল্লাহ্।

[৫]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল ওযু, বাবু সাব্বিল মা'য়ি আলাল বাউলি ফিল মাসজিদ।

[৬]আল কুরআন, ৫ : ৬।

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে ইসলামী শরী'আহ্‌র মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট হয়। মানুষকে কষ্ট না দেয়া, তাদেরকে পবিত্র করা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত পূর্ণ করা।

মানবজীবনকে কষ্টমুক্ত করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে যদি এই আশঙ্কা বোধ না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।'[১]

রাসূলুল্লাহ্ স. যখন মায়ায রা. ও আবু মূসা রা.-কে ইয়ামানের শাসক হিসেবে পাঠান তখন তাঁদেরকে এ কথা বলে নির্দেশ প্রদান করেন, 'তোমরা মানুষের প্রতি সহজতা আরোপ করবে, কঠোরতা আরোপ করবে না, সুসংবাদ শুনাবে বীতশ্রদ্ধ করে তুলবে না, একে অপরের আনুগত্য করবে, পরস্পর মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে না।'[২]

ইবাদত করার জন্য মহান আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই ইবাদতের মধ্যে সালাতের গুরুত্ব সর্বাধিক কিন্তু সেই সালাত আদায়ের ক্ষেত্রেও কঠোরতা পরিহার করে সহজপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জামা'আতে সালাত আদায়ের কারণে কেউ যেন কষ্ট না পায় সে জন্য যে সকল ইমাম সালাতকে দীর্ঘায়িত করতেন তাদের লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ স. রাগত স্বরে বলেছিলেন, 'তোমরা কেউ কেউ মানুষকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাও। তোমরা যারা ইমামতি করবে তারা সালাতকে সংক্ষিপ্ত করবে। কারণ পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও কাজে ব্যস্ত লোক থাকে।'[৩] এ হাদিসে মানুষের কষ্ট লাঘব করা ও তাদের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সালাতকেও যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আমর ইবনুল আস রা. একশীতের রাতে নাপাকি সত্ত্বেও ফরয গোসল না করেই সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট বিষয়টি তুলে ধরলে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, আমি কুরআনের ঐ আয়াত স্মরণ করেছি যেখানে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অতি করুণাশীল' (৪ : ২৯)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ স. স্মিত হাসলেন।

---

[১]সহিহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস্‌সিওয়াক।

[২]সহিহ আল বুখারি ও সহিহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু ফিল আমরি বিত তাইসিরি ওয়া তারকিত তানফির।

[৩]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আযান, বাবু তাখফিফিল ইমামি ফিল কিয়াম ওয়া ইতমামির রুকু ওয়াস সুজুদ।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ স. সেইসব লোকের মানসিকতার তীব্র নিন্দা করেন, যারা এক আহত ব্যক্তিকে নাপাকির কারণে অবশ্যই গোসল করতে হবে বলে পীড়াপীড়ি করেছিল এবং গোসল করার কারণে লোকটি মৃত্যুবরণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, তারা তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ যেন এদেরকে হত্যা করেন। তারা যখন জানে না তখন জিজ্ঞেস করলো না কেন? না জানার প্রতিকার হচ্ছে প্রশ্ন করা। ঐ লোকটির জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল। তার ক্ষতস্থানে একটি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে তায়াম্মুম করে নেয়াই যথেষ্ট ছিল।[১]

ব্যক্তিগত আমলের ক্ষেত্রে কেউ ইচ্ছে করলে অধিক পরিমাণ ইবাদত করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সহজ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা সর্বোত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'আল্লাহ্ সেসব লোককে পছন্দ করেন যারা তার প্রদত্ত সহজসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কারণ তিনি তাদের পাপকর্ম করাকে ঘৃণা করেন।'[২]

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যেমন সহজ করা এবং কষ্ট ও ক্ষতি দূর করাকে ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তেমনি মুজতাহিদগণও বিভিন্ন মাসয়ালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহজপন্থাকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, ফকিহ্গণ এমনসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না যা বিধি-নিষেধের প্রাচীর খাড়া করে, সহজসাধ্যতার পথ নির্দেশ করে না, কেবল নিষেধ করে, অনুমতি দেয় না।[৩]

১২. ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থি জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা

ইসলামী শরী'আহ্র আরো একটি উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনকে চরমপন্থা ও উগ্রতা থেকে মুক্ত করে ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থি জীবনব্যবস্থার প্রতি ধাবিত করা। ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থি জীবনব্যবস্থা হওয়ার কারণে ইসলামকে 'সিরাতুম মুস্তাকিম' (صِـرَاطُ الْمُسْـتَقِيم) নামে অভিহিত করা হয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করার মধ্যেই রয়েছে পরম কল্যাণ এবং এটিই হলো ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজের প্রতি ইনসাফ সাধনের সঠিক উপায়। প্রকৃতপক্ষে যে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ইনসাফ করতে পারে সে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এ কারণে মধ্যপন্থি মুসলিম জাতির উচিত হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র ইসলামী শরী'আহ্র ভারসাম্যপূর্ণ বিধান প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসা।

---

[১]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল মাজদুরি ইয়াতায়াম্মাম।

[২]আহমাদ, ইবনে হিব্বান ও বায়হাকি।

[৩]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, প্রাগুক্ত, ২০১১, পৃ. ১১৪।

www.pathagar.com

১২.১. ইসলাম মধ্যপন্থা অনুসরণের কর্মসূচি : ইসলাম শুধু পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থাই নয়, বরং ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থি জীবনব্যবস্থাও। এ জীবনব্যবস্থাকে যারা মেনে চলে তাদেরকে মধ্যপন্থি জাতি বলা হয়। একজন প্রকৃত মুসলিম প্রতি রাকা'আত সালাত আদায়ের সময় সহজ-সরল পথের বা সিরাতুম মুস্তাকিমের প্রত্যাশায় মহান আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে থাকে। সূরাতুল ফাতিহায় এই সিরাতুম মুস্তাকিম-এর উল্লেখ রয়েছে।

মুস্তাকিম-এর অর্থ হলো সহজ ও সরল পথ। এটি পথের এমন একটি অবস্থান, যা মধ্যবর্তী ও মাঝামাঝি থাকে। আর এ অবস্থাই হলো ভারসাম্যের অপর নাম। আল্লামা ইউসুফ আলী মুস্তাকিম-এর অর্থ করেছেন, Straight (সরল), Standard (মাঝামাঝি, মধ্যপন্থি), Definite (স্থির, নিশ্চিত) ও Permanent (চিরস্থায়ী, শাশ্বত)। প্রকৃতপক্ষে চিন্তা-ভাবনা, আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-মু'আমালাহ্, চরিত্র-আখলাক, আচার-আচরণ, আইন-কানুন ইত্যাদিতে মধ্যপন্থা অনুসরণ করার কর্মসূচিই হলো ইসলাম। এ কর্মসূচির অপর নাম 'সিরাতুম মুস্ত াকিম'।

১২.২. ইসলামী শরী'আহ্ মধ্যপন্থি জাতির জীবন বিধান : ইসলামী শরী'আহ্র অনুসারীগণ একটি মধ্যপন্থি জাতি হিসেবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান অনুসরণ করে চলে। ফলে প্রান্তীয় অবস্থান না থাকার কারণে তাদের বিচ্যুতির আশঙ্কা নেই। এ জন্য মহান আল্লাহ্ মুসলিম জাতির নাম দিয়েছেন, 'উম্মাতাও ওয়াসাতা' বা মধ্যপন্থি জাতি। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا—'আর এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থি জাতিতে পরিণত করেছি।'[১]

'মধ্যপন্থি জাতি' পরিভাষাটি অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এটি এমন এক উৎকৃষ্ট ও উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন জাতি, যারা নিজেরা ন্যায়বিচার, ন্যায়নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য ও সরল পথের অনুসরণ করার কারণেই তাদেরকে এ গুণে ভূষিত করা হয়েছে। দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে তারাই কেন্দ্রীয় আসন লাভের যোগ্য, সত্য ও সততার ভিত্তিতে সবার সাথে যাদের সম্পর্ক সমান এবং কারো সাথে যাদের অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক নেই। এ জন্যই তারা সকল জাতির নেতৃত্বদানে সক্ষম।

১২.৩. চরমপন্থা গ্রহণযোগ্য নয় : ইসলামী শরী'আহ্ এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা তার অনুসারীদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে চরমপন্থাকে এড়িয়ে চলার নির্দেশ

---

[১]আল কুরআন, ২ : ১৪৩।

www.pathagar.com

দেয়। চরমপন্থা বুঝানোর জন্য কতগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন গুলু (غُلُوّ) —বাড়াবাড়ি, তানাত্তু (تَنَطُّع)—গোঁড়ামি ও তাশাদ্দুদ (تَشَدُّد)—কড়াকড়ি। ইসলামী শরী'আহ্ এগুলোকে পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। এই মধ্যপন্থা শুধু বিধান পরিপালনের ক্ষেত্রেই নয়, এটি তাদের চিন্তাচেতনা, স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা-কর্মে, আচরণে ও বিধি-ব্যবস্থায় সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি এ জাতির প্রাত্যহিক আরাধনা। যে সমস্ত কারণ ও বিষয় মানুষকে দীনদারির পথে বাড়াবাড়ির দিকে ধাবিত করে রাসূলুল্লাহ্ স. সেগুলোও বর্জন করেছেন এবং যারা ইবাদত ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে মধ্যপন্থার সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে নিন্দা করেছেন।

১২.৪. অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয় : ইসলামে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদকে পৃথক করে দেখা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং দীন ও দুনিয়ার মধ্যকার পার্থক্য দূর করে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, 'ইসলাম এমনসব ইবাদতের বিধান দিয়েছে যা ব্যক্তির আত্মাকে পবিত্র করে। তার জাগতিক ও আত্মিক উন্নতি সাধন করে এবং গোটা সম্প্রদায় ও জামা'আতকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।... বস্তুত সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্ব ইত্যাদি যেমন ব্যক্তিগত ইবাদত তেমনি সামষ্টিক ইবাদতও বটে। এসব ইবাদত কোনো মুসলমানকে জীবন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না; বরং তার সাথে সমাজের আন্তরিক ও বাস্তবিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। এ কারণেই ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে বৈধ করেনি যা মানুষকে জীবনোপভোগ থেকে বিরত থাকতে শেখায় এবং জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করা থেকে বিরত রাখে। বরং ইসলাম গোটা পৃথিবীটাকেই মুসলমানদের জন্য একটা মিহ্রাব বলে মনে করে। যেখানে কাজ করাকে ইবাদত ও জিহাদ সাব্যস্ত করে, যদি তাতে নিয়ত সঠিক থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সীমার মধ্য থেকে করা হয়।'[১]

১২.৫. ইসলাম সন্ন্যাসব্রত সমর্থন করে না : সংসার ত্যাগ করে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট সুন্দর ও পবিত্র জিনিস বর্জন করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। তাফসিরে ইবনে কাসিরে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যখনি গোশত খাই তখনি নারী সঙ্গলাভের ইচ্ছে হয়। তাই আমি গোশত খাওয়া নিজের

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

জন্য হারাম করে নিয়েছি। তখন অবতীর্ণ হয় : 'হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন সেসব তোমরা হারাম করো না।'[১]

একবার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ স.-এর স্ত্রীদের কাছে তাঁর গোপন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর তারা নিজেদের আমলকে কম মনে করলেন। তারপর তাদের একজন বললেন, আমি গোশত খাবো না। অপর জন বললেন, আমি বিয়ে করবো না এবং কেউ কেউ বললেন, আমি বিছানায় ঘুমাবো না। এসব কথা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কানে পৌঁছলে তিনি বললেন, 'এদের কি হলো যে, এরা এমনসব কথা বলছে? অথচ আমি সাওম পালন করি আবার ইফতার করি। ঘুমাই আবার রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করি। গোশত খাই, বিয়েও করেছি। যারা আমার সুন্নাহ্ হতে বিমুখ হয়েছে তারা আমার দলভুক্ত নয়।'[২]

উক্ত হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ স. সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনকে তাঁর সুন্নাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং যারা তার ওপর আমল করে না তাদেরকে নিজের দলভুক্ত নয় বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

১২.৬. জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য : ইসলামী শরী'আহ্ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ ও সহজ-সরল জীবনপদ্ধতি অনুসরণকে স্বাগত জানায় এবং এটিকেই যুক্তিযুক্ত বলে অভিহিত করে। এরূপ জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিখ্যাত সাহাবি সালমান ফারসি রা. রাসূলুল্লাহ্ স.-এর ধন্যবাদ পেয়েছিলেন। একদিন তিনি আবু দারদা রা.-এর বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর স্ত্রী (উম্মে দারদা) অতি সাধারণ পোশাক পরে আছেন। তখন সালমান ফারসি রা. তাঁকে বললেন, আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আপনার ভাই আবু দারদা তাঁর তো দুনিয়াতে কিছুর প্রয়োজন নেই। অতঃপর আবু দারদা এসে সালমান ফারসিকে স্বাগত জানালেন এবং সামনে কিছু খাবার আনলেন। অতঃপর বললেন, আপনি খান। আমি তো সিয়াম পালন করছি। এ কথা শুনে সালমান রা. বললেন, আপনি না খেলে আমিও খাবো না। তখন তিনি খেলেন তারপর যখন রাত এলো, তখন আবু দারদা রা. সালাতে দাঁড়ালেন। সালমান রা. তাঁকে বললেন, আপনি ঘুমিয়ে নিন। তখন তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে (নফল ইবাদতের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালে সালমান রা. তাঁকে বললেন, বন্ধু আরো ঘুমান। অবশেষে যখন রাত শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছল তখন সালমান রা. তাঁকে বললেন, বন্ধু এখন উঠুন। তখন তাঁরা

---

[১]আল কুরআন, ৫ : ৮৭।

[২]সহিহ আল বুখারি ও মুসলিম।

www.pathagar.com

দু'জনেই উঠে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সালমান রা. তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনার ওপর আপনার রবের হক আছে, আপনার ওপর আপনার নিজের হক আছে এবং আপনার ওপর আপনার পরিবারের হক আছে। সুতরাং প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করবেন। অতঃপর আবুদ দারদা রা. এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ স.-কে শোনালেন। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'সালমান সত্য কথাই বলেছে।'[১] অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, সালমান জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ্ জীবনের সকল কাজ ও বিষয়ের মধ্যে এভাবেই ইনসাফ ও সহজপন্থা অবলম্বন করতে শেখায়। মানুষ কখনো কঠোরতা পছন্দ করে না তাই প্রয়োজন হলো আইন-কানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহজ ও মধ্যপন্থা অনুসরণ করা।

১৩. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী শরী'আহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সুবিচার ছাড়া মানুষের সম্মান, আত্মসম্মান, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সাম্য সর্বোপরি মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে আইনের শাসনের ওপর। আইনের শাসন ছাড়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সম্ভব নয়। ন্যায়বিচারহীন সমাজে হানাহানি, রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ার কারণে সে জাতি ধ্বংসের মুখে পতিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'যদি কোনো জাতির মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকে তখন তাদের মধ্যে রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ে।'[২]

আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, ইসলামী শরী'আহ্র পুরোটাই সুবিচারপূর্ণ, সবটাই আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানি, গোটা শরী'আহ্ই কল্যাণ ও হিকমত। সুতরাং যেখানে সুবিচার নেই জুলুম আছে, দয়া-মমতা নেই কঠোরতা আছে, কল্যাণ নেই অকল্যাণ আছে এবং প্রজ্ঞা নেই নির্বুদ্ধিতা বা বোকামি আছে, তার সাথে শরী'আহ্র কোনো সম্পর্ক নেই।'[৩]

১৩.১. আদল ও সুবিচার : সুবিচারের আরবি প্রতিশব্দ হলো আদল (عَدْلٌ)। আদলের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো justice, বাংলায় এর অর্থ করা যায় সমান করা, ন্যায়বিচার, সুবিচার, ইনসাফ ইত্যাদি। কোনো বস্তুকে সমান অংশের কিছু

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আদাব, বাবু সুনয়িত ত্ব'আমি ওয়াত্ তাকাল্লুফি লিদ্দাইফি ও তিরমিযি।
[২]মুয়াত্তা, কিতাবুল জিহাদ।
[৩]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫।

www.pathagar.com

পরিমাণও কম-বেশি না করে যার যতটুকু প্রাপ্য আছে তা আদায়ের যথাযথ সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নাম আদল বা ন্যায়পরায়ণতা। দুটি বস্তু বা দুই ব্যক্তির মাঝে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য হচ্ছে, তাদের উভয়ের মাঝে সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা। প্রত্যেক বিষয়ে দুই প্রান্তিকতায় আক্রান্ত না হয়ে ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রবণতা সৃষ্টি করা। আর মানবজাতির মধ্যে এ ধরনের আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য।[১]

আদলের বিপরীত শব্দ 'জুলুম', যার অর্থ কোনো বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে না রাখা, সুবিচার না করা, অবিচার করা ইত্যাদি। যেখানে ন্যায়বিচার থাকবে না সেখানে বিরাজ করবে জুলুম ও সীমালঙ্ঘন। মূলত ন্যায়বিচার ও মানবতাবোধের অভাব এবং জুলুমের প্রসারের কারণেই প্রাক ইসলামী যুগে মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল।

১৩.২. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব : আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যেসব মূলনীতির ওপর ইসলামী শরী'আহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য নির্ভর করে তার মধ্যে একটি হলো আদল বা ন্যায়বিচার। ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদল শব্দটি ব্যবহার করে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। কেননা আদল এমন একটি পরিভাষা যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ন্যায়বিচারের শেকড়।

আদল বা ন্যায়বিচারের আবেদন সার্বজনীন এবং এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র আদল বা ন্যায়বিচারের কর্মপরিধি রয়েছে। শুধু আদালতের কাঠগড়ায় নয়; বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আদল প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব রয়েছে। সন্তানদের মধ্যে, একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে, লেখক হিসেবে লেখার ক্ষেত্রে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগেই রয়েছে আদলের প্রয়োজনীয়তা।

১২.৩. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ : আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের বহু স্থানে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ—'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।'[২]

---

[১]ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, আল-মাকাসিদুল আম্মা লিশ-শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ। আরো দেখুন, ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, ২০০৬, পৃ. ৪১।
[২]আল কুরআন, ৫৭ : ২৫।

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশে দিয়ে মহান আল্লাহ্র বাণী : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ—'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।'[১] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কুরআনে কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ে এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। সমগ্র কুরআনে এ সম্পর্কিত এ আয়াতটি ছাড়া অন্য কোনো আয়াত না থাকলেও শুধু এ আয়াতটিই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ও পথনির্দেশের জন্য যথেষ্ট হতো।

আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী : 'ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হবেন। আর অত্যাচারী রাষ্ট্রনায়করা সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও সর্বাধিক শাস্তি প্রাপ্ত হবে।[২] 'সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা সে দিন ছায়া দেবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, তাদের একজন হলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক।'[৩] ন্যায়বিচারকের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'যে বিচারে ভালো, সে-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি।'[৪] 'তুমি সুবিচার করো। দু'পক্ষের মধ্যে সুবিচার করে দেয়া সাদাকাহ্ তুল্য।'[৫]

১৩.৪. আইনের চোখে সবাই সমান : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি অনস্বীকার্য বিষয় হলো, আইনের চোখে সকল মানুষ সমান। এখানে ধনী-গরিব ও নারী-পুরুষের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। ব্যবধান নেই শক্তিধর ও দুর্বলের মাঝে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى—'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর।'[৬]

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ স. আল্লাহ্র রাসূল ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে রাখেননি। একদা তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, আমার কাছে কারো কোনো প্রাপ্য থাকলে সে যেন আমার নিকট থেকে তা চেয়ে নেয় এবং কারো ওপর কোনো অবিচার করে থাকলে সে যেন আমার কাছ থেকে তার প্রতিশোধ নেয়। এ কথা শুনে সাওদা

---

[১]আল কুরআন, ১৬ : ৯০।
[২]মুসনাদে আহমাদ।
[৩]সহিহ মুসলিম।
[৪]সহিহ মুসলিম।
[৫]প্রাগুক্ত।
[৬]আল কুরআন, ৫ : ৮।

www.pathagar.com

ইবনে কায়স রা. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল স. আপনি যখন তায়েফ থেকে ফিরছিলেন, তখন আপনি উটের পিঠে আরোহী ছিলেন। আপনার উট চালানোর চাবুকটি ওপরে তোলার সময় আমার পেটে লেগেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ স. নিজের পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, আজ তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করো। তখন সাওদা ইবনে কায়েস রা. রাসূলুল্লাহ্ স.-এর পিঠে মুখ রাখার অনুমতি নিয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার স্থানের বিপরীতে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্র নিকট মুক্তি চাই। রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, হে সাওদা! তুমি কি প্রতিশোধ নিচ্ছ, নাকি ক্ষমা করে দিচ্ছ? সাওদা র. বললেন, আমি বরং ক্ষমা করে দিচ্ছি।[১]

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ যে সমান তার আরো একটি অনন্য নির্দেশনা রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণীতে। তিনি বলেন, 'মনে রেখো তোমাদের পূর্বে যত জাতি অতিবাহিত হয়েছে তাদের অবস্থা ছিল যে, তাদের মধ্যকার কোনো অভিজাত বা ভদ্রলোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো আর দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার ওপর আইন ও দণ্ড কার্যকর হত। আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মদতনয়া ফাতিমাও যদি চুরি করত অবশ্যই আমি তার হাত কেটে ফেলার আদেশ দিতাম।[২]

১৩.৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি আধুনিক ইস্যু হলেও ইসলামী শরী'আহ্ অনেক আগেই এটিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন বলেন, খলিফা উমর রা.-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করেন এবং সর্বত্র ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেন।[৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রধান মূলনীতি হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। খিলাফতে রাশেদার সময় খলিফাগণ বিচারপতিকে নিয়োগ দিলেও বিচারপতি খলিফার বিরুদ্ধে রায় দিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তারা বিচারপতির ওপর কোনো ধরনের চাপ বা প্রভাব খাটাতো না। এমনকি বিচারপতি খলিফার বিরুদ্ধে কোনো রায় দিলে তা কার্যকর হতো। খলিফা উমর রা. ও সাহাবি উবাই ইবনে কাব রা. বাদি ও বিবাদি হয়ে যায়িদ ইবনে সাবিত রা.-এর আদালতে উপস্থিত হন। যায়িদ রা. দাঁড়িয়ে উমর রা.-কে তাঁর আসনে বসাতে চাইলেন; কিন্তু উমর

---

[১]উদ্ধৃত: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, পৃ. ২৬২-২৬৩।
[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল হুদুদ, বাবু ইকামাতিল হুদুদি আলাশ শারিফি ওয়াল অদি'ঈ।
[৩]ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দামা, বৈরুত, দারুল হাদিস, ২০০০, পৃ. ২২১।

www.pathagar.com

রা. সেখানে না বসে উবাই রা.-এর সাথে বসলেন। অতঃপর উবাই রা. তাঁর আর্জি পেশ করলেন। কিন্তু উমর রা. সে অভিযোগ অস্বীকার করলেন। নিয়ম অনুযায়ী বিচারকের উচিত ছিল উমর রা.-এর নিকট থেকে কসম আদায় করা। কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন। উমর রা. নিজে কসম খেয়ে মজলিস সমাপ্তির পর বললেন, 'যতক্ষণ যায়িদের কাছে একজন সাধারণ মানুষ ও উমর সমান না হয়, ততক্ষণ যায়িদ বিচারক হতে পারে না।'[১]

আলী রা. তাঁর খিলাফতকালে শুরাইহ্ রা.-কে বিচারক নিয়োগ করেন। সে সময় এক ইহুদি খলিফা আলী রা.-এর লৌহবর্ম চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি এ ব্যাপারে কোনো পুলিশির ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আদালতে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন। আদালতের বিচারক কাজি শুরাইহ্ রা. তাঁকে অভিযোগের পক্ষে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। খলিফা আলী রা. তাঁর দু'পুত্র ইমাম হাসান ও হুসাইন রা.-কে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করলেন। কিন্তু তাঁরা দু'জন খলিফার নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে বিচারক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করে মামলাটি খারিজ করে দেন। এদিকে ইহুদি নিজেই তার কৃত অপরাধ স্বীকার করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

কোনো শাসকের অধীনে যথার্থ রায় প্রদান করা সম্ভবপর না হলে বা জালিম শাসক বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করলে বা কোনো বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করতে বাধা প্রদান করলে বিচারকের পদ গ্রহণ করা উচিত নয়। এ কারণে ইমাম আবু হানিফা র. উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে কাজির পদ গ্রহণ করেননি। তিনি সেখানে কাজির মর্যাদা দেখতে পাননি। সেখানে খলিফার ওপর আইনের বিধান প্রয়োগের সুযোগ ছিল না। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, খলিফাগণ তাঁকে অত্যাচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে, তাঁর দ্বারা অন্যায় ফয়সালা জারি করা হবে এবং তাঁর ফয়সালার ওপর খলিফা এবং প্রাসাদের অন্যান্য ব্যক্তিও প্রভাব খাটাবে। বিচার বিভাগ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা র.-এর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল এই যে, 'ন্যায়ের খাতিরে বিচারককে কেবল শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ ও প্রভাব থেকে মুক্তই হতে হবে না; বরং তাঁকে এতটুকু ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে যে, স্বয়ং খলিফাও যদি জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তিনি যেন তাঁর ওপরও নির্দেশ জারি করতে পারেন। খলিফা যদি এমন কোনো অপরাধ করে যা মানুষের

---

[১]বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ১০, পৃ. ১৩৬।

[২]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম র. খিলাফতে রাশেদা, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৭২।

www.pathagar.com

অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত, তখন মর্যাদায় তাঁর নিকটতম কাজি তাঁর ওপর নির্দেশ জারি করতে পারবেন।[১]

১৩.৬. ন্যায়বিচারের সোনালি ইতিহাস : ইসলামের সোনালি ইতিহাসের সর্বত্র ন্যায়বিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে ক্ষুদ্র পরিসরে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই দু'একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো :

একবার উমর রা. আম্মার ইবনে ইয়াসার রা.-কে মহাবীর খালিদ ইবনে ওলিদ রা.-এর হিসাব-নিকাশ নেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। অথচ খালিদ ইবনে ওলিদ ছিলেন মুসলিম বাহিনীর চির বিজয়ী বীর সেনানায়ক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। প্রশাসনিক কারণে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আম্মার রা. খালিদকে পাগড়ি দিয়ে তাঁর গলা পেঁচিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হলে এবং তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হলে আম্মার রা. তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দেন এবং নিজ হাতে তাঁর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেন। এ ব্যবহারকে খালিদ রা. মোটেই আপত্তিকর মনে করেননি। কারণ তিনি জানতেন যে, ওই ব্যক্তি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকটতম সাথী আম্মার, যিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রথম সারির লোক এবং যার সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে উমর রা. বলেছেন, 'তিনি তো আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের আর এক নেতাকে মুক্ত করেছেন।'[২]

ন্যায়বিচারের একটি দৃষ্টান্ত হলো আমর ইবনুল আস রা.-এর বিচার : খলিফা উমর রা.-এর সময় মিসরের গভর্নর ছিলেন আমর ইবনুল আস রা.। সে সময় একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার খৃস্টানপল্লিতে হইচই পড়ে গেল যে, কেউ একজন যিশুখৃস্টের প্রস্তরমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খৃস্টানরা ধরেই নিয়েছিল যে এটা মুসলমানদের কাজ। তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং খৃস্টান বিশপ আমর ইবনুল আস রা.-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করল। ঘটনার বিবরণ শুনে গভর্নর দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে মূর্তিটি নতুনভাবে তৈরি করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খৃস্টান নেতারা এ রায় মেনে নিলেন না। তারা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠল এবং মুহাম্মদ স.-এর মূর্তি তৈরি করে তাঁর নাক ভেঙ্গে দিতে উদ্ধত হলো।

---

[১]আল মাক্কি, খ. ২, পৃ. ১০০। উদ্ধৃত: সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র., খেলাফত ও রাজতন্ত্র, আধুনিক প্রকশনী, ১৯৮৫, পৃ. ২৬১।

[২]সাইয়েদ কুতুব শহীদ র. তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, অনুবাদ : হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, সূরা আবাসা, পৃ. ৬৪-৬৫।

www.pathagar.com

আমর ইবনুল আস রা. কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোনো প্রস্তাব আমি মেনে নিতে রাজি আছি। আমাদের যে কোনো একজনের নাক কেটে আপনাদেরকে দিতে প্রস্তুত আছি, যার নাক আপনারা চান।'

খৃস্টান নেতারা এ প্রস্তাবে রাজি হলো। পরের দিন এক বিশাল ময়দানে মুসলমান ও খৃস্টানরা সমবেত হলো। মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রা. সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বলেন, 'এ দেশের শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন, আপনি আমার নাসিকা ছেদন করুন।'

এ কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খৃস্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব। সে নীরবতায় নিঃশ্বাসের শব্দ করতেও যেন ভয় হয়। সহসা নীরবতা ভঙ্গ করে একজন মুসলিম সৈন্য এগিয়ে এলেন। চিৎকার করে তিনি বলে উঠলেন, 'আমিই দোষী, সেনাপতির কোনো অপরাধ নেই। আমিই মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি, এই যে তা আমার হাতেই আছে। তবে মূর্তি ভাঙ্গার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। মূর্তির মাথায় বসা একটি পাখির দিকে তীর নিক্ষেপ করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

সৈন্যটি এগিয়ে এসে বিশপের তরবারির নিচে নিজের নাসিকা পেতে দিল। স্তম্ভিত বিশপ, নির্বাক সকলে। বিশপের অন্তরাত্মা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তরবারি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিশপ বললেন, 'ধন্য সেনাপতি, ধন্য বীর সৈনিক, আর ধন্য আপনাদের মুহাম্মদ স.-যাঁর মহান আদর্শে আপনাদের মতো মহৎ, উদার, নির্ভীক ও শক্তিমান ব্যক্তি গড়ে উঠেছে। যিশুখৃস্টের প্রতিমূর্তির অসম্মান করা হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার চেয়েও অন্যায় হবে যদি আজ আমি এই সুন্দর ও জীবন্ত দেহের অঙ্গহানি করি। সেই মহান ও আদর্শ নবীকেও আমার শ্রদ্ধা জানাই।'[১]

১৪. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা

ইসলামী শরী'আহ্র আরো একটি উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামে সাম্য সম্পর্কীয় উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ইসলাম কোনো শ্রেণিবৈষম্য স্বীকার করে না। মানুষে মানুষে, শ্রেণিতে শ্রেণিতে কোনো ব্যবধান সৃষ্টির অবকাশ ইসলামে নেই।

---

[১]মুহাম্মদ তৌহিদুল আজম চৌধুরী, ইতিহাসের আলোকে ইসলামী সমাজে অমুসলিমের অধিকার, মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বর্ষ ১৪, সংখ্যা ২. ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৯১-৯২।

www.pathagar.com

ইসলামী শরী'আহ্র সাম্যনীতির দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, জন্মগতভাবে সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। তারা সকলেই এক আদম ও মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানবিক চেতনা, চাহিদা ও অনুভূতির দিক থেকে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ও বিভাজন তৈরি করা সমীচীন নয়। অর্থনৈতিক পার্থক্যের ভিত্তিতে কারো মর্যাদার পার্থক্য বিচার্য নয়। দ্বিতীয়ত, আইনের চোখে সবাই সমান। ধনী-দরিদ্র বিবেচনায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য হতে পারে না।

ইসলামী শরী'আহ্র সাম্যনীতি সম্পর্কে আল কুরআন ও সুন্নাহ্তে বহু নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের প্রতিটি ইবাদত সাক্ষ্য দেয় সামাজিক সমতার। সালাতে একই কাতারে দাঁড়ায় চাকর ও মনিব। এতে সকলে বুঝতে পারে, তারা সকলেই চিরুনির কাঁটার মতো সমান। হজ্ব মুসলিম বিশ্বের বার্ষিক মহাসম্মেলন। সেখানে পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্যে একই রকম পোশাক পরে এক আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়। সেখানে ধনী-গরিব, সাদা-কালো, উঁচু-নিচু, শ্রেণি-পেশার কোনো পার্থক্য থাকে না।

ইসলামে সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদের অস্তিত্ব নেই বলেই আমরা উমর রা.-এর কণ্ঠে শুনতে পাই, 'আবু বকর রা. আমাদের নেতা আর তিনি আমাদের এক নেতা বেলাল রা.-কে আযাদ করেছেন'। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ স. ঘোষণা করেছেন, 'কোনো অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোনো আরবের ওপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব। কোনো কালোর ওপর কোনো সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোনো সাদার ওপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব, তবে তাক্ওয়া ছাড়া।'[১]

জনৈক সাহাবি কর্তৃক তার ভৃত্যকে গালি দেয়া এবং তার মা সম্পর্কে খারাপ কথা বলায় রাসূলুল্লাহ্ স. তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে তাকে তা-ই পরায়।'[২]

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা যেখানে জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সকল ভেদাভেদ মুছে ফেলার তাগিদ দেয়। সামাজিক অসমতা দূর, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, দাসদের অবস্থার উন্নতি বিধান করার মাধ্যমে ইসলামী শরী'আহ্ মানুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাই বলা যায়, সামাজিক বৈষম্য

---

[১]ইমাম তাবারানি, মু'জামুল কাবির, চতুর্থ অধ্যায়।

[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল ঈমান, বাবু আল মা'আসি মিন আমরি আল জাহিলিয়্যাহ।

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে এমন কোনো কিছুই ইসলামী শরী'আহ্‌র অংশ হতে পারে না।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ স. বিশ্ববাসীকে সাম্য-মৈত্রী, স্বাধীনতা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বাণী শুনিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কাছে ধর্মভেদ কোনো বিচার্য বিষয় ছিল না। তাঁর চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ স. তার সাথে সদয় আচরণ করেছেন। তিনি বিধর্মী অতিথির মল-মূত্র স্বহস্তে ধৌত করেছেন। সকলের সাথে মিলেমিশে দায়িত্ব পালন করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় সকলের সাথে মাটি কেটেছেন এবং মাটির বোঝা মাথায় তুলেছেন। যাবতীয় অসমতা দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর এই সর্বব্যাপী প্রয়াস ইতিহাসে আজো স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে।

একবার আমাদের প্রিয় নবী স. কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতা ওৎবা, শায়বা, আবু জাহল, আমর ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ, ওলিদ ইবনে মুগিরা এবং রাসূলুল্লাহ্ স.-এর আপন চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব-এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় রত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল আরবের এ ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত ও শক্তিধর ব্যক্তিদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা। তারা ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কায় মুসলমানদের দুর্দিনের অবসান ঘটবে। এমন সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম নামের এক অন্ধ সাহাবি এসে হাজির হন। তিনি জানতেন না যে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হচ্ছে। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে অনুরোধ করলেন আল্লাহ্‌প্রদত্ত শিক্ষা থেকে কিছু শেখাতে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাঝে এমন ঘটনার উদ্ভব হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ স.-এর একটু খারাপ লাগল এবং এর প্রভাব তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠল। এর পরই মহান আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করে কঠোর ভাষায় বললেন, 'তিনি (নবী করিম স.) ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর সামনে অন্ধ লোকটি এসেছিল। আপনি কেমন করে জানবেন যে, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হতো কিংবা সে উপদেশ কবুল করত; ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত। কিন্তু যে ব্যক্তি বেপরওয়া ভাব দেখায় আপনি তো তার প্রতিই মনোযোগ প্রদান করছেন। অথচ আপনার ওপর কোনো দায়িত্ব নেই যদি সে পরিশুদ্ধ না হয়। আর যে ব্যক্তিটি আপনার কাছে দৌড়ে এলো এবং যে ব্যক্তিটি আল্লাহ্‌কে ভয়ও করে আপনি তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করলেন।'[১]

উক্ত ঘটনাটি গভীরভাবে ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয় এই কারণে যে, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ স.-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে

[১]আল কুরআন, ৮০ : ১-১০।

www.pathagar.com

একজন অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি তাঁর বিরক্ত হওয়ার কারণে। এ ঘটনার মাধ্যমে ইসলামের অপার সৌন্দর্যের একটি দিক ফুটে উঠেছে।

উক্ত ঘটনার পর থেকে রাসূলুল্লাহ্ স. যখনই আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে দেখেছেন তখনই অত্যন্ত হৃদয়াবেগ নিয়ে অভিনন্দন জানাতেন এবং মুচকি হেসে সম্বোধন করে বলতেন, স্বাগতম বন্ধু হে, বন্ধু আমার! তোমার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দারুণভাবে তিরস্কার করেছেন। মদিনায় হিজরত করার পর দু'দুবার রাসূলুল্লাহ্ স. তাঁকে নিজের অনুপস্থিতিতে মদিনার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[১]

প্রকৃতপক্ষে উক্ত ঘটনার মাধ্যমে ইসলামের সামাজিক সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ্র এ নির্দেশনার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে চলে আসা শ্রেণিবৈষম্যের কবর রচনা করা হয়েছে। এখানে কোনো ব্যক্তির মর্যাদা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধনসম্পদ, শক্তিসামর্থ্য কোনো বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি যদি কিছু থেকে থাকে তা হলো ঈমান, তাকওয়া ও পরহেযগারি। উক্ত ঘটনার মাধ্যমে সম্ভবত একটি সভ্যতার নতুন জন্ম হলো। সাইয়েদ কুতুব শহিদ র. বলেন, 'আর এ কারণেই বলা যায়, ইসলামের এই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ছিল গোটা মানবজাতির জন্যে এক পুনর্জন্মের শামিল। সত্য বলতে কি, প্রথম মানুষ সৃষ্টির থেকেও এ পুনর্জাগরণ ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সংস্পর্শে তৎকালীন আরবের মানুষ পার্থিব সম্পর্ক, মান-সম্ভ্রমের নীতি ও উঁচু-নীচুর ব্যবধান থেকে মুক্তি লাভ করে।[২]

ইসলামের সামাজিক সৌন্দর্য বর্ণনায় সাইয়েদ কুতুব শহিদ র. তাঁর 'তাফসির ফি যিলাযিল কুরআন'-এ বহু স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু তুলে ধরা হলো[৩] : তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ভেদাভেদ ও উঁচু-নীচুর কৃত্রিম ব্যবধানকে খতম করার মানসে রাসূলুল্লাহ্ স. তাঁর নিজ ফুফাতো বোন যয়নাব বিনতে জাহাশকে তাঁর আযাদ করা ক্রীতদাস হারেসার পুত্র যায়েদের সাথে বিবাহ দিয়ে ছিলেন।

এরপর তিনি মুতার কঠিন রণক্ষেত্রে যায়েদকে সেনাপতি বানিয়ে পাঠালেন। এই যুদ্ধে তাঁর অবর্তমানে পর্যায়ক্রমে সেনাপতির দায়িত্বভার প্রদানের জন্য জাফর ইবনে আবি তালিব রা. এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রা.-এর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত এই সেনাদলে ছিলেন

---

[১]সাইয়েদ কুতুব শহীদ র., তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, প্রাগুক্ত, সূরা আবাসা, পৃ. ৫৯।

[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

[৩]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬৬।

www.pathagar.com

মহাবীর খালিদ ইবনে ওলিদসহ আনসার ও মুহাজিরদের বড় বড় নেতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু এই দলের সেনাপতি যায়েদ ছিলেন একজন মুক্ত ক্রীতদাস। একজন মুক্ত ক্রীতদাস পতাকা হাতে সামনে অগ্রসর হয় আর পেছনে পেছনে যায় আনসার-মুহাজিরদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ। কোন সে পরশমণি যার সংস্পর্শে এসে উচ্ছৃঙ্খল, দুর্ধর্ষ ও অনমনীয় আরব শার্দুলরা ভারসাম্যপূর্ণ ও অনুগত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল? কোন সে মহান বাণী যার সংস্পর্শে দুর্দম্য সামাজিক ব্যবধানের খোলস এভাবে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল? স্বীকার করতেই হবে, এটা ছিল ইসলামের অমূল্য পরশপাথর যার কারণে কয়লা পরিণত হয়েছিল সোনায়।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের আরো একটি পদক্ষেপ ছিল এই যায়েদ পুত্র উসামাকে তৎকালীন রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে পরিচালিত 'গাযওয়ায়ে রোম'-এর সেনাপতি করা। এই সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ স.-এর দুই প্রধান সঙ্গী ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা আবু বকর ও উমর রা.। আরো ছিলেন একেবারে প্রথম দিককার ইসলাম গ্রহণকারী সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসসহ আনসার ও মুহাজিরদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ। তরুণ সেনাপতি উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্ব নিয়ে কেউ কেউ কিছু সমালোচনা করল। এ কথা রাসূলুল্লাহ্‌ স.-এর কানে এলে তিনি দুঃখের সাথে বললেন, 'তোমরা আজ উসামার সমালোচনা করছ, এমনি করে এর পূর্বে একদিন তাঁর পিতা যায়েদের বিরুদ্ধেও তোমরা নানা কথা বলেছিল। অথচ শোন! আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, তখন সেনাপতি পদের জন্য আমার বিবেচনায় যায়েদ ছিল সব থেকে বেশি যোগ্য এবং সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয়, আর আজ তাঁর ছেলে এই তরুণ যুবক উসামা আমার কাছে সকল মানুষ থেকে উত্তম।'[১]

খিলাফতের পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর আবু বকর রা. প্রথম যে কাজটি করেন তা হলো উসামাকে সেনাপতি বানিয়ে যে বাহিনীকে প্রেরণের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূল স. প্রস্তুত করেছিলেন সেই বাহিনীকে রওয়ানা করিয়ে দেয়া। এই বাহিনীকে বিদায় দিতে গিয়ে তিনি মদিনার বাইরে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে যান। এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য, উসামা এগিয়ে চলেছেন সওয়ারির পিঠে চড়ে আর মুসলিম বিশ্বের খলিফা চলেছেন তাঁর পাশাপাশি পায়ে হেঁটে। লজ্জায় অস্থির হয়ে ওঠেন তরুণ উসামা। তিনি নওজোয়ান হয়ে থাকবেন সওয়ারিতে, আর বৃদ্ধ আবু

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আহকাম, বাবু মান লাম ইয়াকতারিস বিত্ব'অনি মান লা ই'অলামু ফিল উমরায়িল হাদিসা।

www.pathagar.com

বকর রা. পায়ে হেঁটে চলবেন তাঁর সাথে– এ কী করে হয়! তাই অধীর হয়ে তিনি বলে উঠলেন, হে রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, হয় আপনি কোনো সওয়ারিতে আরোহণ করুন অথবা আমি নেমে পড়ি। জবাবে খলিফা কসম দিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি নামবে না। আর আমিও সওয়ারিতে চড়বো না। আমার কি এমন অবস্থা হলো যে, আমি আল্লাহ্‌র পথে জেহাদের কাজে একটি ঘণ্টাও দুটি পায়ে ধুলো মাখাতে পারবো না?

আরও একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, আবু বকর রা. ভাবছেন খিলাফতের কাজে সাহায্য করার জন্য উমর রা.-কে তাঁর প্রয়োজন, কিন্তু তিনি তো উসামার বাহিনীর একজন সৈনিক। উসামা তাঁর আমির। অতএব তাকে পেতে হলে উসামার অনুমতি প্রয়োজন। তখন খলিফা বলছেন, আপনি যদি অপছন্দ না করেন, উমরকে ছুটি দিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করবেন? কী বিনীত অনুরোধ! মুসলিম জগতের খলিফা হয়ে তিনি অনুমতি চাইছেন খিলাফতের কাজের জন্যে তাঁরই অধীন একজন তরুণ সেনাপ্রধানের কাছে। এ ধরনের মহানুভবতা প্রদর্শন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানিতে এবং রাসূলুল্লাহ্ স. কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব।[১]

যখন আরব ও আযম বা আরবি ও ফারসি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প ছড়ানো হচ্ছিল তখন সালমান ফারসি রা.-কে নিয়ে নিন্দনীয় কথা শুরু হলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ স. এই হীন মনোবৃত্তিকে চিরতরে খতম করার জন্য ঘোষণা দিলেন, 'সালমান আমাদের লোক, সে আহলে বাইতের একজন সদস্য।'[২]

একবার আবু যর গিফারি ও বিলাল রা.-এর মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হলে হঠাৎ করে আবু যর গিফারির মুখ ফসকে বের হলো, 'ওহে কালো মায়ের সন্তান।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ স. ভীষণভাবে রেগে গেলেন এবং আবু যরের মুখের ওপর বলে দিলেন, 'শোন আবু যর, তুমি খুব বেশি রকম বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। তুমি নিজের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছ। তুমি নিজে তোমার আমলনামাকে কালিমালিপ্ত করেছ। জেনে রেখো তোমার মতো ফর্সা মায়ের সন্তানের জন্য কালো মায়ের সন্তানের ওপর গৌরবান্বিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।' রাসূলুল্লাহ্ স.-এর এ কঠোর বাণী আবু যর রা.-এর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করল। তিনি ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলেন এবং মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে কসম খেয়ে এই বলে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, বেলাল রা. নিজে তাঁর মাথা পদদলিত না করা

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

www.pathagar.com

পর্যন্ত তিনি মাথা তুলবেন না। এভাবে তিনি তাঁর অপরাধ স্খলনের প্রায়শ্চিত্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন।[১]

জুলাইবিব ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। এক আনসারি মহিলার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ্ স. নিজেই পাঠান। এতে ওই মহিলার বাপ-মা অস্বীকার করলে মহিলা বললেন, আপনারা কি আল্লাহ্‌র রাসূল স.-এর প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন? তিনি যদি খুশি মনে ওই ব্যক্তির সাথে আপনাদের আত্মীয়তা করার জন্য রাজি হয়ে থাকেন তাহলে আপনারাও খুশি মনে রাজি হয়ে যান এবং ওই ব্যক্তির সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন। তখন তারা রাজি হলেন এবং সেই মেয়েটিকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।[২]

জুলাইবিব এ বিয়ের অল্প দিন পরে এক যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এ বিষয়ে আবু বারযাহ্ আসলামি রা.-এর বর্ণনা পাওয়া যায়, যাতে তিনি বলেছেন, তিনি একটি যুদ্ধে শরিক হয়ে শাহাদত বরণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ স. তাঁকে খুঁজতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাউকে কি তোমরা খুঁজে পাচ্ছ না?' রাসূলুল্লাহ্ স. আবারও বললেন, 'আর কেউ কি হারিয়েছে?' উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন, 'জি না ইয়া রাসূলাল্লাহ, আর কেউ হারিয়ে যায়নি।' তখন রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'কিন্তু আমি তো জুলাইবিবকে খুঁজে পাচ্ছি না।' তারপর সবাই তাঁর অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সাতটি মৃতদেহের কাছে তাঁর লাশটিও পাওয়া গেলো। ওদেরকে হত্যা করার পর তিনি শহিদ হয়েছেন। তখন নবী স. নিজে তাঁর লাশের কাছে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বললেন, 'সে সাতজনকে হত্যা করার পর ওরা তাঁকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে, সে আমার পরিবারের লোক, আমিও তাঁর পরিবারের একজন।'

তারপর রাসূলুল্লাহ্ স. তাঁকে নিজের দু'হাতের ওপর তুলে নিলেন। তাঁকে কবরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর দুটি হাত ব্যতীত কোনো খাটিয়া ব্যবহার করা হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, জুলাইবিবের কবর খোঁড়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ স. নিজ হাতে তাঁর লাশ কবরে রাখলেন।[৩]

ইসলামের সামাজিক সাম্যনীতি সম্পর্কে ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, ইসলাম সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবসময় গণঅধিকারসম্পন্ন। বিশুদ্ধ মতে ন্যায়পরায়ণ। ইসলাম সর্বদা ভারতের হিন্দুদের মধ্যে যেমন জাতিপ্রথা বা বর্ণবাদ

---

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।

[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২; মুসনাদে ইমাম আহমাদ।

[৩]সহিহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে তাফসির ফি যিলালিল কুরআনে সুরা আবাসার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

রয়েছে অনুরূপ জাতিপ্রথার ঘোরবিরোধী। অনুরূপ ইউরোপে সামাজিক অভিজাত শ্রেণির মধ্যে যে বর্ণবৈষম্য রয়েছে তারও বিরোধী। ইসলামকে কখনো সমান অধিকারের চিন্তার বিকাশে কিংবা ইসলামী বিশ্বে সম্পদ বন্টনের জন্য গণআন্দোলনে নামতে হয়নি। যদিও কোনো কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনায় অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টির প্রতি আগ্রহ দেখা যায় তা সত্ত্বেও সমতা চিন্তা ইসলামী সমাজ থেকে কখনো দূর হয়নি।[১]

ইসলাম সামাজিক সাম্যের যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল তার সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সাক্ষ্য খোদ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও দিয়েছেন। 'গুস্তাফলুবুন' তাঁর আরব সভ্যতা নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ইউরোপে সাম্যের যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা কেবল মুখেই, বাস্তবে নেই। আর তা প্রাচ্যের মানুষের প্রকৃতিতে পুরোপুরিভাবেই মজ্জাগত। যেসব সামাজিক বৈষম্যের কারণে পাশ্চাত্যে প্রচণ্ড বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে সেসব বৈষম্যের কোনো চিহ্নই নেই। প্রাচ্যের কোনো দেশে কোনো চাকরকে মনিবের স্বামী হিসেবে দেখতে পাওয়া কোনো দুষ্কর ব্যাপার নয়। অনুরূপ শ্রমিককে মালিক হিসেবে দেখাও আশ্চর্যজনক নয়।[২]

১৫. দাসপ্রথার উচ্ছেদ

মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য হুররিয়াত (حُرِّيَّة) বা স্বাধীনতা একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি ছাড়া মানবতার সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। তদুপরি স্বাধীনতা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। ইসলামী শরী'আহ্ মানুষের এই অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং মানুষকে মানুষের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তার সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাকে শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করে।

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer)-এর মতে, স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করাকে বুঝায়, যদি সে কাজের দ্বারা অন্যের অনুরূপ কাজের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি না করে।[৩]

স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে, কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করবে।

---

[১] ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

[৩] ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা, আজিজিয়া বুক ডিপো, পৃ. ৯০।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই এক একজন খলিফা বা প্রতিনিধি। এখানে কেউ কারো দাস নয়। তাই সমাজের সকল শ্রেণিকে সম্বোধন করে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, 'তোমরা একে অপরের সমান।' ইসলাম সকল মানুষের একই উৎসস্থল ও প্রত্যাবর্তন স্থলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়, 'তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।'[১]

যেসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নবী-রাসূলগণ, বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ স. পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন তার একটি হলো মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। যেমন আল কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ—'এবং যিনি মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে এবং শৃঙ্খল হতে—যা তাদের ওপর ছিল।'[২] এ আয়াতে ব্যবহৃত 'আগলাল' (أَغْلَال) বা শৃঙ্খল শব্দের একটি অর্থ করা হয়েছে, পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল।[৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই দাসে পরিণত করা যায় না। কোনো ব্যক্তি, এমনকি রাষ্ট্রও মানুষের এ স্বাধীনতা হরণ করে তাকে দাসে পরিণত করার অধিকার রাখে না। মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো ব্যক্তির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেউ কারো প্রভু নয় আবার কেউ কারো দাস নয়- এটাই ইসলামের শিক্ষা। দ্বিতীয় খলিফা উমর রা. ইসলামের এই মহান শিক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি মানবতার মুক্তির ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেটি হলো মিসরের এক অধিবাসী সেখানকার গভর্নর আমর ইবনুল আসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল যে, 'তাঁর ছেলে আমার ছেলেকে লাঠিপেটা করেছে।' উমর রা. এ অভিযোগ শোনার পর গভর্নর ও তাঁর ছেলেকে মদিনায় ডেকে পাঠালেন এবং সুবিচারের মাধ্যমে ফরিয়াদির ছেলেকে দিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করালেন এবং সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে তিনি বললেন, 'তোমরা কখন থেকে মানুষকে দাসে পরিণত করতে শুরু করেছ অথচ তাদের মা তাদেরকে স্বাধীনরূপে জন্ম দিয়েছে?'[৪]

---

[১]সহিহ মুসলিম ও সুনান আবু দাউদ।

[২]আল কুরআন, ৭ : ১৫৭।

[৩]আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২, পৃ. ২৫৪।

[৪]আলি আল-তানতাবি ও নাজি আল-তানতাবি, আখবারু উমর, ১৯৫৯, পৃ. ২৬৮।

www.pathagar.com

পারস্য সেনাপ্রধান রুস্তম মুসলিম সেনাপতি রিবয়ি বিন আমেরকে মুসলিম জাতির পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা এমন এক জাতি, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এ জন্য প্রেরণ করেছেন যেন আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্বাধীন করে দেই।'[১]

১৫.১. দাসপ্রথা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় : দাসপ্রথা মানব ইতিহাসের এক চরম অমানবিক ও অবমাননাকর অধ্যায়। একসময় বিশ্বব্যাপী দাস প্রথার প্রচলন ছিল। 'ভূমিদাস ও গৃহভৃত্য উভয় শ্রেণির দাসদের গলায় লোহার বেড়ি পরিয়ে দেয়া হতো। তাদেরকে দলে দলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো, শূকরের পালের মতো খাওয়ানো হতো এবং শূকরের পালের চেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যে শয়নের ব্যবস্থা করা হতো। হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে এবং সকলের গলার বেড়ির ভেতর দিয়ে একটি শৃঙ্খল দিয়ে বহু দাসকে একসঙ্গে শুতে দেয়া হতো। দাসব্যবসায়ীরা হাতে ভারি গ্রন্থিযুক্ত চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত আর অবসন্ন ও ক্লান্ত দাসদের পেটাতো, যাতে তাদের লাফালাফি দেখে ক্রেতারা আকৃষ্ট হতে পারে। চাবুকের আঘাতে দাসদের শরীর থেকে গোশত খসে পড়তো।'[২]

১৮৯০ সালে ব্রাসেলসে দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ কনফারেন্সের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও দাসপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়নি। এমনকি 'মানবপ্রকৃতি অপরিবর্তনীয়'—এ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে প্লেটো ও এরিস্টটল থেকে শুরু করে আঠারো শতকের বহু দার্শনিক দাসপ্রথাকে সমর্থন করেছেন।[৩] গ্রিক, রোমান, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাসমূহে এবং ইহুদি, খৃস্টান, বৌদ্ধ ও সনাতন হিন্দু ধর্মে এমনকি আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকাতেও প্রথমদিকে দাসপ্রথা স্বীকৃত প্রথার মর্যাদা পেয়েছিল।

১৫.২. দাসপ্রথা উচ্ছেদের প্রাথমিক কৃতিত্ব ইসলামের : দাসপ্রথার ইতিহাসে নৈতিকতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রাথমিক কৃতিত্ব মহানবী স.-এরই প্রাপ্য। দাসপ্রথা উচ্ছেদের মূলে ইসলামই সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক উদ্যোগ গ্রহণ করে।

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, হাকিকাতুত তাওহিদ।

[২]স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদ- খন্দকার মশিহুদ-উল-হাছান, জ্ঞান বিতরণী, ২০১২, পৃ. ৩০২।

[৩]মোহাম্মদ মুরশেদুল হক, মানবাধিকার ও ইসলাম, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৭, ২০১১, পৃ. ১৪৯।

www.pathagar.com

প্রথম দিকে ইসলাম দাসদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা প্রদান করে। তাদেরকে মানবতার কাতারে নিয়ে আসে। ইসলাম শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং মানুষের পূর্ণাঙ্গ সমতা বিধানকে একই সাথে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে। এ নীতি অনুযায়ী সকল মানুষ সমান এবং স্বাধীন মানুষ হিসেবে মানবীয় অধিকার লাভের ক্ষেত্রে সবাই সমান।

দাসপ্রথার শেকড়ে সর্বপ্রথম কুঠারাঘাত করে ইসলাম। মহানবী স. থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল মুসলিম শাসক ও জনগণ ইসলামের এই শিক্ষায় অটল থেকেছে। মানুষকে দাস বানানোর চিন্তা কখনই মুসলিম সমাজকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। মিসর, আফ্রিকা, স্পেন, ভারতসহ মুসলিমরা যেখানেই গিয়েছে সেখান থেকেই দাসপ্রথা উচ্ছেদ করে ছেড়েছে। দাসপ্রথা সম্পর্কে ইসলামের আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে বিল দিউরান্ট বলেন, স্পেনের স্থানীয় কৃষকদের কাছে আরবদের শাসন ছিল একটা স্বল্পকালের নিয়ামত ও বরকতস্বরূপ। কারণ তারা যে ধ্বংস ও বিপর্যয়ে নিমজ্জিত ছিল আরব বিজয়ীরা তা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে এবং ভূমি দাসদেরকে সামন্তবাদের বন্দিখানা থেকে মুক্ত করেছে।[১]

দাসপ্রথা উচ্ছেদে ইসলামের অবদান বর্ণনা করতে গিয়ে বিল দিউরান্ট আরো লিখেছেন, দাসদের বিয়ে এবং তাদের সন্তানদেরকে যথেষ্ট বুদ্ধি ও মেধা থাকলে শিক্ষা দেয়ার অনুমতি মুসলিম সমাজে রয়েছে। দাসদাসীদের এমনসব সন্তানের সংখ্যা দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যাদের বুদ্ধিবিবেক জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। তাদের অনেকেই রাজা-বাদশাহ্ ও মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিল। যেমন সুলতান মাহমুদ গযনবি ও মিসরের মামালিক সম্প্রদায়।[২]

১৫.৩. ইসলাম এককথায় দাসপ্রথা উচ্ছেদ করেনি কেন : একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ স.-এর জীবদ্দশায় এককথায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হলো না কেন? এর উত্তরে জামাল আল বাদাবি বলেন, সপ্তম শতকে বিশ্বব্যাপী দাসপ্রথা এক দৃঢ় আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই দাসপ্রথা উচ্ছেদের আগে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক কাজ করার দরকার ছিল। এজন্য সময়েরও দরকার ছিল। তাই হঠাৎ করে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ না করে ব্যাপক সংস্কারমূলক কাজের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। আর এটিই ছিল সঠিক পথ। কেননা, হঠাৎ করে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হলে হয়তো আমেরিকার মতো গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারত। অষ্টাদশ শতকে আমেরিকায় দাসপ্রথা

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

www.pathagar.com

উচ্ছেদের ফলে কর্মচ্যুত দাসদের নির্মম বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কথা বিশ্ব এখনো ভোলেনি।[১]

১৫.৪. দাসপ্রথা বিলুপ্তকরণে ইসলামের কার্যকর পদক্ষেপ : দাসপ্রথা বিলুপ্তকরণ এবং ক্রমশ তা নিঃশেষের ক্ষেত্রে ইসলামই সর্বপ্রথম সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে এবং এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে দু'ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রথমত, নতুনভাবে কাউকে দাস না করা এবং দ্বিতীয়ত, যারা ইতোমধ্যে দাস হয়েছে তাদেরকে মুক্ত করা।

১৫.৫. মানুষকে দাস বানানো হারাম : স্বাধীন ও মুক্ত মানুষকে হাইজ্যাক করে বা অন্য কোনোভাবে আটক করে তাকে দাস বানানো ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। এ ছাড়া মানুষকে কোনো অবস্থাতেই বিক্রি করা ইসলামে বৈধ নয়। এমনকি কেউ নিজেকে বা নিজের স্ত্রী-সন্তানকেও বিক্রি করার অধিকার রাখে না। কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার জন্য এবং কোনো অপরাধীকে তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপও দাস বানানো বৈধ নয়।

যুদ্ধবন্দিদের দাস বানানোর রীতি ইসলামে সূচিত হয়নি। যুদ্ধবন্দিদের দাস বানানো ইসলামে বৈধ বলা হলেও এটিকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। এ পদ্ধতি কেবল তখনই গ্রহণ করার কথা বলা হয় যখন শত্রুপক্ষ মুসলিম বন্দিদেরকে দাস বানিয়ে নেয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে সমতাপূর্ণ নীতি গ্রহণের কারণে ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের দাস বানানোর ঐচ্ছিক নীতি গ্রহণ করাকে বৈধ বলা হয়েছে। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ইচ্ছে করলে বিনিময় নিয়ে কিংবা কোনো বিনিময় ছাড়াই তাদেরকে মুক্তি দিতে পারে।

এ বিনিময় বস্তুগত কিংবা অবস্তুগত উভয় হতে পারে। যুদ্ধরত কাফির বন্দিদের সম্পর্কে আল কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً— 'অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর অথবা মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দাও।'[২]

১৫.৬. দাস মুক্তকরণে ইসলামের দুই পদক্ষেপ : ইসলাম দাসদেরকে পুরোপুরিভাবে স্বাধীন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে দুটি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমটি হলো সরাসরি মুক্তিদান বা ইত্‌ক (عِتْقٌ)। অর্থাৎ প্রভুদের পক্ষ থেকে দাসদেরকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দান। আর দ্বিতীয়টি হলো মুক্তির লিখিত চুক্তি বা

---

[১]জামাল আল বাদাবী, ইসলামের সামাজিক বিধান, দি পাইওনিয়ার ও দি উইটনেস, ২০০৬, পৃ. ৩৩।
[২]আল কুরআন, ৪৭ : ৪।

www.pathagar.com

মুকাতাবাত (مُكَاتَبَةٌ)। অর্থাৎ প্রভু ও দাসদের মধ্যে মুক্তিদানের লিখিত চুক্তি সম্পাদন।[১]

ইসলামে দাসমুক্তির প্রথম পদ্ধতি হলো সরাসরি দাস মুক্ত করা। এ পদ্ধতিতে দাস মুক্তিদানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ স. নিজেই সকলের সামনে সর্বোত্তম নমুনা উপস্থাপন করেন। তিনি নিজেই তাঁর সমস্ত দাসকে চিরতরে মুক্তি দান করেন। শুধু দাস মুক্তি দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, বরং এটাকে ছওয়াবের কাজ হিসেবে ঘোষণা করেন। এর সাথে সাথে গুনাহের কাফফারা হিসেবে দাস মুক্তকরণের ঘোষণা দেন। যেমন কিরা-কসম করে তা ভঙ্গ করলে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর 'জিহার' হলে, রমযান মাসের দিনের বেলা স্ত্রী-সহবাস করলে এবং ভুলক্রমে হত্যার কাফ্ফারা হিসেবে দাস মুক্তির বিধান রয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের ফলে মুসলিম সমাজে দাসমুক্তির হিড়িক পড়ে যায়।

স্বয়ং নবী করিম স. ৬৭ জন, আবু বকর রা. বহু সংখ্যক, উমর রা. এক হাজার ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. ত্রিশ হাজার দাস-দাসীকে মুক্তিদান করেছিলেন।[২]

ইসলামে দাসমুক্তির দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো 'মুকাতাবাত'। এ পদ্ধতিতে অর্থলাভের বিনিময়ে দাসমুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা, 'আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্য হতে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাহলে তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জানতে পার যে, তাদের মধ্যে কল্যাণের সম্ভাবনা রয়েছে। (তাহলে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে।'[৩]

ইসলামে যাকাতের অর্থ দিয়ে দাসমুক্তির চিরন্তন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবার ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার বায়তুল মাল থেকে অর্থ দিয়েও তা করতে পারে।

১৫.৭. পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান : কুরআন নাযিলের সময় পৃথিবীতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দাসপ্রথা চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তি ক্রীতদাসের পরিবর্তে জাতিগত দাসপ্রথা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাতিগত দাসপ্রথা বিলুপ্তকরণে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যাবে কিনা তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। ড. ইউসুফ আল কারযাভি সাইয়্যেদ রশিদ রিজার 'তাফসির আল-মানার'-এর

---

[১]মুহাম্মদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৭৪।
[২]মোহাম্মদ মুরশেদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।
[৩]আল কুরআন, ২৪ : ৩৩।

www.pathagar.com

উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'ফির-রিকাব' (فِي الرِّقَابِ) বলে যাকাতের যে ব্যয়-খাতটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাতে পরাধীন গোত্র ও জাতিকে মুক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যাবে−যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক দাস মুক্তকরণে তা ব্যয় করা হবে না।'[১]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শায়খ মাহমুদ শালতুত বলেন, 'ব্যক্তি দাসের মুক্তকরণের সুযোগ যখন নিঃশেষ হয়ে গেছে−তখন ব্যয়ের এ ক্ষেত্রটি নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে জাতি ও গোত্রসমূহকে সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতার পাশ থেকে মুক্তিসংগ্রামে সাহায্যকরণে। কেননা এই অবস্থাটি মানবতার পক্ষে অধিকতর কঠিন, দুঃসহ ও বিপজ্জনক। এ ক্ষেত্রে মানুষ দাস হয় চিন্তা-বিশ্বাস, ধন-মাল ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের। তাদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। একটি অন্ধ জুলুমকারী শক্তি তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি করে নেয় ও রাখে। এই দাসত্বের মোকাবেলা এবং তা থেকে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাদের ওপর থেকে অপসারণ করার জন্য যাকাতের এ অংশ ব্যয় করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তা কেবল যাকাত-সাদকাহ্‌র দ্বারাই নয়, বরং সমস্ত ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়েই করতে হবে।[২]

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রথম দিকে দাসমুক্তির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল অবশিষ্ট দুনিয়ার সে পর্যন্ত পৌঁছাতে অন্ততপক্ষে সাত শ' বছর অতিবাহিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম দাসদের অনুকূলে সর্বাত্মক হিফাযত ও পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করে সমগ্র দুনিয়াকে সমুন্নত করার যে প্রয়াস দেখিয়েছে তার ধারণা প্রাচীনকাল তো দূরের কথা আধুনিক যুগের কোনো ইতিহাসেও তা বিদ্যমান নেই।[৩]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, দাসদাসী মুক্তকরণ সংবলিত কুরআন-সুন্নাহ্‌র অধিকাংশ দলিল এ কথার ওপর ইঙ্গিত করে যে, শরী'আহ্‌র মূল লক্ষ্য হলো, গোটা মানবসমাজ মুক্ত ও অবাধ জীবনযাপন করবে। শরী'আহ্ প্রণেতার এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের বিরাট অংশ স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা স্বাধীনতাকে দাসত্ব ও অধীনতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। 'কারণ মানুষ মূলগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। দাসত্ব ও অধীনতা সাময়িক বা অনন্যোপায় অবস্থার একটি ব্যবস্থা মাত্র।'[৪]

---

[১]ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৮।

[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

[৩]মুহাম্মদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৭৮।

[৪]তাফসির আল ফখরুর রাযি, খ. ৩, পৃ. ২৮৮।

www.pathagar.com

১৬. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ

ইসলামী শরী'আহ্তে মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সত্য আবিষ্কার ও তার বিস্তারের জন্য ইসলাম মতপ্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। কোনো ব্যক্তি যা বলতে, লিখতে, প্রচার বা প্রকাশ করতে চায়; তার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার অর্থ হলো তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে আওদা বলেন, বৈধ কাঠামোর মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চর্চা করা হলে তা অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে নাগরিকদের মধ্যে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধকে উৎসাহিত করে। এ ছাড়া এটি এমন এক মাধ্যম যা কল্যাণ সাধন এবং অন্যায়, বৈষম্য ও কুসংস্কার মোকাবেলায় শাসক ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।[১]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আরবিতে 'হুররিয়াত আল-রা'ই' (حُرِّيَّةُ الرَّأْيِ) বলা হয়, যার আক্ষরিক অর্থ 'মতের স্বাধীনতা'। একে 'হুররিয়াত আল কাউল' বা বাকস্বাধীনতা এবং 'হুররিয়াত আল তাফকির' বা চিন্তার স্বাধীনতাও বলা হয়।

চিন্তা হচ্ছে অন্তরের এমন একটি গোপন বিষয় এবং মানসিক কর্ম যা কথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কোনো চিন্তা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তা আইনের গণ্ডির বাইরে থাকে। চিন্তার বাহ্যিক প্রকাশকে রা'ই বা অভিমত বলা হয়। আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলতে বুঝানো হয়, 'কোনো ধরনের বিধি-নিষেধ ছাড়াই ব্যক্তি বা গ্রুপ অন্যদের কাছে তাদের চিন্তা, অভিমত বা আদর্শ প্রচার করবে, তবে সে ক্ষেত্রে তাদেরকে এ কথা বুঝতে হবে যে, তারা অন্যদেরকে তাদের কথা শুনতে বাধ্য করবে না এবং ব্যক্তির মর্যাদার জন্য আবশ্যকীয় অধিকারও ভূলুণ্ঠিত করবে না।'[২]

অন্যভাবে বলা যায়, অন্যের অধিকার লঙ্ঘন বা আইনের সীমা অতিক্রম না করে কোনো ব্যক্তি যা ইচ্ছা করে তার তা বলা বা করা অথবা তা থেকে বিরত থাকার অধিকারকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলা হয়। তবে ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নৈতিক ও আইনগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ধর্ম অবমাননা, সমাজ ও রাষ্ট্রে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এমন কথা বলার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত নয়। তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে সরকারের সমালোচনা করা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে।

---

[১]আওদা, আত-তাশরি আল যিনাল, খ. ২, পৃ. ৩৪।

[২]David H. Bailey, Public Liberties in the New States, p. 27। মোহাম্মদ হাশিম কামালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্‌র একটি নাম হচ্ছে 'আল হক' বা সত্য। আবার সত্য প্রকাশের জন্যই এসেছে আল কুরআন। যেমন, বলা হয়েছে, هَذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ— 'এটি আমার কিতাব যা তোমাদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে সাক্ষ্য দেবে।'[১]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রমাণে যেসব দলিল ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ —'তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে।'[২]

মহান আল্লাহ্‌ আরো বলেন, اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا—'আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং হক কথা বলো।'[৩] وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا—'মানুষের সাথে সদালাপ করবে।'[৪] وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ—'আর তাদেরকে পবিত্র বাক্যের প্রতি হিদায়াত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল পরম প্রশংসিত আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে।'[৫]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ স. বলেছেন, 'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা শ্রেষ্ঠ জিহাদ।'[৬] 'মুসলমানরা যা উত্তম বলে মনে করে তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও উত্তম।'[৭]

ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় কিন্তু তা নৈতিকতার বন্ধনে সীমাবদ্ধ। অন্যায়-অশ্লীল ও অনৈতিক কথা যা ব্যক্তি-সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর ইসলাম সে ধরনের কথা বলার স্বাধীনতা স্বীকার করে না। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী, لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ—'মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্‌ তা'আলা পছন্দ করেন না।'[৮]

---

[১]আল কুরআন, ৪৫ : ২৯।
[২]আল কুরআন, ৯ : ৭১।
[৩]আল কুরআন, ৩৩ : ৭০।
[৪]আল কুরআন, ২ : ৮৩।
[৫]আল কুরআন, ২২ : ২৪।
[৬]সহিহ আত-তিরমিযি, তাহকিক- মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, কিতাবুল ফিতান, বাবু মা জায়া আফদালুল জিহাহ... ও সুনান আবু দাউদ।
[৭]রাসূল স.এর হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইমাম শাতিবি র., আল-ইতিসাম, খ. ২, পৃ. ৩১৯; কেউ কেউ এটিকে প্রখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হবার সম্ভাবনা বেশি বলেই মন্তব্য করেছেন।
[৮]আলন কুরআন, ৪ : ১৪৮।

www.pathagar.com

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার শর্ত হিসেবে ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়াহ বলেন, 'হুররিয়াত আল-রা'ই বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে কল্যাণ সাধন অথবা অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।'[১]

ইসলামী শরী'আহ্ যে যা বলতে চায়, তা বলার সুযোগ দিয়েছে; তবে তার সাথে ধর্মের অবমাননা, গিবত বা পরনিন্দা, বুহতান বা মিথ্যা কলঙ্কলেপন, অবমাননা অথবা মিথ্যার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এ ছাড়া দুর্বৃত্তায়ন, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, বৈরিতা অথবা বিদ্রোহের বিস্তার ঘটানোর কোনো চেষ্টা থাকবে না তাতে। ইসলামী শরী'আহ্ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ (হিসবাহ্-حِسْبَةٌ), আন্তরিক উপদেশ দান (নাসিহাহ্-نَصِيْحَةٌ), পরস্পরের পরামর্শ (শুরা-شُوْرَى), ব্যক্তিগত যুক্তিপূর্ণ অভিমত (ইজতিহাদ-إِجْتِهَادٌ) এবং দেশ পরিচালনাকারী নেতৃবৃন্দের সমালোচনাসহ বিভিন্ন উপায়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করেছে।[২]

১৬.১. হিসবাহ্ বা সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ : মতপ্রকাশের প্রথমেই আসে হিসবাহ্ বা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (আমরু বিল মারুফ ওয়ান-নাহি-আনিল মুনকার)-এর বিষয়টি। এটি এমন একটি বিষয়, যা থেকে ইসলামী শরী'আহ্র অনেক মূলনীতি নির্গত হয়েছে। হিসবাহ্র পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইমাম গাযালি র. হিসবাহ্কে 'দীনের বৃহত্তম স্তম্ভ' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'অহির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি। আবার সমগ্র দীনের একটি মূলকথা হলো এই হিসবাহ্। একে পুরোপুরি উপেক্ষা করলে দীনের বিপর্যয় ঘটবে এবং দুর্নীতি ও অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে।'[৩] ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, ইসলামে সকল সরকারি কর্তৃত্বের মৌলিক উদ্দেশ্য হয়ে রয়েছে হিসবাহ্। ইসলাম একে সম্মিলিতভাবে অবশ্যকরণীয় কাজ বলে গণ্য করেছে। প্রত্যেককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এতে অংশগ্রহণ করতে হবে।'[৪]

হিসবাহ্ সম্পর্কে আল কুরআনের বহু নির্দেশনার একটি হলো : وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ—'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা জরুরি, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং

---

[১]ইবনুল কাইয়্যিম র., ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৭।
[২]মোহাম্মদ হাশিম কামালি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
[৩]ইমাম গাযালি র., উলুম আল দীন, আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়া, খ. ২, পৃ. ৩১০।
[৪]ইবনুল কাইয়্যিম র., আল-তুরুকু আল-হুকমিয়া ফিল সিয়াসাহ আশ-শরী'আহ, আল মু'য়াস্সারাহ আল আরাবিয়া, ১৯৬১, পৃ. ২৭৮।

www.pathagar.com

ভালো কাজের আদেশ দেবে ও খারাপ কাজে নিষেধ করবে।'[১] এ সম্পর্কে বর্ণিত বহু হাদিসের একটি হলো : কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে, তাহলে তাকে হাত দ্বারা বন্ধ করে দেবে, সে তা করতে অসমর্থ হলে তাকে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করতে হবে, আর তা করার সমর্থ না থাকলে মনে মনে তা প্রতিরোধের চিন্তা-গবেষণা করবে।[২] এ হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার একটি মাধ্যম হলো মুখের সাহায্য গ্রহণ করা। অর্থাৎ, বাকস্বাধীনতা ছাড়া হিসবাহর দায়িত্ব পালন করা যায় না।

১৬.২. নাসিহাহ্ বা অন্তর নিংড়ানো উপদেশ : মতপ্রকাশের দ্বিতীয় উপায়টি হলো নাসিহাহ্ বা অন্তর নিংড়ানো উপদেশ। আল কুরআনে নবী-রাসূল প্রেরণের একটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, নুহ আ. তাঁর অনুসারীদেরকে বলেন, وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ—'আর আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।'[৩] এ বিষয়ে হাদিসেও বহু নির্দেশনা রয়েছে। নাসিহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যা উপযুক্ত ও কল্যাণকর মনে করে তা বলার অধিকার রাখে।

১৬.৩. শুরা বা পরস্পরের পরামর্শ বিধান : মতপ্রকাশের আরো একটি দিক হলো পরস্পরকে পরামর্শ দেয়া। একজন মুসলমান বিশেষ করে শাসকগণ যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন পরস্পরের সাথে আলোচনা ও পরামর্শপূর্বক তা করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ—'আর তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।'[৪] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ—'এবং কাজকর্মে তাঁদের সাথে পরামর্শ করো।'[৫]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ স. ও তাঁর সাহাবিগণ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে আলোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ স. কখনো কখনো নিজের মতের ওপর তাদের পরামর্শকে প্রাধান্য দিতেন। পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা তার বুদ্ধি-বিবেচনার আলোকে যা কল্যাণকর মনে করবে তা বলার স্বাধীনতা পাবে।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ স. ও তাঁর সাহাবিদের আমলের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ স. তাঁর প্রবীণ সাহাবিগণের মত ছিল,

---

[১]আল কুরআন, ৩ : ১০৪।
[২]সহিহ মুসলিম।
[৩]আল কুরআন, ৭ : ৬৮।
[৪]আল কুরআন, ৪২ : ৩৮।
[৫]আল কুরআন, ৩ : ১৫৯।

www.pathagar.com

মদিনার অভ্যন্তর থেকে শত্রুর মোকাবেলা করা। কিন্তু হামযা রা.-সহ্ যুবক সাহাবিগণের মত ছিল মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা। মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে অধিকাংশ সাহাবির মত থাকায় রাসূলুল্লাহ্ স. তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমন সময় প্রবীণ সাহাবিগণ যুবকদের তিরস্কার করতে থাকেন এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্র রাসূল স.-এর মতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। এই কথা শোনামাত্র তাঁরা আবেগাপ্লুত হয়ে ক্ষমা চাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে গেলেন। তখন রাসূল স. বললেন, দৃঢ়সংকল্প ও প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পরে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ব্যতিরেকে অস্ত্র সংবরণ করা নবীর জন্য শোভনীয় নয়। চল, মদিনার বাইরে যুদ্ধ সংঘটিত হবে।'[১]

কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ স. মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন, অমুক অমুক স্থানে অবস্থান নিতে হবে এবং শিবির স্থাপন করতে হবে। একজন সাহাবি জানতে চাইলেন, এই আদেশ কি অহির মারফত না আপনার ব্যক্তিগত অভিমত? তিনি বললেন : 'এ আমার ব্যক্তিগত অভিমত।' সাহাবি আরজ করেন, 'এই স্থান তো উপযোগী নয়, বরং অমুক অমুক স্থান অধিকতর সুবিধাজনক হবে।' তখন তাঁর এই অভিমত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।[২]

শাসককে পরামর্শ দানের একটি দৃষ্টান্ত ইমাম গাযালি র. তাঁর 'এহ্ইয়ায়ু উলুমিদ্দিন' নামক গ্রন্থের 'সৎ কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। একবার আতা ইবনে আবু রাবাহ্ খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন খলিফা হজ্ব করতে গিয়ে মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং রাজ তখ্তে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবর্গ তাঁর সামনে উপবিষ্ট ছিল। খলিফা আবদুল মালিক যখন তাঁকে দেখলেন তখন তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বীয় রাজ আসনের পাশে বসালেন এবং তাঁর সামনাসামনি বসলেন আর বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনার কি প্রয়োজন, তখন আতা ইবনে আবু রাবাহ বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হেরেমে আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং তা আবাদ রাখার ব্যবস্থা করুন। মুহাজির ও আনসারদের সন্তানদের সম্বন্ধে আল্লাহ্কে ভয় করুন, কারণ আপনি এ আসনে তাদের বদৌলতেই বসতে পেরেছেন। আর সীমান্ত পাহারাদারদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করুন কারণ

---

[১]মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।
[২]মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, খ. ১, পৃ. ২৯৫।

www.pathagar.com

তারা মুসলমানদের দুর্গ। আর মুসলমানদের অবস্থার খবরাখবর রাখুন, কারণ আপনি একাই তাদের জিম্মাদার। আর যারা আপনার দরজায় আসেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করুন, তাদের সম্বন্ধে গাফিল হবেন না। কখনো তাদের সামনে আপনার দরজা বন্ধ করবেন না।

এসব কথা শুনে আব্দুল মালিক তাকে বললেন, ঠিক আছে, তা আমি করবো। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে চলে যেতে চাইলে খলিফা তাঁর হাত ধরে বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি এতক্ষণ অন্যের প্রয়োজনের কথা বললেন, তা আমি পূরণ করেছি। এখন বলুন আপনার প্রয়োজন কি? তখন তিনি বললেন, কোনো মাখলুকের কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, একথা বলেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তখন আবদুল মালিক বললেন, একেই বলে আভিজাত্য ও শরাফত।[১]

ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, এই যে সম্মানিত ভদ্রলোক যাঁকে খলিফা নিজের আসনে বসালেন এবং তাঁর সামনাসামনি বসলেন, তিনি কোনো কোরাইশি বা আরবি কিংবা কোনো গোত্র প্রধান অথবা বাপ-দাদার সম্মানে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক আযাদকৃত গোলাম। কথিত আছে যে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ, কানা ও খোঁড়া ছিলেন।[২]

১৬.৪. গঠনমূলক সমালোচনা : মতপ্রকাশের আরো একটি দিক হলো সরকার বা শাসক বা অন্য কারো কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করা ও তাদেরকে আন্তরিক পরামর্শ দেয়ার অধিকার। ইসলামে সকলের জন্য এ অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সুন্নাহ্তেও সমালোচনার অধিকারের বিষয়টির অনুমোদন পাওয়া যায়। খোলাফায় রাশেদিন ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের জীবনেও এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, মক্কার কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উমর রা. চুক্তির কতিপয় ধারার সমালোচনা করেন; কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, ঐ ধারাগুলো মুসলমানদের অনুকূলে ছিল না। তিনি এ বিষয়টি আবু বকর রা.-এর সাথে আলোচনা করেন; কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে গেলেন এবং সমালোচনামূলক অভিমত তুলে ধরেন। রাসূলুল্লাহ্ স. উমর রা.-এর বক্তব্য শুনলেন এবং জবাব দিলেন।[৩]

---

[১]ইমাম গাযালি র., এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, মদিনা পাবলিকেশন্স, ২০০৮, খ. ৩, পৃ. ২৩১।
[২]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
[৩]ইবনে হিশাম, আল সিরাহ আল নবোবিয়া, খ. ৩, পৃ. ৩৩১।

www.pathagar.com

আবুবকর সিদ্দিক রা. তাঁর খিলাফতের উদ্বোধনী ভাষণে যথারীতি তাঁর সমালোচনার আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'হে জনগণ, আমাকে আপনাদের কর্তৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অথচ আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। আমি সঠিক পথে থাকলে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, ভুল করলে শুধরে দেবেন।'[১] আবু বকর রা.-এর এ বক্তব্য সরকারের বিভিন্ন কাজের গঠনমূলক সমালোচনার আমন্ত্রণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

উমর রা. খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অভিষেক অনুষ্ঠানের ভাষণে বলেন, 'যদি তারা তাঁকে নীতি থেকে বিচ্যুত হতে দেখেন, তাহলে তারা যেন তাঁকে সংশোধন করে দেন।' শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাকে বিচ্যুত হতে দেখলে আমরা আমাদের তরবারি দিয়ে তা ঠিক করে দেব।' এ কথা শুনে খলিফা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে বললেন, 'এমন লোকও রয়েছে যারা ন্যায়ের পক্ষে এগিয়ে আসবেন এবং খারাপ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করবেন।'[২]

আরেক বর্ণনায় দেখা যায়, এক ব্যক্তি উমর রা.-এর কাছে এসে অনেকটা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওহে উমর, আল্লাহ্‌কে ভয় করো।' সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি লোকটিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, 'খলিফার সামনে তিনি আদবের খেলাপ করছেন।' কিন্তু উমর রা. জবাবে বললেন, 'এভাবে তারা যদি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে না দেয়, তাহলে কোনো কল্যাণ হবে না এবং আমরা যদি তাদের কথা না শুনি তাতেও কোনো কল্যাণ হবে না।'[৩]

এক মহিলা পথিমধ্যে উমর রা.-কে বলেন, 'উমর! তোমার অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। আমি তোমাকে সেই সময়েও দেখেছি যখন তুমি 'উমাইর' (অল্পবয়স্ক) ছিলে এবং হাতে লাঠি নিয়ে 'উকাযে' দিনভর ছাগল চরাতে। তারপর তোমার সেই যুগও দেখেছি যখন থেকে তোমাকে উমর বলে ডাকা হয়। আর এখন এ যুগও দেখছি যখন তুমি আমিরুল মুমিনিন হয়ে চলাফেরা করছ। নাগরিকদের ব্যাপারসমূহে আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করো, আখিরাতের দূরের জগৎ নিজের অতি নিকট মনে করবে এবং মৃত্যুকে ভয় করবে, সর্বদা এ চিন্তায় মগ্ন থাকবে যে, আল্লাহ্‌র দেয়া কোনো সুযোগই যেন বৃথা না যায়।

জারুদ আবদি তখন উমর রা.-এর সাথে ছিলেন। সে সময় আমিরুল মুমিনিনকে লক্ষ্য করে মহিলার বক্তব্য শুনে তিনি বলেন, 'আপনি আমিরুল মুমিনিনের সাথে

---

[১]ইবনে হিশাম, আল সিরাহ আল নবোবিয়া, খ. ৪, পৃ. ২৬২।

[২]আবু যাহরাহ, আল জারিমাহ ওয়াল-উকুবাহ ফিল ফিকহ আল ইসলামী, পৃ. ১৬০।

[৩]আবু ইউসুফ র., কিতাবুল খারজ, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।' উমর রা. সাথে সাথে তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, 'এই মহিলা যা বলতে চান তাঁকে তা বলতে দাও। তোমার হয়তো জানা নেই, ইনি তো খাওলা বিনতে হাকিম রা. যাঁর কথা আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তাকাশ থেকে শুনেছেন। সে ক্ষেত্রে উমরের সাধ্য কি যে, তাঁর কথা না শোনে।'

১৭. রাজনীতির অধিকার সংরক্ষণ

'রাজনীতি করা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার'-এ বিষয়টি বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হলেও ইসলাম অনেক আগেই এ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। জাহিলি যুগে সাধারণ জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কিংবা কোনো রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। এ কাজে ধনী, শক্তিশালী কিংবা যাজকশ্রেণির একচেটিয়া অধিকার ছিল। এ যুগটি মূলত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগ ছিল। এ সময় চিনারা তাদের সম্রাটকে 'ঈশ্বর পুত্র' বা 'স্বর্গপুত্র' বলত। তারা সম্রাটকে জাতির একক পিতা জ্ঞান করত। রোমকরা নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করত আর অন্যদেরকে দাস মনে করত। কিন্তু ইসলাম এই জাহিলি রীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। ফলে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং যোগ্যতা ও সুযোগ মোতাবেক রাষ্ট্রীয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যে কোনো পদে দায়িত্ব পালনের অধিকার লাভ করে। ইসলামী শরী'আহ্তে এটিকে তাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা কোনো পদ বা দায়িত্ব বিশেষ শ্রেণি, বংশ বা স্থানের লোকের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা ইসলামে বৈধ নয়। রাষ্ট্রের কোনো পদ লাভের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া, বিশেষ গোত্র কিংবা বিশেষ বংশমর্যাদার শর্ত না করে ইসলামী শরী'আহ্ আল্লাহ্ ভীতি, যোগ্যতা, জ্ঞান, নিষ্ঠাকে এর জন্য শর্ত করেছে। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে, 'ক্রীতদাস যদি রাষ্ট্রপ্রধান হয় তবুও তার আনুগত্য করতে হবে।'[১] উল্লেখ্য যে, উসমান রা. তাঁর এক হাবশি গোলামকে 'রাবযাহ্' এলাকার গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। সেখানে আবু যর গিফারি রা.-সহ বেশ ক'জন সাহাবা জুম'আর সালাতসহ অন্যান্য সালাতও তাঁর ইমমতিতে আদায় করতেন।[২]

আল কুরআনে উল্লেখিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তালুতকে বনি ইসরাইলের বাদশাহ্ ঘোষণা দিলেন তখন ইহুদিরা তা মানতে অস্বীকার করে বলল, 'আমাদের ওপর তার কর্তৃত্ব কিরূপে হবে, যখন আমরা

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আহকাম, বাবুস সাময়ি ওয়া ইত্বায়াতিল ইমামি মা লাম তাকুন মা'আসিয়াতান।
[২]ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী, ফিক্হে হযরত ওসমান ইবনু আফ্ফান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

www.pathagar.com

তার অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি।' তাদের কথার প্রতিবাদে মহান আল্লাহ্ বললেন, 'আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।'[১]

অযোগ্যকে শাসক নিয়োগে নিরুৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিম জনগণের কোনো বিষয়ের সর্বোচ্চ পদাধিকারী নিযুক্ত হবে, সে যদি সেই মুসলিম জনগণের ওপর কাউকে শুধু ব্যক্তিগত খাতির রক্ষার জন্য শাসক নিযুক্ত করে, তাহলে তার ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ।'[২]

১৭.১. ইসলামী রাজনীতির ধারণা : মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ ও মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য কাজ করাই ইসলামী রাজনীতি। ইসলামী রাজনীতির সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেছেন, 'এটা এমন এক বিধিব্যবস্থা যার রীতিনীতি কল্যাণকর কাজ এবং সামাজিক অবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে।'[৩]

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী র. বলেছেন, 'ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ হিসেবে তার আদেশ ও অভিপ্রায় বাস্তবায়নে সকল মানুষের সম্মিলিতভাবে কাজ করা।'[৪]

আল্লামা মুহাম্মদ আসাদের মতে, 'ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে জাতির জীবনে ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলোর সচেতন প্রয়োগ এবং রাষ্ট্রের মৌলিক সংবিধানে ঐসব নীতি আদর্শের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটানো।'[৫]

ইসলামী রাজনীতি প্রচলিত রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র। এ রাজনীতি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়, বরং বিশ্বকে সুন্দর ও পবিত্র করার মহান ইবাদতের নাম ইসলামী রাজনীতি। আদর্শ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ইসলামী রাজনীতি। এ রাজনীতিতে ক্ষমতালিপ্সুর কোনো স্থান নেই। কোনো ব্যক্তি নিজেকে ক্ষমতার জন্য নিজেকে প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগও নেই এ রাজনীতিতে।

১৭.২. দীন, রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আর রাষ্ট্র মানুষের জীবন বিধানের বাইরের কিছু নয়, বরং বর্তমানে মানবজীবনের

---

[১]আল কুরআন, ২ : ২৪৭।

[২]মুসনাদে আহমাদ।

[৩]মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম র., ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, খায়রুন প্রকাশনি, ১৯৮৭, পৃ. ২।

[৪]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী র., দি প্রসেস অব ইসলামিক রিভলিউশন, দিল্লি, মারকাযি মাকতাবাহ জামায়াতে ইসলামী হিন্দ, ১৯৭০, পৃ-৯/ন. ইসলাম, পৃ. ৮০।

[৫]মুহাম্মদ আসাদ, ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি, শাহেদ আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ-২/ন. ইসলাম, পৃ.৮১।

www.pathagar.com

অনেক বিষয়ই রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ধর্ম পর্যন্ত রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্র ছাড়া মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্মও পালন করতে পারে না। তাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা দীনের একটি অংশ। শুধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা দীন নয় আবার শুধু ধর্ম পালনও দীন নয়, বরং দীন হলো ইবাদত করা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উভয়ই। শুধু রাষ্ট্রকে দীন বলা যেমন সংকীর্ণতা তেমনি দীন থেকে রাষ্ট্রকে বাদ দেয়া আরো বড় সংকীর্ণতা। এ জন্য বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হামিদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল আলী বলেন, ইসলামী আকিদার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, দীন ও রাষ্ট্রের সমন্বিত রূপ হলো পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। দীন ও রাষ্ট্র অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। তিনি আরো বলেন,

لَا أَقُوْلُ؛ اَلْإِسْلَامُ دِيْنٌ وَدَوْلَةٌ، بَلْ هُوَ الدِّيْنُ وَهُوَ الدَّوْلَةُ-

অর্থাৎ, 'আমি শুধু বলি না যে, ইসলাম শুধু দীন কিংবা শুধু রাষ্ট্র, বরং আমি বলি, ইসলাম দীন ও রাষ্ট্র উভয়ই।'

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেছেন, "দুটি পথ রয়েছে ভ্রষ্ট– একটি পথ হলো, যেখানে দীনের পূর্ণতার জন্য রাষ্ট্র, জিহাদ ও সম্পদকে সম্পৃক্ত করা হয় না আর একটি পথ হলো যেখানে রাষ্ট্র, সম্পদ ও যুদ্ধকে প্রাধান্য দেয়া হয় কিন্তু দীন কায়েমের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় পথই গযবপ্রাপ্ত ও ভ্রষ্ট। প্রথম পথটি ভ্রষ্টদের জন্য আর তারা হলো 'নাসারা' এবং দ্বিতীয় পথটি হলো গযবপ্রাপ্ত ইহুদিদের জন্য।"[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র.-এর উক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, শুধু নিরেট ধর্মীয় বিষয়কে দীন মনে করা এবং এর ওপর সন্তুষ্ট থাকা সঠিক পথ নয়, আবার নিরেট ধর্মীয় বিষয় পরিত্যাগ করে শুধু পার্থিব সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের জন্য রাষ্ট্র ও সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকাও সঠিক পথ নয়। সঠিক পথ সেটিই যেখানে দীন ও রাষ্ট্রকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়। উভয়টিকে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়।

কাব-এর সূত্রে ইবনে কুতায়বা বলেন, 'ইসলাম, সরকার ও জনগণ হচ্ছে তাঁবু, দণ্ড, রজ্জু ও পেরেকের মতো। ইসলাম হচ্ছে তাঁবু, সরকার হচ্ছে তাঁবু ধারণকারী দণ্ড আর জনগণ হচ্ছে রজ্জু ও পেরেক। একটি ছাড়া অন্যটির কোনো কার্যকারিতা নেই।'[২]

---

[১] حامد بن عبد الله العلي- الدين والدولة-http://www.tawhed.ws/pr?!=3852.

[২] ইবনে কুতায়বা, 'ইউয়ুন আল আকবার' ভলিউম-১, বার্নাড লুইস কর্তৃক সম্পাদিত 'Islam : From the Prophet Muhammad to the Capture of Constantipole' দি ম্যাকমিলান প্রেস লি., লন্ডন,

www.pathagar.com

যে সমস্ত ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন তারা মূলত ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা তারা ইসলাম বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের শিকার। এ প্রসঙ্গে ড. আল্লামা তাকি উসমানী বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমান, বিশেষ করে আলেমসমাজ এ বিষয়টি অনুভব করছেন যে, বিশ্বের ওপর যখন থেকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকেই ইসলামকে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শুধু মসজিদ-মাদরাসা ও পরিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনের ওপর ইসলামের প্রভাব কেবল শিথিলই হয়ে যায়নি, বরং ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এটি মূলত ইসলামের শত্রুদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ছিল, যার অধীনে ইসলামের এমন একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, ধর্মের যেমন চিত্র পশ্চিমা বিশ্বে বিরাজ করছে। পশ্চিমা বিশ্বে ধর্ম বলতে মনে করা হয়, এটি মানুষের একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার।... একদিকে ইসলামের শত্রুদের এই ষড়যন্ত্র ছিল। অপরদিকে এই ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মনীতিও কিছুটা দায়ী। আমরা আমাদের জীবনে যতটা জোর, যতটা মনোযোগ ইবাদতের ওপর ব্যয় করেছি, ততটা জীবনের অন্যান্য বিভাগের প্রতি দেইনি। অথচ ইসলাম পাঁচটি বিভাগের সমষ্টির নাম। আকিদা, ইবাদত, মুআমালাহ্, মুআশারাত ও আখলাক। জীবনের এই পাঁচটি বিভাগের সমষ্টির নাম ইসলাম। আমরা আকিদা ও ইবাদতের গুরুত্ব বহাল রেখেছি বটে; কিন্তু অন্যান্য বিভাগকে অতটা গুরুত্ব দেইনি, যতটা দেয়া প্রয়োজন ছিল।'[১]

আল্লামা তাকি উসমানীর উক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইবাদতকে যতটা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ইসলামের অন্যান্য বিষয়কে ততটা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। বর্তমানে অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের তেমন একটা মাথাব্যথা নেই। আজ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতি কিন্তু এ নিয়ে কারো তেমন কোনো আগ্রহ নেই। ফলে আমাদের রাজনীতি চলে যাচ্ছে ইসলাম বিরোধীদের হাতে।

এ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে কিছু সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদ মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে

১৯৭৬, ভলিউম-১, পৃ. ১৭। উদ্ধৃত : আবদুল রশিদ মতিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত, অনুবাদ : এ কে এম সালেহউদ্দিন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, পৃ. ৩১।

[১]আল্লামা তাকী উসমানী, ইসলাহী খুতুবাত, ভলিউম ৩, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০১২, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

www.pathagar.com

পড়েন। তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। ইসলামের গৌরবজনক অতীত নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত বিভিন্নভাবে তুলে ধরেন। এ সময় কায়েমি স্বার্থবাদীরা তাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। এর সাথে যোগ দেয় কিছুসংখ্যক সংকীর্ণমনা অদূরদর্শী চিন্তার আলেম। তারা ইসলামী রাজনীতিবিদগণের দোষ ও ভুলচর্চায় মত্ত হয়ে পড়ে। এতে করে ইসলাম বিরোধী শক্তিই লাভবান হতে থাকে।

১৭.৩. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা : ইসলামী শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের একটি মাধ্যম বা উপায় হলো রাষ্ট্র। অনুকূল রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শরী'আহ্র বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ইসলামী রাষ্ট্র হলো এমন দেশ, যেখানে ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-কানুন সপ্রকাশিত ও বিজয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।'[১]

আল্লাহ্র দীন পরিপূর্ণভাবে পালন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয। আর এ ফরয আদায়ের উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম কায়েম করাও ফরয। এ বিষয়ে উসূলে ফিকহর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুসাল্লামাতুস সুবুত'-এ লেখা হয়েছে : 'ওয়াজিব পালন করার জন্য যে উপায়-উপকরণ আছে সেগুলো হাসিল করাও ওয়াজিব এবং হারাম কাজের উপায়-উপকরণাদি হাসিল করাও হারাম।'

ইসলামী শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার পক্ষে আল কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে বহু দলিল পেশ করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ স. ও তাঁর সাহাবিগণের বাস্তব কর্মনীতি। তাঁরা প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপরীতে একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রচলিত রাষ্ট্র দিয়েই যদি সকল উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব হতো তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন হতো না। ইসলামের জন্য রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই তাঁরা তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। 'তাঁর মদিনায় হিজরতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ক্ষমতা-সম্পর্কের পুনর্গঠন করে তাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুবর্তী করা। এখানে ইসলামের প্রথম রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, যার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রধান ছিলেন মুহাম্মদ স.।'[২]

মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'মদিনা সনদ' প্রণয়নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ স. প্রথম লিখিত সংবিধান রচনার ইতিহাস গড়লেন। তিনি শুধু ধর্ম প্রচারক ছিলেন না, বরং তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, ন্যায়বিচারক, সেনাপ্রধান, সালাতের ইমাম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই ইসলামী শরী'আহ্

---

[১]শরহুল আযহার, খ. ৫, পৃ. ৫৭১-৫৭২/ড. আবদুল করিম জায়দান, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ১৯।
[২]আবদুল রশিদ মতিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইসলামী প্রেক্ষিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর অনুসৃত নীতি অনুসরণ করতে হবে। কেননা, জীবনের সকল বিষয়ের অনুসরণীয় আদর্শ হলেন শেষ নবী মুহাম্মদ স., যাঁকে কুরআনে সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)।[১]

ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সর্বজনমান্য আলিমগণ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হলো :

শাহ ওয়ালিউল্লাহ র. বলেছেন, "জিহাদ, বিচারব্যবস্থা, দীনি ইল্‌ম প্রবর্তন করা, ইসলামের আরকানসমূহ প্রতিষ্ঠা করা, কাফিরদের আধিপত্য হতে ইসলাম ও মুসলমানদের সুরক্ষিত রাখাকে মহান আল্লাহ্ 'ফরযে কেফায়া' বলে ঘোষণা করেছেন।' আর এসব কাজ কাউকে 'ইমাম' নির্বাচিত করে তার অধীনে করা ছাড়া সম্ভব নয়।" আর এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি যে, ওয়াজিবের সূচনাংশও ওয়াজিব। অর্থাৎ কোনো ওয়াজিব যদি অন্য কর্ম ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ কর্মও ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত।'[২]

সাইয়েদ আহমদ শহীদ র. লিখেছেন, 'দীনের যে সকল বিধানের সম্পর্ক রাজত্ব ও রাজ-ক্ষমতার সাথে, রাজত্ব অর্জন না করতে পারলে সেগুলো পরিষ্কার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমানদের কর্মের নেতৃত্ব কাফিরদের হাতে চলে যায়। তখন পবিত্র দীনের নিদর্শনসমূহের ধ্বংস স্পষ্ট।'[৩]

আল্লামা তাফতাযানি র. বলেছেন, 'মুসলমানদের জন্য অবশ্যই একজন ইমাম থাকতে হবে, যিনি তাদের মধ্যে আইনের বিধিবিধান ও দণ্ডবিধি কার্যকর, সীমান্ত রক্ষা, সেনাবাহিনী সংগঠন, যাকাতাদি উসূল, আগ্রাসন রোধ ও চোর-ডাকাত দমন, জুমু'আ ও জামা'আত কায়েম, জনসাধারণের মধ্যকার বিবাদ-মীমাংসা, সাক্ষ্যগ্রহণ, অভিভাবকহীনদের বিয়ে-শাদির ব্যবস্থা, যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন প্রভৃতি কার্যাবলি–যা ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পন্ন করা যায় না, সেগুলো সম্পাদন করবেন।'[৪]

ইমাম হাসান আল-বান্না র. বলেন, 'সরকার হলো আর্থ-সামাজিক সংস্কারের প্রাণ। তারা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তাহলে সবকিছুকেই তারা দুর্নীতিগ্রস্ত করতে

---

[১]আল কুরআন, ৩৩ : ২১।

[২]শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ, ইযালাতুল খিফা আন খিলাফাতিল খুলাফা, সুহাইল একাডেমি, লাহোর, পৃ. ২।

[৩]জসীমউদ্দিন খান পাঠান, দীনের মর্মকথা, ঈমান : তত্ত্ব ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮৭।

[৪]আকাইদে নাসাফি, পৃ. ১৮০; ড. মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, ইসলামে ইমামত ও খিলাফত : তত্ত্ব ও বাস্তবতা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ. ৩৯২।

www.pathagar.com

পারে। আর যদি তারা পরিশুদ্ধ হয় তাহলে সবকিছুকেই তারা পরিশুদ্ধ করতে পারে।'[১]

উসমান রা. বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা রাজক্ষমতা দ্বারা সেই দুর্নীতি ও অনাচারকে দূরীভূত করে থাকেন যেই দুর্নীতি ও অনাচারকে কুরআন দূরীভূত করতে পারে না।'[২] প্রকৃতপক্ষে কুরআন মানুষের মূল্যবোধ, নৈতিক গুণাবলি ও সৎ প্রেরণা দিতে পারে কিন্তু নিজে এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারে না। তাই এগুলোর বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া র.-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'ক্ষমতাগ্রহণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনা দীনের বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং তা দীনের অস্তিত্ব ও স্থিতির সাথেও সংশ্লিষ্ট। কেননা, মানুষের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত সম্ভব নয়। কারো কারো প্রয়োজন ও চাহিদা তো এমন যে, এর সমাধান দল বা জামা'আত ছাড়া সম্ভবই নয়। যেহেতু জামা'আত ওয়াজিব ও অপরিহার্য, কাজেই জামা'আতের জন্য আমির বা নেতা থাকাও ওয়াজিব।'[৩]

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র. বলেন, ইসলাম যদি শুধু কতিপয় আকিদা-বিশ্বাসের সমষ্টিই হতো, সে যদি কেবল আল্লাহ্কে এক মানা, রাসূলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন এবং আখিরাত ও ফেরেশতার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া মানুষের আর কোনো দাবি না করতো তাহলে হয়তো শয়তানি শক্তিগুলো তার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো না। কিন্তু ইসলাম আসলে আকিদামাত্র নয়। ইসলাম আইনও। সেই আইন মানুষের জীবনকে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। তাই শুধু উপদেশ ও ওয়াজ-নসিহত দ্বারা তার কার্য সিদ্ধ হতে পারে না। বরং শাসকের ভাষার সাথে সাথে তাকে শানিত অস্ত্রের ভাষায়ও কথা বলতে হয়।

কয়েক মুহূর্তের জন্য এমন একটি সমাজের কথা কল্পনা করুন যেখানে কোনো আইন চালু নেই, যার প্রতিটি ব্যক্তি এমন স্বভাবের, যে নৈতিকতার কোনো ধার ধারে না, যার ওপর ক্ষমতা চলে তাকে শোষণ ও লুণ্ঠনের শিকার বানায়, যার সাথে শত্রুতা তাকে খুন করে, যে জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করে তা চুরি বা

---

[১]ইমাম হাসান আল বান্না র., মাজমূআতু রাসায়েলিল ইমাম আশ শহিদ হাসান আল বান্না, ১৯৮৯, পৃ. ২৫৫।

[২]আবদুল কাদের আওদা র., ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন, অনুবাদ- মাওলানা কারামত আলী নিযামী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, পৃ. ২।

[৩]ইমাম ইবনে তাইমিয়া র., শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা, অনুবাদ-জুলফিকার আহ্মদ কিসমতী, আহ্সান পাবলিকেশন, পৃ. ২৪২।

www.pathagar.com

ছিনতাইয়ের মাধ্যমে হস্তগত করে। মনে যা চায় তা যেমন করেই হোক পূর্ণ করে। হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিচার করে না। কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে তার মন-মগজে কোনো সুষ্ঠু জ্ঞান ও চেতনা নেই, বরং তার সামনে আছে কেবল নিজের প্রবৃত্তির কামনা ও বাসনা এবং তা চরিতার্থ করার সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ। এমন সমাজে ও এমন পরিবেশে যদি কোনো নৈতিক সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে এবং মানুষকে হালাল-হারামের পার্থক্য শেখায় ও বৈধ-অবৈধের সীমারেখা নির্দেশ করে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে শুভাশুভ এবং কর্মপদ্ধতিতে ভালো-মন্দের বাছবিচার প্রদর্শন করে, চুরি, হারামখুরি, অবৈধ খুন, যেনা-ব্যভিচার ও অশ্লীলতার প্রতিরোধ করে, সমাজের লোকদের কর্তব্য ও অধিকার নির্ধারণ করে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক বিধান প্রস্তুত করে, কিন্তু সেই বিধান চালু করার জন্য তার কাছে ওয়াজ-নসিহত এবং যুক্তি-তর্ক ছাড়া কোনো শক্তি না থাকে, তা হলে সেই সমাজ নিজের স্বাধীনতার ওপর এমনসব বাধ্যবাধকতা ও কড়াকড়ি মেনে নিতে প্রস্তুত হবে কি? সে সমাজ কি শুধু তার যুক্তি-তর্কের জোরে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আইনের আনুগত্য স্বীকার করে নেবে? তার আবেগপূর্ণ উপদেশে সে কি এতো প্রভাবিত হবে যে, বল্গাহীন জীবনের সুখ ও আনন্দকে বিনা দ্বিধায় পরিহার করতে সম্মত হয়ে যাবে! মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান রাখেন এমন যে কোনো ব্যক্তিই এ প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দেবেন। কেননা, সততাকে শুধু সততা বলেই আঁকড়ে ধরে এবং অন্যায়কে কেবল অন্যায় বলেই বর্জন করে এমন পুণ্যাত্মার সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম। কিন্তু যদি সেই সংস্কারক শুধু নৈতিক উপদেষ্টা বা ওয়ায়েজ না হয়ে সেই সাথে শাসক ও কর্তৃত্বশীলও হয়, আর দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকারও প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই সরকারের ক্ষমতা বলে দেশ থেকে বল্গাহীন স্বাধীনতা ও বন্য স্বেচ্ছাচার থেকে সৃষ্ট দোষগুলো দূরীভূত হয় তাহলে ঐ প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক না হয়ে ইতিবাচক হতে বাধ্য। সকলেই একবাক্যে বলবে, এ ধরনের সংস্কারমূলক চেষ্টা সফল না হয়ে পারে না।’[১]

১৭.৪. রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য প্রত্যাশা

ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা, দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা চাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠিত করা, মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা, সত্যের লালন ও দুষ্টের দমনে রাষ্ট্রক্ষমতা অতীব জরুরি। এ জন্য কোনো কোনো নবী-রাসূল মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রার্থনা করে দু'আ করেছিলেন। যেমন,

---

[১]সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র. আল জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬৫।

www.pathagar.com

সুলাইমান আ. আল্লাহ্র কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা চেয়ে এ দু'আ করেছন, 'হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দিন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন না হয়, নিঃসন্দেহে আপনিই পরম দাতা।'[১]

অনুরূপভাবে ইবরাহিম আ. তাঁর সন্তানদের জন্যও নেতৃত্ব কামনা করেছেন। মহান আল্লাহ্ উক্ত বিষয়টি মুসলিমদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, স্মরণ করো যখন ইবরাহিমকে তাঁর রব কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর তিনি তা পুরোপুরি পূর্ণ করলেন, তখন তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে মানব জাতির নেতা বানাতে চাই'। তখন তিনি বললেন, 'আর আমার বংশধরগণের মধ্য থেকেও (তারাও কি নেতা হিসেবে বিবেচিত হবে)?' তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) জবাব দিলেন, 'আমার এ অঙ্গীকার জালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।'[২]

মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ স.-কে রাষ্ট্রক্ষমতার সহযোগিতা পাওয়ার জন্য দু'আ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন : 'আর দু'আ করো, হে আমার রব! আমাকে দাখিল করুন কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের করুন কল্যাণের সাথে আর আপনার পক্ষ থেকে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।'[৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, বলো, হে আমার রব! 'আমাকেই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান করো অথবা কোনো রাষ্ট্রক্ষমতাকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, যাতে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে আমি দুনিয়ায় বিকৃত ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও পাপের সয়লাব রুখে দিতে পারি এবং তোমার ন্যায় বিধান জারি করতে সক্ষম হই। হাসান বসরি ও কাতাদাহ্ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারির ও ইবনে কাসিরের ন্যায় মহান তাফসিরকারগণ এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন।[৪]

অতএব এ কথা বলা যায় যে, ইসলাম দুনিয়ায় যে সংশোধন চায় তা শুধু ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে হতে পারে না, বরং তাকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতারও প্রয়োজন হয়। কেননা, মহান আল্লাহ্ নিজেই তাঁর নবীকে এ দু'আ শিখিয়েছেন। এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠা ও শরী'আহ্র আইন প্রবর্তন করা এবং আল্লাহ্প্রদত্ত দণ্ডবিধি জারি করার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা হাসিল করার

---

[১]আল কুরআন, ৩৮ : ৩৫।
[২]আল কুরআন, ২ : ১২৪।
[৩]আল কুরআন, ১৭ : ৮০।
[৪]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র., তাফহিমুল কুরআন, সূরা বানি ইসরাইল, আয়াত ৮০, টিকা নং-১০০।

www.pathagar.com

প্রত্যাশা করা এবং এ জন্য প্রচেষ্টা চালানো শুধু জায়েযই নয়, বরং কাঙ্ক্ষিত ও প্রশংসিত এবং অন্য দিকে যারা এ প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশাকে বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও দুনিয়াদারি বলে আখ্যায়িত করে তারা ভুলের মধ্যে অবস্থান করছে। কোনো ব্যক্তি যদি নিজ স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করতে চায় তাহলে তাকে বৈষয়িক স্বার্থপূজা বলা যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার দীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের প্রত্যাশা করা বৈষয়িক পূজা নয়, বরং আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রত্যক্ষ দাবি।

১৮. নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ

নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। নারীদেরকে সমাজের নিষ্ঠুর-নির্দয় অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাদেরকে উত্তমরূপে লালন-পালন, শিক্ষাদান ও সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা ইসলামী শরী'আহ্র একটি উদ্দেশ্য।

নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়গুলোর একটি। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাদের মধ্যে কেট মিলে, জার্মেন গ্রিয়ার, মেরি উলস্টন, অ্যানি বেসান্ত, মার্গারেট সাঙ্গার, সুলতানা রাজিয়া, বেগম রোকেয়া প্রমুখের নাম শোনা যায়। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশি যে ব্যক্তি সোচ্চার ছিলেন তিনি হলেন নবী করিম স.। সত্যিকার অর্থে তিনিই নারীকে সমাজ-সংসারের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ হিসেবে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির প্রথম প্রবক্তা। তাই এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, 'জীবনে অন্য কিছু না করলেও শুধু নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই বিশ্ব মনীষায় মুহাম্মদ স.-কে সুউচ্চ আসনে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত করবে।'[১]

নারীমুক্তি ও তাদের অধিকারের ব্যাপারে তিনি যে দিকনির্দেশনা দিয়ে গেলেন, তা বর্তমান নারী মুক্তির ধারণার চেয়ে অনেক উন্নত, পরিণত ও সুদূরপ্রসারী। তাই মনীষী পিয়ের ক্রাবাইট বলেন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ স.-এর মতো মহান নেতা পৃথিবীতে এখনো বিরল।[২]

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর জন্মকালে বিশ্বের কোথাও নারীর কোনো সম্মান ছিল না, এমনকি তাকে মানুষ হিসেবেও গণ্য করা হতো না। তাকে 'ভোগের বস্তু', 'লাঞ্ছনা', 'অপয়া' ও 'পাপের প্রতিমূর্তি' এবং অস্থাবর সম্পত্তির মতো 'সম্পত্তি' মনে করা হতো।

---

[১]সৈয়দ আশরাফ আলী, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, সীরাত স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হি. ১৪১৭, পৃ. ২৩।
[২]সৈয়দ আশরাফ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

প্রাচীন চিনে নারীকে মনে করা হতো সবচেয়ে সস্তা জিনিস। কনফুসিয়াস বলেন, 'নারীর মূল কাজ আনুগত্য, শৈশব-কৈশোরে পিতার, বিয়ের পর স্বামীর এবং বিধবা হবার পর পুত্রের।'[১] বৌদ্ধ ধর্মেও নারীকে দেখানো হয়েছে নীচ ও পাপে পূর্ণ হিসেবে। এ ছাড়া স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে হত্যা করা গৃহপালিত জন্তু জবাই করার মতোই আইনসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। গ্রিসের আইনে এর জন্য কোনো শাস্তির বিধান ছিল না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা ছিল ভারতে। সেখানে মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে দেয়া শুধু বৈধই ছিল না, বরং এর জন্য ধর্মত তার ওপর জোর দেয়া হতো। ইহুদি ধর্মে নারীকে পুরুষের বিভীষণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধর্মে পিতা স্বীয় কন্যাকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারত এবং সে পিতার সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ পেত না। এ ধর্মে নারীকে সকল পাপের মূল (root of all evils) মনে করা হতো।[২] খৃষ্টধর্মে নারীকে শয়তানের মুখপাত্র (organ of evil) বলা হয়েছে।[৩]

জাহিলি সমাজে নারীর প্রতি নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সে সময় সমাজে নারীর কোনো অধিকার ছিল না। তাদেরকে অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ও জীবজন্তুর মতোই ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন ও হস্তান্তর করা হতো।

জাহিলি সমাজে মানুষের নারী সম্পর্কিত মনমানসিকতার বর্ণনা দিয়ে আল কুরআনে বলা হয়েছে : 'আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়, সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তা রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে ফেলবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট!'[৪]

জাহিলি যুগে আরবে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইসলামে এটিকে অতি গর্হিত কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে এর করুণ পরিণতির কথা বর্ণনাপূর্বক ঘোষণা করা হয়: 'যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?'[৫]

---

[১]আল্লামা জামাল আল বাদাবি, ইসলামের সামাজিক বিধান, দি পাইওনিয়ার ও দি উইটনেস, ২০০৬, পৃ. ৪২।

[২]সাইয়েদ আফগানী, আল ইসলাম আল মারাআত ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮। উদ্ধৃত: শরীফুল ইসলাম গওহরী, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধান, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ২০০৫, পৃ. ৮০।

[৩]মুহাম্মদ রশিদ রেজা, হুকমুন্নিসা ফিল ইসলাম, পৃ. ২৫। উদ্ধৃত : শরীফুল ইসলাম গওহরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

[৪]আল কুরআন, ১৬ : ৫৮-৫৯।

[৫]আল কুরআন, ৮১ : ৮-৯।

www.pathagar.com

সমাজের এ পঙ্কিলতা থেকে রাসূলুল্লাহ্ স. নারী সমাজকে টেনে তুলে এনে মানুষের মর্যাদা দিলেন। আল কুরআনে ঘোষণা করা হলো: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ—'নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন পুরুষদের আছে তাদের ওপর।'[১]

ইসলামী শরী'আহ্ নারীর আধ্যাত্মিক, আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুপম মর্যাদা নিশ্চিত করেছে।

১৮.১. নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা : ইসলামে আদিপাপের জন্য নারীকে দায়ী করা হয় না। অর্থাৎ, কোনো কোনো ধর্মে বিবি হাওয়া আ.-কেই বেহেশতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের জন্য দায়ী করা হয়। যেমন, খৃষ্টধর্মে বলা হয়, আদম আ. প্রথমে শয়তানের ধোঁকায় পড়েনি, ধোঁকা খেয়েছে হাওয়া আ. এবং সে-ই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য আদম আ.-কে প্ররোচিত করেছে। ফলে নারীই আদিপাপের কারণ। কিন্তু ইসলামে ভুলক্রমে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের ভুলের জন্য কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়ী করা হয়নি। এ কাজের দায় উভয়ের। আবার তাঁরা দু'জন অনুতপ্ত হলে মহান আল্লাহ্ তাঁদের ক্ষমা করে দেন। ফলে আদিপাপ বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকল না; বরং তাঁরা দু'জনেই পাপমুক্ত বলে গণ্য হলো। তাই বলা যায়, মানুষ পবিত্র, মানুষের রুহ মূলত আল্লাহ্র হুকুম। ইসলামের দৃষ্টিতে এ মর্যাদা মানব-মানবী উভয়ের জন্য সমান।

বাইবেলে বলা হয়েছে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের জন্য বিবি হাওয়াকে স্রষ্টা এই বলে অভিশাপ দেন যে, এই আদিপাপের জন্য তিনি নারীর কষ্টকে বহুগুণে বাড়াবেন। এই কষ্টই প্রত্যেক নারী গর্ভাবস্থায় ও সন্তান প্রসবের সময় ভোগ করে।[২] কিন্তু ইসলামে নারীর গর্ভাবস্থাকে মর্যাদা ও সহানুভূতির সাথে দেখা হয়। নারীর গর্ভাবস্থাকে জিহাদের সাথে তুলনা করে এবং প্রসবকালীন মৃত্যুকে শহিদী মৃত্যু বলে ঘোষণা করে। এ ছাড়া ইসলাম সন্তানদেরকে আদেশ দেয় মা-বাবার জন্য, বিশেষ করে মায়ের জন্য দু'আ করতে। কেননা, তিনি কষ্টের ওপর কষ্ট সহ্য করে সন্তান গর্ভে ধারণ ও প্রসব করেন।

বাইবেলে নারীর মাসিক ঋতুস্রাবকে পাপের ফসল বলে আখ্যায়িত করে এবং ঋতুস্রাব শেষে তাকে ধর্মযাজকের কাছে দুই বার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু ইসলামে নারীর মাসিক ঋতুস্রাবকে 'ব্যথা' হিসেবে বর্ণনা করে নারীর প্রতি আরো সহানুভূতি প্রকাশ করে।

---

[১]আল কুরআন, ২ : ২২৮।

[২]আল্লামা জামাল আল বাদাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

www.pathagar.com

১৮.২. ইসলামে মায়ের অগ্রাধিকারমূলক মর্যাদা : একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞেস করল, কে আমার অধিক সেবাযত্ন পাওয়ার অধিকারী? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? উত্তর দিলেন, তোমার মা। লোকটি তৃতীয় বার প্রশ্ন করল, তারপর কে? উত্তর দিলেন, তোমার মা। লোকটি চতুর্থবার প্রশ্ন করল, তারপর কে? উত্তর দিলেন, তোমার বাবা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, তারপর কে ইয়া রাসূলাল্লাহ্? রাসূলুল্লাহ্ স. উত্তর দিলেন, তোমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যিনি নিকটতম এবং তারপর নিকটতম যিনি।[১] এ হাদিসে সেবাযত্নের ক্ষেত্রে কার আগে কে অগ্রাধিকার পাবে সে সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা যায়।

১৮.৩. কন্যা সন্তান লালন-পালনকারীর জন্য সুসংবাদ : নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান সম্পর্কিত আরো একটি দিক হলো কন্যা সন্তান লালন-পালন। সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচার, নির্যাতন ও অবহেলা থেকে নারীকে মুক্ত করে তাদেরকে উৎকৃষ্টরূপে গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'যে মুসলমানের দুটি মেয়ে থাকবে, তবে সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে রাখে তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।'[২]

১৮.৪. ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার : ১৮৭০ সালের আগে ইংল্যান্ড ও ইউরোপে মহিলার যাবতীয় সম্পত্তি তার বিয়ের পর স্বামীর মালিকানায় চলে যেত। কিন্তু ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে প্রত্যেক নারী বিয়ের আগে কিংবা পরে সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বিক্রির অধিকার পায়। উল্লেখ্য যে, ফ্রান্সে ১৯৩৮ সালের পূর্বে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্বীকার করা হতো না। অথচ ইসলাম সপ্তম শতকে নারীকে সম্পত্তির অধিকার প্রদান করেছে। আল কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

'পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ পায়' ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের এ ধারা সম্পর্কে কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে, ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে। তাদের এই ধারণা মূলত অজ্ঞতাপ্রসূত। কেননা, ইসলামে নারী শুধু একটি উৎস থেকে সম্পদ পায় না; বরং তাকে বহু উৎস থেকে সম্পদের মালিক করা হয়। অধিকন্তু নারীকে সম্পদের মালিক করা হলেও তাকে বহুবিধ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে সকল দায়-দায়িত্ব পুরুষকেই বহন করতে হয়। নারীর আর্থিক সুবিধাগুলো হলো :

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আদাব, বাবু মান আহাক্কুন্নাসি বিহুসনিস সুহবাহ।
[২]ইমাম বুখারি র., আল আদাবুল মুফরাদ।

www.pathagar.com

এক. বিয়ের পূর্বে বাগদান থেকে প্রাপ্ত সকল উপহার নারীর সম্পদ।

দুই. মোহরানা বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ কেবল নারীই পায়, পুরুষ নয়।

তিন. সংসারের কোনো খরচের দায়িত্ব নারীর নয়।

চার. চাকুরি থেকে অর্জিত আয় নারী তার ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে।

পাঁচ. কোনো কারণে তালাক হলে ইদ্দতকালে নারী ভরণপোষণ বাবদ খরচ পায় কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুরুষের কোনো অংশ নেই।

১৮.৫. নারীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরির অধিকার : ইসলামী শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে নারী বৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা. মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ স. মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করেছেন। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ স.-এর যুগে নারীদের বিভিন্ন পেশায় কাজ করার ক'টি দৃষ্টান্ত নিচে উল্লেখ করা হলো :

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর যুগে আসমা বিনতে আবু বকর রা. উট ও ঘোড়া চরাতেন, পানি পান করাতেন এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই করতেন, আটা পিষতেন।...দু' মাইল দূর থেকে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতেন।[১]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু এক লোক তাঁকে তিরস্কার করল। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি খেজুর কাটতে পার। তুমি হয়তো তা দিয়ে দান-খয়রাত এবং ভালো কাজ করবে।[২]

কা'ব ইবনে মালিকের এক দাসী মাদিনার সালা পাহাড়ে ছাগল চরাত। একদিন একটি বকরি অসুস্থ হলে সে তাকে ধরে পাথর দিয়ে যবেহ করল। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।[৩]

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামে নারীকে পুরুষের চেয়ে বেশি সুবিধা দেয়া হয়েছে। যেমন, নারী পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য নয়। তাই সে চাকুরি করতেও বাধ্য নয়। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে ইসলামী আইন-কানুন ও হিজাবের বিধান মেনে চাকুরি করতে কোনো বাধা নেই।

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুন্ নিকাহ, বাবুল গাইরাহ্...।

[২]সহিহ মুসলিম, কিতাবুত তালাক, বাব নং-৬।

[3]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুয যাবায়িহ ওয়াস সাইদি..., বাবু যাবিহাতিল মারাতি ওয়াল আমাহ।

www.pathagar.com

১৮.৬. নারীর রাজনৈতিক অধিকার : ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে নারীরা তাদের রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত। বিভিন্ন সময়ে তারা রাজনীতির ব্যাপারে নিজস্ব অভিমত তুলে ধরত। আল কুরআনের সূরা মুজাদালার প্রথম ক'টি আয়াত এক মহিলার অভিযোগ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ্ সেই মহিলার কথা শুনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আওস ইবনে সামিত রা. নামে এক সাহাবি তাঁর স্ত্রীকে এমন কথা বলেছিলেন যাতে যিহার সাব্যস্ত হয়। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, এই ব্যাপারে আমার নিকট কোনো নির্দেশ এখনো আসেনি, তবে মনে হয় তুমি তাঁর জন্য অবৈধ হয়ে গেছ। তখন স্ত্রী লোকটি কান্নাকাটি শুরু করে।[১] এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

দ্বিতীয় খলিফা উমর রা.-এর সময় লোকেরা বেশি অঙ্কের মোহর নির্ধারণ করতে থাকে। তখন তিনি মসজিদে নববীতে ঘোষণা দিলেন যে, মোহরানার সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ৪০০ দিরহাম এবং এর বেশি হলে তা বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। এ ঘোষণা শুনে ফাতিমা বিনতে কায়েস নামের এক মহিলা ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তাঁর যুক্তির পক্ষে মোহরানা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত (৪ : ২০) উদ্ধৃতি দেন। এরপর তিনি বলেন, 'ওহে উমর তোমার এ কাজের ব্যাপারে অধিকার নেই।' এ কথা শুনে উমর রা. বলেন, 'ওই মহিলা সঠিক, উমর সঠিক নয়।'[২] রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে এমন কথা বলায় কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি; বরং উমর রা. আক্ষেপ করে আরো বলেন, 'হে উমর, তোমার চেয়ে অনেক বেশি জানে।'[৩]জামাল বাদাবি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা এভাবেই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখতেন।

উসমান রা.-এর শাসনামলে আয়েশা রা. সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে উসমান রা. বা অন্য কেউ এ কথা বলেননি যে, নারী রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনো বক্তব্য দিতে পারবে না। একবার উসমান রা.-এর স্ত্রী রাজনৈতিক ব্যাপারে বক্তব্য দিতে চাইলে তাঁর এক সহযোগী তাঁকে বাধা দিলে উসমান রা. বললেন, তাঁকে বলতে দাও, সে তাঁর উপদেশ প্রদানে তোমার চেয়েও আন্তরিক। আলী রা.-এর আমলে আয়েশা রা. তাঁর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান

---

[১]আল কুরআনুর করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২, টিকা নং-১৬৯৫ দ্র.।

[২]আল খুদারি, মুহাদারাত ফি তারিখ আল উমাম আল ইসলামিয়া, খ. ২, পৃ. ১৭-১৮।

[৩]আল্লামা জামাল আল বাদাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর এ অবস্থানের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেননি। কাজেই মুসলিম নারীরা রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিতে পারে। যদিও তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ঘর রক্ষা, তবুও এটা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয় না।[১]

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীদের মতামত গ্রহণের আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো, হযরত উসমান রা.-এর খলিফা নির্বাচনের সময় আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. রাসূলুল্লাহ্ স.-এর স্ত্রীগণ ও অন্যান্য অভিজ্ঞ মহিলার বাড়ির দরজায় গিয়ে তাদের অভিমত জিজ্ঞেস করতেন।

নারী অঙ্গনে নারীরাই নেতৃত্ব দেবে। যেমন মহিলা স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা অধিদপ্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের নেতৃত্ব দেয়াই বাঞ্ছনীয়। সমাজে যেখানে পুরুষের প্রাধান্য রয়েছে সেখানে পুরুষরাই নেতৃত্ব দেবে এটা ইসলামের স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু পুরুষরা অযোগ্য হলে নারী কর্তৃক নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ বৈধ।

নেতৃত্বের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা হলো : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ— 'পুরুষ নারীর কর্তা'[২]—এই আয়াতের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বভার পুরুষের ওপর অর্পিত। এটা ইসলামী আইনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। কিন্তু জরুরিয়াতের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে নারী নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন অবৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম রা. বলেন, 'নিতান্ত প্রয়োজনে ঠেকিয়াও কোনো সময়ই নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান করা যাবে না—এ কথা শরী'আহ্সম্মত নয়।'[৩]

নারী নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আল্লামা আশরাফ আলী থানভী র. আল কুরআনে বর্ণিত বিবি বিলকিসের রাজত্বের কাহিনী উল্লেখপূর্বক বলেন, 'বিলকিসের মুসলমান হবার পর তাঁর রাষ্ট্রাধিকার কেড়ে নেয়ার কোনো প্রমাণ নেই, বরং তাঁর রাজ্য যে আগের মতোই বহাল ছিল, ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বিলকিসের রাজত্ব ও রাজ্যশাসন পদ্ধতির প্রতি আল কুরআনে কোনোরূপ অবজ্ঞা বা অসমর্থন জ্ঞাপন করা হয়নি। উসূলে ফিক্হর সুবিদিত বিধান হচ্ছে, কুরআন বা হাদিসে যদি অতীতের কোনো ঘটনা বা ব্যবস্থার প্রতি কোনোরূপ অবজ্ঞা বা অসমর্থন প্রকাশ না করে বর্ণনা করা হয়, তবে তা শরী'আহ্তে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং কুরআনের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মহিলার নেতৃত্ব চলতে পারে।'[৪]

---

[১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

[২]আল কুরআন, ৪ : ৩৪।

[৩]মুক্তিযুদ্ধের দলীল, ১ম সংস্করণ, খ. ২, পৃ. ২৪৫।

[৪]দৈনিক আজাদ, ২২ অক্টোবর, ১৯৬৪। উদ্ধৃত : মুহাম্মদ মূসা, রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় নারী নেতৃত্ব, ইসলামী আইন ও বিচার, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭, পৃ. ৪৬।

www.pathagar.com

নারী নেতৃত্ব প্রসঙ্গে মুফতি শফি র. বলেন, 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলামী শিক্ষা ও ঐতিহ্যের খেলাপ নয়।'[১]

১৮.৭. বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্ব : হানাফি মাযহাবে ইমাম যুফার র. ব্যতীত অন্য সকলের মতে, হদ ও কিসাস ছাড়া সব ধরনের বিচারের ক্ষেত্রে নারীকে দায়িত্ব দেয়া বৈধ। তাঁদের দলিল হলো আল কুরআনে উল্লেখিত রাণী বিলকিসের ঘটনা। বিলকিস বললেন, 'হে পরিষদবর্গ! আপনারা আমাকে আমার এ সমস্যার ব্যাপারে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোনো কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' তারা বললেন, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। কী আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন।'[২] এ আয়াতে সাবার রাণী বিলকিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্তে নেতিবাচক কিছু বলা হয়নি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নারী রাষ্ট্র পরিচালনার মতো বিচারকার্যও সম্পাদন করতে পারে। এ ছাড়া ইসলামে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে সবাই একমত। আর বিচারকার্য সাক্ষ্যদানের মতোই।

ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, হুদুদ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে মহিলাদেরকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করা বৈধ।[৩] ইমাম ইবনে হাযম র.-এর মতে, সাধারণভাবে সকল বিষয়ে মহিলাদেরকে বিচারক নিযুক্ত করা বৈধ। এমনকি হুদুদ এবং কিসাসের মধ্যেও তাদেরকে বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে। তিনি তাঁর দাবির সমর্থনে কিয়াসের দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, উমর রা. আশ-শিফা নামক জনৈকা মহিলাকে বাজার তদারকির দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[৪] এর ওপর কিয়াস করে বলা যায়, নারীকে বিচারকার্যে দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ। অনুরূপভাবে 'স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের তত্ত্বাবধায়ক।' যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহের তত্ত্বাবধায়ক।'[৫] এ দায়িত্ব সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং নারীর গৃহের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার ওপর কিয়াস করে বলা যায়, তারা বিচারকার্যেও দায়িত্ব পালন করতে পারে।[৬]

---

[১]দৈনিক জঙ্গ (উর্দু), ৩ নভেম্বর, ১৯৬৪। উদ্ধৃত : মুহাম্মদ মূসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
[২]আল কুরআন, ২৭ : ৩২-৩৩।
[৩]বুরহানুদ্দিন আল মুরগিনানি র., আল হিদায়া, আল মাকতাবুল ইসলামিয়্যাহ, মিসর, খ. ২, পৃ. ১০৭।
[৪]ইমাম ইবনে হাযম র., আল মুহাল্লা, দারুল আফাকিল জাদিদাহ, বৈরুত, খ. ৯, পৃ. ৪৩০।
[৫]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল মারাতু রায়িয়াতুন ফি বাইতি জাওযিহা।
[৬]ইমাম ইবনে হাযম র., আল মুহাল্লা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০।

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে হাযম র. যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, মহিলাদের দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদন অবৈধ নয়। তাঁর যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুর মূলনীতি হচ্ছে বৈধ হওয়া, যদি এ ব্যাপারে নিষিদ্ধতার কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়। আর নারীর বিচারক হওয়ার ব্যাপারে নিষিদ্ধতার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং যে বিবাদ মীমাংসা করার যোগ্যতা রাখে, তাকে ফয়সালার কর্তৃত্ব প্রদান করা বৈধ। আর মহিলারাও বিবাদ মীমাংসা করতে সক্ষম। তাই তাদেরকে বিচারকার্যে কর্তৃত্বদান বৈধ হবে। কেননা যুক্তি-প্রমাণ অনুধাবন করতে পারা এবং কোন বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে নারীত্ব কোনো প্রতিবন্ধক হতে পারে না।[১] তবে ইমাম মালিক র., শাফিঈ র., আহমাদ ইবনে হাম্বল র. নারীকে বিচারকার্যে দায়িত্ব দেয়ার পক্ষে মত দেননি। তাঁদের মতে বিচারকার্যের জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত।

নারীকে বিচারক নিয়োগ করার বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে ড. ইউসুফ আল-কারযাভি বলেন, নারীদের বিচারকার্যে দায়িত্ব প্রদানের বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে অকাট্য কোনো প্রমাণ বা সর্বসম্মত অভিমত পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনটি শর্তে নারীকে বিচারকার্যে দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ। শর্তগুলো হচ্ছে:

ক. বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়া।

খ. বিচারকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা।

গ. নারীকে বিচাকার্যের দায়িত্ব প্রদানের শর্তটি নারীর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং এটি সমাজের উন্নতির স্তরের সাথে সম্পৃক্ত।

ড. কারযাভির মতে নারীকে বিচারকার্যে দায়িত্ব প্রদানের বৈধতার বিষয়টি ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। বরং নারীর নিজ সত্তা, পরিবার, সমাজ ও ইসলামের কল্যাণ বিবেচনায় প্রযোজ্য হবে।[২]

১৮.৮. ইসলাম প্রচারে নারীর অবদান : ইসলাম প্রচার ও অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কয়েকজন নিবেদিতা নারী হলেন :

উরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ্ স.-এর মিশনের প্রথম দিকে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ ও প্রচার করেন যখন কাফিররা কঠোরভাবে ইসলামের বিরোধিতা করছিল। প্রখ্যাত সাহাবি আনাস রা.-এর মা উম্মে সালিম তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তৎকালীন মক্কার প্রখ্যাত ধনী আবু তালহার (যিনি তখনও মুশরিক) পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পান। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে,

---

[১] মু'তামারুল ফিকহিল ইসলামী, নিজামুল কাযা ফিল ইসলাম, জামিয়াতুল ইমাম প্রকাশনা, রিয়াদ, ১৯৮৪, পৃ. ১২। উদ্ধৃত : কামরুজ্জামান শামীম, বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬, ২০০৩, পৃ. ১১৭।

[২] মাউকিউল কারযাভি। আরো দেখুন, ওয়েব সাইট :http://www.qaradawi.net

www.pathagar.com

আবু তালহা মুশরিক। আবু তালহা যখন তাঁর সম্পদের কথা উল্লেখ করেন তখন তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বলেন, 'আপনার সোনা-রুপায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আপনার ঈমানই হবে আমার মোহরানা। আপনার কাছ থেকে আর কোনো উপহার আমি চাই না।' পরবর্তীতে আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে বিয়ে করেন। উম্মে শারিক বিপদ নিশ্চিত জেনেও মুশরিকদের বাড়ি যেতেন এবং তাদের স্ত্রী-কন্যাদের দীনের দাওয়াত দিতেন।[১]

১৮.৯. কল্যাণমূলক কাজে মুসলিম নারীর অবদান : ইসলামের প্রাথমিক যুগে ও পরবর্তীতে বহু নারী সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর মৃত্যুর পর আয়েশা রা.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ির রা. তাঁর জন্য এক লাখ দিরহাম উপহার নিয়ে আসেন। সাথে সাথেই সমুদয় অর্থ তিনি গরিবদের মাঝে বন্টন করেন। সে দিনটাতে তিনি রোযাদার ছিলেন। সারা দিন সমস্ত অর্থ গরিবদের বিলিয়ে ইফতারের সময় যখন তিনি ঘরে ফেরেন তখন দেখেন যে ঘরে এতটুকুও খাবার নেই, কোনো টাকা পয়সাও নেই; লাখ দিরহাম পেয়ে একবারের জন্যও তিনি নিজের কথা ভাবেননি।[২]

১৮.১০. যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ : রাসূলুল্লাহ্ স. ও তাঁর পরবর্তীতে সাহাবিদের সময় বহু মুসলিম নারী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। রণাঙ্গনে তারা পুরুষের পাশে থেকে তাদের খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসাসহ অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করেছেন। এসব নেতৃস্থানীয় মহিলার মধ্যে রয়েছেন রাবিয়া বিনতে মাউদ, উম্মে আতিয়া, আয়েশা, উম্মে আইমান, উমাইয়া বিনতে কায়েস গাফারিয়া, উম্মে সালিম, নুসাইবা বিনতে কা'ব, উম্মে তাহের, হামনা বিনতে যাশ, সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে রুবাইয়ি বিন্‌ত মাআবিয রা. বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, 'আমরা নবী স.-এর সাথে যুদ্ধে শরিক হয়ে লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের পরিচর্যা করতাম এবং আহত ও নিহত লোকদের মদিনায় ফেরত পাঠাতাম।'[৩]

উমাইয়া বিনতে কায়েস গাফারিয়া বলেন, তিনি প্রথম যুদ্ধে যোগ দেন খুব অল্প বয়সে। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে আরো কয়েকজন নারীসহ যুদ্ধে

---

[১]আল্লামা জামাল আল বাদাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

[২]আল্লামা জামাল আল বাদাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

[৩]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু রাদ্দিন নিসায়িল জারহা ওয়াল কাতলা ইলাল মাদিনা।

www.pathagar.com

যাবার অনুমতি চান তখন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'আল্লাহ্‌র রহমতে এগিয়ে এসো।'

হুনায়েনের যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল তখন উম্মে সালিম তাঁর কোমরে ছোরা বেধে তাঁর স্বামী আবু তালহাকে বলেন যে, তিনি তার কাছে কোনো কাফির এলে হত্যা করবেন। তাঁর স্বামী আবু তালহা রা. ও রাসূলুল্লাহ্ স. উভয়ের কেউই তাঁকে এ কাজে বাধা দেননি। উহুদ যুদ্ধে যখন কাফিররা রাসূল স.-কে ঘিরে ফেলেছিল তখন আরও কয়েকজন মুসলিম নারীদের সাথে নুসাইবা বিনতে কা'ব তলোয়ার হাতে রাসূল স.-কে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কাফিরদের মোকাবেলা করেন। খন্দকের যুদ্ধে সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব একজন শত্রুসৈন্যকে তাঁবুর খুঁটির আঘাতে হত্যা করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন বিপন্ন অবস্থায় তখন আসমা বিনতে ইয়াজিদ তাঁবুর খুঁটির সাহায্যে দশ জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন।[১]

১৯. পরিবেশ সংরক্ষণ

ইতঃপূর্বে হিফয আন-নফস বা মানুষের জীবন সংরক্ষণের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। আর মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব পরিবেশের সাথে জড়িত। তাই মানবজাতির অস্তিত্বের স্বার্থেই পরিবেশ সংরক্ষণ জরুরি।

আমাদের চারপাশের জীব ও জড় জগতের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। যেমন, আলো, বাতাস, শব্দ, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, মাটি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল, পুকুর, ডোবা, খাল-বিল, নদী, সাগর-মহাসাগর, কীটপতঙ্গ, পশু-পাখি, জীবজন্তু ইত্যাদি সবকিছুই পরিবেশের অংশ। এই পরিবেশের সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদস্বরূপ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন।'[২] 'তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে আমি সব রকমের উদ্ভিদ (ও গাছপালা) জন্মানোর ব্যবস্থা করি, পরে তা থেকে সবুজ-শ্যামল পাতা উদ্গত করি, পরে তা থেকে পরস্পর জড়ানো শস্যদানাও উৎপন্ন করি এবং ফলের ভারে নুয়ে পড়া খেজুরের গোছা বের করে আনি, আর আঙুরের উদ্যানমালা সৃষ্টি করি এবং যয়তুন ও দাড়িম্বও। এসব ফলের একটির সাথে অন্যটির মিল রয়েছে, অথচ এক একটির গুণ আলাদা। লক্ষ করো, এসব

---

[১]আল্লামা জামাল আল বাদাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

[২]আল-কুরআন, ২ : ২২।

www.pathagar.com

গাছে যখন ফল ধরে এবং যখন ফল পাকে তখন তোমরা এর অবস্থা (মনোযোগ দিয়ে) দেখ। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।'[১]

মানুষের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি, বিকাশ, উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে পরিবেশের প্রাচুর্য ও সুস্থতার ওপর। আবার এই পরিবেশের নিয়ন্ত্রক হলো মানুষ। মহান আল্লাহ্ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ -'মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে।'[২] আবার মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হয়। কেননা, মহাবিশ্বের যে কোনো বিপর্যয়ের কারণেই সৃষ্টি হয় দুর্ভিক্ষ, শস্যের উৎপাদন হ্রাস, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির মতো প্রতিকূল অবস্থা, যা মানুষের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থেই পরিবেশ সংরক্ষণ করা জরুরি। ফলে ইসলামী শরী'আহ্ এটিকে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় আল কুরআন থেকে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ -'তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।'[৩]

মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। এ জন্য পরিবেশ সংরক্ষণে এবং সকল প্রাণী ও জীবজন্তুর প্রতি তার দায়-দায়িত্ব অনেক। এই দায়িত্ব পালন করাটা মানুষের নিজের অস্তিত্বের জন্যই জরুরি। তাই ইসলামী শরী'আহ্তে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব অনেক বেশি। গাছপালা ও বনাঞ্চল রক্ষা, নতুন বন সৃষ্টি, পশুপাখি ও জীবজন্তুর প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্র নির্দেশনা থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

১৯.১. গাছপালা ও বনাঞ্চল রক্ষায় শরী'আহ্র নির্দেশনা : গাছপালা মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। তা থেকে মানুষ খাদ্য, জ্বালানি ও বাসস্থানের উপাদান সংগ্রহ করে। আবার এই গাছপালা ও বনাঞ্চলই ঝড়-ঝঞ্ঝাসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ স. গাছপালা লাগাতে উৎসাহিত করেছেন এবং বিনা প্রয়োজনে তা কাটতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুটি হাদিস হলো :

এক. যদি কোনো মুসলমান গাছ লাগায় এবং সেখান থেকে মানুষ আহার করে তাহলে তা তার জন্য সদাকাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়, যদি সে গাছ থেকে চুরি

---

[১]আল-কুরআন, ৬ : ৯৯।

[২]আল কুরআন, ৩০ : ৪১।

[৩]আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭ ।

www.pathagar.com

হয় তাও তার জন্য সদাকাহ্ হয়। যদি কোনো হিংস্র প্রাণী সে গাছ থেকে খায়, তাও তার জন্য সদাকাহ্ হয়। যদি পাখি খায়, তাও তার জন্য সদাকাহ্ হয়। যদি সেখান থেকে ইচ্ছাকৃত কাউকে দান করা হয় তাও তার জন্য সদাকাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়।[১]

দুই. যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতিতেও রাসূলুল্লাহ্ স. গাছপালা না কাটার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা কোনো নারী, শিশু ও অশীতিপর বৃদ্ধকে অযথা হত্যা করবে না। তোমরা ফলবান কোনো বৃক্ষ কর্তন করবে না এবং কোনো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে না। খাওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তোমরা কোনো বকরি ও উট হত্যা করবে না এবং তোমরা কোনো খেজুর বৃক্ষ ডুবিয়ে বা জ্বালিয়ে দেবে না।[২]

১৯.২. সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টিতে শরী'আহ্‌তে উৎসাহ প্রদান : মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণে নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস করে থাকে। কিন্তু মানবজাতির অস্তিত্বের স্বার্থে বনাঞ্চল রক্ষা করা জরুরি। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ স. বনাঞ্চল সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুটি হাদিস হলো :

এক. রাসূলুল্লাহ্ স. মদিনার প্রত্যেক প্রান্তে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং এই মর্মে ফরমান জারি করেছিলেন যে, এই সীমানার মধ্য থেকে কোনো গাছের পাতা পাড়া যাবে না, আর তা কাটাও যাবে না, তবে যা উট খায় তা ব্যতীত।[৩]

দুই. মদিনার গাছপালা কর্তন করা যাবে না। যে ব্যক্তি সেখানে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি করবে তার ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতামণ্ডলী ও মানবকুলের পক্ষ থেকে অভিশাপ বর্ষিত হবে।[৪]

১৯.৩. অনাবাদি জমিতে বৃক্ষ লাগানো : ইসলামী শরী'আহ্‌তে আবাদি জমি পতিত ফেলে রাখা বৈধ নয়। পতিত জমিকে আবাদি করে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন :

এক. যে ব্যক্তি মৃত জমিকে জীবিত করবে, সে জমি তার। এর জন্য সে প্রতিদান পাবে। এ জমির ফসল খাওয়ার কারণেও সে প্রতিদান পাবে।[৫]

দুই. যে ব্যক্তি মৃত ভূমিকে জীবিত করবে; সে জমি তার জন্যই হবে।[১]

---

[১]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত।

[২]রা'জেউ আ'লা সাবিলিল মিছাল, মারাছিলু বুয়াজারা, ইনসানিয়াতে ইসলাম, খ. ১, পৃ. ২৭৮।

[৩]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ফি তাহরিমিল মাদিনা।

[৪]সহিহ আল বুখারি, কিতাবু ফাযায়িলিল মাদিনা, বাবু হারামিল মাদিনা।

[৫]মুসনাদে আহমাদ, কিতাবু বাকী মুসনাদিল মুকছিরীন।

www.pathagar.com

১৯.৪. গাছ পরিচর্যা করা সদকায়ে জারিয়া : গাছ লাগানো যেমন সদকায়ে জারিয়া, ঠিক তেমনি গাছ পরিচর্যা করাও সদকায়ে জারিয়া। গাছপালার পরিচর্যাকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো গাছ লাগায়, অতঃপর ফল ধরা পর্যন্ত তার হিফাযত ও দেখাশোনা করতে থাকে, এ সময়ে সে গাছের ফলের যা কিছু ক্ষতি হবে তার ছওয়াব সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাবে।'[২]

১৯.৫. পশু-পাখির উপকারিতা সম্পর্কে আল কুরআনের বর্ণনা : ইসলামী শরী'আহ্‌তে এসেছে বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের জন্য। শুধু মানুষ নয়; বরং পশুপাখির সুখ-শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করাও শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য। মানুষের প্রয়োজনে এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ এদেরকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে, এদের দিয়ে হালচাষ করে, এদের দুধ পান করে ও গোশত ভক্ষণ করে এবং চামড়া ও হাড় ব্যবহার করে। পশুপাখির এসব উপকারের কথা আল কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের উপকারিতার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর তিনিই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে তোমাদের জন্য শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু অংশ তোমরা আহারও করে থাক। আর সেগুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য রয়েছে—যখন সন্ধ্যাকালে তাদেরকে চারণভূমি থেকে নিয়ে আসো আর প্রভাতে তাদেরকে যখন চারণভূমিতে নিয়ে যাও এবং এরা তোমাদের বোঝা এমন দূর দেশে বহন করে নিয়ে যায় যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ছাড়া তোমরা পৌঁছুতে পারতে না। সত্যিই তোমাদের রব অত্যন্ত দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, যেন তোমরা এর ওপর আরোহণ করতে পারো, (এ ছাড়া তাতে) শোভা (বর্ধনের ব্যবস্থাও) রয়েছে। আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যার সম্পর্কে তোমরা খবরও রাখ না।'[৩]

১৯.৬. জীবের প্রতি দয়া করা শরী'আহ্‌র নির্দেশ : মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং এর সবকিছুই তার অধীন করে দেয়া হয়েছে। এই প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে জীবজন্তুর প্রতি দয়া ও ইহসান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং কিয়ামতে তাকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'তোমরা জমিনবাসীর ওপর দয়া করো, আসমানবাসী তোমাদের ওপর দয়া করবেন।'[৪]

---

[১]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল মুজারা'আত, বাবু মান আহইয়া আরদান মাওয়াতান।

[২]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, আল হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, লেবানন, ১৯৭৮, পৃ. ১২৬।

[৩]আল কুরআন, ১৬ : ৫-৮।

[৪]জামে আত-তিরমিযি, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ, অনুচ্ছেদ-১৬।

www.pathagar.com

ইসলামী শরী'আহ্‌তে ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল সবকিছুকেই এক একটি উম্মত হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, 'আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি ডানা দুটি দিয়ে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতো এক-একটি জাতি।'[১] প্রকৃতপক্ষে এরা মানুষের মতোই জীবনের অধিকারী। এদের ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, আছে সুখ-দুঃখের অনুভূতি। কিন্তু এরা তা প্রকাশ করতে পারে না। তাই সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ স. বলেন : 'পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তোমরা দয়া করো। তাহলে আরশের অধিপতি প্রভুও তোমাদের প্রতি সদাচার করবেন।'[২]

সৃষ্টিজীবের প্রতি সদাচরণ করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় আরো একটি হাদিস থেকে। একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তার তীব্র পিপাসা লাগে। সে একটি কূপ পেয়ে গেলো। সে তাতে অবতরণ করলো এবং পানি পান করলো, তারপর উঠে এলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটি সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে, যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কূপে অবতরণ করলো এবং মোজার ভেতর পানি ভরলো। তারপর মুখ দিয়ে তা (কামড়িয়ে) উপরে উঠে এলো। তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জীব-জন্তুর জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? তিনি বললেন, 'হাঁ প্রত্যেক দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য পুরস্কার আছে।'[৩]

১৯.৭.অন্যায়ভাবে জীব হত্যা নিষিদ্ধ : অন্যায়ভাবে শুধু মানুষ নয়; বরং সকল জীব হত্যার জন্যই মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামে বিনা কারণে কুকুর পর্যন্ত হত্যা করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ্‌ স. বলেছেন, এক মহিলা একটি বিড়াল বেঁধে রাখত; খেতে দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না, যাতে সে জমিনে বিচরণ করে খাবার খেতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি মারা যায়। এ জন্য ঐ মহিলাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।[৪]

---

[১]আল কুরআন, ৬ : ৩৮।

[২]সুনান আবু দাউদ ও সহিহ আত-তিরমিযি, তাহকিক-মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রাসূলিল্লাহ স., বাবু মা জায়া ফি রাহমাতিন নাস।

[৩]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আদাব, বাবু রাহমাতিন্নাসি ওয়াল বাহায়িম।

[৪]সহিহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াসিলা ওয়াল আদাব।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ স. চারটি পাখি ও কীটপতঙ্গ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন; সেগুলো হলো, পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদপাখি ও ছারাদ।[১] রাসূলুল্লাহ্ স. পিপীলিকাকে পুড়িয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[২]

১৯.৮. পাখির বাচ্চা ধরে আনা উচিত নয় : রাসূলুল্লাহ্ স. পাখির বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে ছিলেন খুবই সচেতন। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। আমরা একটি বুলবুলি পাখিকে দুটি ছানাসহ দেখলাম। আমরা ছানা দুটিকে ধরে ফেললাম। বুলবুলিটি তার ছানার জন্য অস্থির হয়ে উড়ছিল। অতঃপর তিনি ফিরে এলেন এবং বললেন, কে বাচ্চাগুলোকে তার মা থেকে পৃথক করেছে ? বাচ্চাগুলোকে তার মায়ের নিকট ফেরত দাও।[৩]

১৯.৯. পশুপাখি নির্যাতন করা ঠিক নয় : পশুপাখিরও জীবন আছে, তারাও সুখ-দুঃখ অনুভব করে বলে তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করা কোনোভাবে কাম্য নয়। এ ব্যাপারে সুহাইল ইবনে হানজালিয়া রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. একবার একটি উটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন ক্ষুধায় উটটির পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে। তখন তিনি সংশ্লিষ্ট মালিককে বললেন, জীব-জন্তু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। এতে ভালোভাবে আরোহণ করো এবং ভালোভাবে খেতে দাও।[৪] এ ব্যাপারে অন্য আরো একটি হাদিসে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. আমাকে তাঁর উটের পেছনে বসালেন। পথিমধ্যে একটি উট দেখা গেল, তাঁকে দেখে উটটি কান্না জুড়ে দিল এবং তার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু বের হলো। তিনি কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলালেন এবং উটটি চুপ হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, এই উটটির মালিক কে? একজন আনসার এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! উটটি আমার। তখন তিনি বললেন, যেসব চতুষ্পদ জন্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করছ না? উটটি আমার কাছে এ বলে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে অভুক্ত রেখেছ এবং তাকে দিয়ে কঠিন কাজ আদায় করাচ্ছ।[৫]

---

[১]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবু ফি কতলিজ জুররে।

[২]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফি কারাহিয়াতি হারকিল আদুব্বি বিন্-নার ।

[৩]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফি কারাহিয়াতি হারকিল আদুব্বি বিন্-নার।

[৪]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু মা ইয়াওমারু বিহি মিনাল কিয়ামি আলাদদাওয়াবি ওয়াল বাহায়িম।

[৫]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু মা ইয়াওমারু বিহি মিনাল কিয়ামি আলাদদাওবি ওয়াল বাহায়িম।

www.pathagar.com

১৯.১০. লড়াইয়ের মাধ্যমে পশুপাখির ক্ষতি করা উচিত নয় : জীবজন্তুরও প্রাণ আছে। তারাও দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে। এজন্য মানুষ নিজের আনন্দের জন্য পশুর সাথে পশুর লড়াই দিয়ে থাকে। এতে তাদের শারীরিক অনেক ক্ষতি হয়। তারা অবলা জন্তু, ব্যথার কথা বলতে পারে না। তাই ইসলামী শরী'আহ্ পশুর লড়াই দিতে নিরুৎসাহিত করেছে। একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ স. দুটি পশুর লড়াই দিতে নিষেধ করেছেন। যেমন হত্যার উদ্দেশ্যে একটি মোরগকে অন্য একটি মোরগের সাথে লড়াই দিয়ে থাকে। অথচ এগুলো থেকে তারা খেদমত নিয়ে থাকে। এটা এক প্রকার প্রতিযোগিতা। এ ধরনের প্রতিযোগিতা ফাসাদের নামান্তর। তাই রাসূলুল্লাহ্ স. জীবজন্তুকে কষ্ট দিতে বারণ করেছেন এবং 'জন্তুগুলোকে পারস্পরিক লড়াইয়ে নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন।[১]

১৯.১১. জীবজন্তুর অধিকার : পশুপাখি ও জীবজন্তুর অধিকার আছে। ইসলামী শরী'আহ্ তাদের এ অধিকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্যের বাইরে কাজে লাগানো উচিত নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, এক ব্যক্তি গরুর পিঠে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন গরুটি তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, বরং আমাকে হালচাষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।[২]

ইসলাম মানবতা ও দয়ার ধর্ম। এই দয়ার বিষয়টি চতুষ্পদ জন্তু জবাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমনকি গৃহপালিত জীবজন্তু জবাই করার সময়ও তার প্রতি দয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর ওপর ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যখন তোমরা কোনো পশুপাখি জবাই করবে, উত্তমরূপে জবাই করবে। তোমরা অস্ত্র ধার দিয়ে নেবে, তাহলে জবাই করা সহজ হবে এবং পশুপাখির ওপরও ইহসান হবে।[৩]

ইসলামী শরী'আহ্তে পশুপাখির অধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা হলো [৪]:

ক. রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো পশুর খাদ্য ও আরামের ব্যবস্থা করা এবং তাদের প্রতি জুলুম না করার নির্দেশ জারি করা।

খ. রাষ্ট্র পশুর মালিককে বাধ্য করবে যে, হয় তার মালিকানাধীন পশুকে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রদান করবে, না হয় তাকে বিক্রি করে দেবে।

---

[১]সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফি তাহরিশি বাইনাল বাহায়িম ও তিরমিযি।

[২]সহিহ মুসলিম, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা।

[৩]ইবনু মাজাহ, কিতাবুয যাবায়িহ।

[৪]অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, ইসলামে মেহনতি পশুর অধিকার, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ২০০৫, পৃ. ৯৯।

www.pathagar.com

গ. পশুর ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যাবে না এবং তাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে কাজ ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

ঘ. তাদেরকে উপযুক্ত খাবার দিতে হবে ও তাদের জন্য আরামের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০. শান্তি ও স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ

ইসলামী শরী'আহ্ কখনই অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ, লুটতরাজ, বোমাবাজি ইত্যাদি সমর্থন করে না; বরং অশান্তির বদলে শান্তি, জুলুমের বদলে ইনসাফ, অসাম্যের বদলে সাম্য, পরাধীনতার বদলে স্বাধীনতা, অন্ধকারের বদলে আলো, মূর্খতার বদলে শিক্ষা, দারিদ্র্যের বদলে সমৃদ্ধি, পাশবিকতার বদলে মানবিকতা প্রতিষ্ঠাই ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য। ইসলামে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলাকে হত্যার চেয়েও গুরুতর বিবেচনা করা হয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ—'ফিতনা-ফাসাদ হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।'[১] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ—'তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না।'[২]

'ইসলাম' (إِسْلَام) পরিভাষাটির মূল শব্দ হলো 'সিলমুন' (سِلْم) যার অর্থ শান্তি, প্রশান্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদি। মুসলিমরা শান্তিপ্রিয় জাতি। তারা প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শান্তি কামনা করে। সালাতের শেষে এবং তাদের কারো সাথে অন্য কারো সাক্ষাৎ হলেই সর্বপ্রথম যে বাক্য বিনিময় করে তা হলো 'আস-সালামু আলাইকুম' বা 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'। তারা ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, স্বামী-স্ত্রী সকলেই সকাল-সন্ধ্যা ও রাতে এই একই সম্ভাষণ বিনিময় করে– 'সালাম' বা শান্তি। তাই বলা যায়, শান্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য।

২০.১. মানবভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা : বিশ্বময় চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম মানব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে গোটা মানবজাতিকে একই পরিবারভুক্ত মনে করে। ইসলামের দাবি হচ্ছে, সব মানুষই এক আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি এবং তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি প্রত্যেক মানুষকেই মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টির সেরা করেছেন। ইসলামের শিক্ষা

---

[১]আল কুরআন, ২ : ১৯১।

[২]আল কুরআন, ২ : ১১।

www.pathagar.com

হচ্ছে, সব মানুষের উৎপত্তি এক আদম ও হাওয়া থেকে। ইসলাম আরো শিক্ষা দেয়, আদম আ. থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল নবী-রাসূল যেমন, নুহ আ., ইবরাহিম আ., মুসা আ., ঈসা আ., মুহাম্মদ স. প্রত্যেকেই ছিলেন ভাই ভাই এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন. 'তোমরা বলো : আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি, আর নাযিল হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি, আর যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে দেয়া হয়েছে; আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না, আমরা তো তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।'[১] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, 'মানুষ তো ছিল একই উম্মত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে।'[২]

ইসলাম সকল জাতির সাথেই শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। সকলের সাথে ন্যায়পরতা, সুবিচার ও সুন্দর আচরণ করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু তাদের কথা ভিন্ন যারা ইসলাম ও মুসলিম জাতির সাথে খামাখা শত্রুতা করতে চায়। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করেত নিষেধ করেন না যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বেরও করে দেয়নি।'[৩]

ইসলামী শরী'আহ্ বিশ্বব্যাপী মানবভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যুদ্ধ সংঘটনের কারণ দূর করতে চায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানবভ্রাতৃত্বের নীতিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হলে যুদ্ধের আশঙ্কা অনেকখানি কমে যাবে।

মানবভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি ইসলাম বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল কুরআনে এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের বন্ধুরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এ বলে যে, 'মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু।'[৪] নবী করিম স. মুসলিম উম্মাহ্‌কে একটি মানবদেহের সাথে তুলনা করেছেন। এটা সে তুলনার সাথেও সাদৃশ্যমান যেখানে উম্মাহ্‌কে একটি প্রাসাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার এক অংশ অন্য

---

[১]আল কুরআন, ২ : ১৩৬।
[২]আল কুরআন, ১০ : ১৯।
[৩]আল কুরআন, ৬০ : ৮।
[৪]আল কুরআন, ৯ : ৭১।

www.pathagar.com

অংশকে শক্তিশালী করে তোলে। রাসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান একে অন্যের ভাই, কেউ কারো ক্ষতি করে না বা একে অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।'[১]

ইসলাম 'উম্মাহ্' বা জাতির যে ধারণা দেয় তা ব্যাপক ও উদার। কুরআনে বর্ণিত উম্মাহ্ শুধু সকল দেশের সকল ঈমানদারকেই অন্তর্ভুক্ত করে না; বরং পৃথিবীর আদিকাল থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল ঈমানদারকে অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআনে যখন বলা হয় এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই তখন আদম আ. থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ স.-এর উম্মতের সকলেই এ ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইসলামের আলোকে সকল বিশ্বাসী একই ভ্রাতৃত্ব ও জাতির অন্তর্ভুক্ত। আর এই বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আশঙ্কা কমিয়ে দেয়া যায়। কেননা, বিগত দুটি মহাযুদ্ধসহ প্রায় সকল যুদ্ধের মূল কারণ ছিল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এ জন্য ইসলাম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ দূর করে বিশ্বাসের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এক হাদিসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আসাবিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেয়।' জনৈক সাহাবি যখন আসাবিয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন, 'আসাবিয়া হচ্ছে যখন এক জাতি আর এক জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে এবং তাদের অধিকার অস্বীকার করে, যখন কোনো জাতির লোকজন তাদের লোকদের অন্যায় এবং ভুলগুলোকে সমর্থন দেয় শুধুমাত্র জাতীয়তার কারণে।'[২]

বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে সংকীর্ণ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা যুদ্ধের একটি কারণ। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক দেশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়। ফলে সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এক দেশ অন্য দেশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অধিকার পায়। অর্থাৎ দেশের সার্বভৌমত্ব আর যুদ্ধ একই সূত্রে গাঁথা। কিন্তু বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থায় যুদ্ধের আশঙ্কা অনেকখানি কমে যায়।

২০.২. শত্রুর সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার কুরআনি নির্দেশ : শত্রুর সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কখনো ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে—এটাই তাক্ওয়ার নিকটতর।'[৩]

---

[১]সহিহ আল বুখারি।

[২]আল্লামা জামাল আল বাদাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

[৩]আল কুরআন, ৫ : ৮।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ স. পরম শত্রুর সাথেও ভালো আচরণ করেছেন। এ ছাড়া তিনি অমুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। তিনি নিজেই তাদের সাথে লেনদেন করেছেন এবং শ্রমের বিনিময় করেছেন। হিজরতের সময় পথ দেখানোর জন্য তিনি মক্কার মুশরিক আব্দুল্লাহ্ ইবনে আরিকতের সাহায্য নিয়েছিলেন। জুহরির বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ্ স. যুদ্ধে ইহুদিদের সাহায্য নিয়েছেন এবং মুসলমানদের ন্যায় তাদেরকে গনিমতের মাল দিয়েছেন। হুনাইন যুদ্ধে ছওয়ান ইবনে উমাইয়া মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছেন।[১]

২০.৩. শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ : পৃথিবীতে একবার শান্তি স্থাপিত হলে তাতে অশান্তি সৃষ্টি করা ইসলামে সমর্থিত নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর যখন সে ফিরে যায় তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।'[২] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, 'পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।'[৩] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির র. বলেন, শান্তি স্থাপনের পর ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় ও যেসব কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কেননা যখন কাজকর্ম শান্ত পরিবেশে ঠিকঠাক চলতে থাকে তখন যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তবে তা হবে বান্দাহ্দের জন্য বেশি ক্ষতিকর। এজন্য মহান আল্লাহ্ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

২০.৪. শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি সম্পাদন : প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ না করে সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া মহানবী স.-এর শান্তিকামিতার আরো একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য হুদাইবিয়ার সন্ধি ছাড়াও আরো বহু সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ স. সারা জীবন এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে 'হিলফুল ফুযুল' নামের একটি শান্তিসংঘ গঠন করেন। এর প্রথম মূলনীতিও ছিল সকল ধরনের অশান্তি দূর করা।

২০.৫. মদিনা সনদ শান্তির ঐতিহাসিক মডেল : ইসলাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ইসলাম কখনই অনর্থক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে সমর্থন করে না। তাই শান্তিদূত মুহাম্মদ স. মদিনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮।

[২]আল কুরআন, ২ :২০৫।

[৩]আল কুরআন, ৭ : ৫৬।

www.pathagar.com

নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মানবিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইতিহাসে এটি 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এটি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি। আজ পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রও এমন চুক্তি সম্পাদন করে তা কার্যকর করতে সক্ষম হয়নি। এ চুক্তির নানামুখী উদ্দেশ্যের একটি ছিল যুদ্ধের পরিবর্তে পরস্পরের শান্তিপূর্ণ অবস্থান। এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারিতকে সাহায্য করা এবং চুক্তিভুক্ত সকল পক্ষের মান-মর্যাদা ও ধর্মবিশ্বাসের অধিকার সংরক্ষণ করা। ইসলাম যে শান্তি চায় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো এই মদিনা সনদ।

'মদিনা সনদ' ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। এটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নৈরাজ্য, সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করে যুদ্ধপ্রিয় গোত্রগুলোর মাঝে সংঘাতের পরিবর্তে গড়ে তোলে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন।

২০.৬. শান্তি রক্ষায় প্রতিশ্রুতি পালন : ইসলামী নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। শান্তি স্থাপনের জন্য বা অন্য যে কোনো কারণে কারো সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে কিংবা কোনো সন্ধি করলে তা রক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্যকর্তব্য। চুক্তি ভঙ্গ কিংবা ওয়াদা রক্ষা না করার কারণে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যুদ্ধ ও নানা রকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রতিশ্রুতি পালন করাকে ইসলাম খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন তোমরা পরস্পর অঙ্গীকার করো।'[১] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[২]

প্রতিশ্রুতি পালনের বাস্তব নমুনা রেখে গেছেন রাসূলুল্লাহ্ স, নিজেই। বদর যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ। এ সময়ে মুসলমানদের জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা কত তীব্র ছিল, তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। এমন সময়ে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং তার পিতা হাসিল বিন জাবির মুসলিম বাহিনীর দিকে রওনা দিলেন। পথে কাফিররা তাদের গতিরোধ করে বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই মুহাম্মদকে মদদ যোগাতে যাচ্ছ।' তারা বলল, 'না আমরা মদিনায় যাচ্ছি।' কাফিররা তখন তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দিলো যে, তারা যুদ্ধে অংশ নেবে না। তারা দুজনই সোজা বদরের ময়দানে গিয়ে

---

[১]আল কুরআন, ১৬ : ৯১।

[২]আল কুরআন, ১৭ : ৩৪।

www.pathagar.com

হাজির হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ স.-কে সব খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'তোমরা মদিনায় চলে যাও। আমরা ওয়াদা পালন করবো এবং তাদের মোকাবেলায় জয়লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইবো।'[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুসলমান বা একটা মুসলিম রাষ্ট্রও যদি একটা অঙ্গীকার করে তবে সমগ্র জগতের মুসলমান এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে যায়। এমনকি একজন ক্রীতদাসের দেয়া অঙ্গীকারকেও সম্মান করার বিধান ইসলামে রয়েছে। একবার আবু উবায়দা খলিফা উমর রা,-কে লিখে পাঠান যে, একজন ক্রীতদাস ইরাক শহরের অধিবাসীদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এ সম্পর্কে তিনি খলিফার অভিমত জানতে চান। উত্তরে খলিফা লিখলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি পূরণকে মহান কাজ বলে গণ্য করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ না করা পর্যন্ত তুমি মুসলমান হতে পারো না। সুতরাং প্রতিশ্রুতি পালন করো।'[২]

মুআবিয়া রা. কর্তৃক প্রতিশ্রুতি পালনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা। তিনি রোমানদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তিনি ভাবলেন, মেয়াদ তো প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। যদি এর মধ্যে আমি রোমের সীমান্তে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখি তাহলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারব। কারণ প্রতিপক্ষ হয় তো এভাবে বসে আছে যে, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। এসব চিন্তা করে মুআবিয়া রা. রোম সীমান্তে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখলেন।

চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক মুআবিয়া রা. শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ শুরু করলেন। শত্রু বাহিনী প্রস্তুত ছিল না বলে মুসলিম বাহিনী অতি সহজেই শহরের পর শহর, জনপদের পর জনপদ জয় করে এগিয়ে যেতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে পেছন থেকে এক অশ্বারোহী উল্কার ন্যায় ছুটে আসছেন এবং চিৎকার করে বলছেন, 'আল্লাহু আকবার। চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করো, বিশ্বাসঘাতকতা করো না।' মুআবিয়া রা. থেমে গেলেন এবং দেখলেন আগন্তুক লোকটি আমর ইবনে আবাসা রা.। তিনি মুআবিয়া রা.-কে বললেন, 'মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিশ্রুতি পালন করা, গাদ্দারি করা নয়।' উত্তরে মুআবিয়া রা. বললেন, 'আমি তো গাদ্দারি করিনি। আমি তো যুদ্ধবিরতির মেয়াদ

---

[১]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র., আল-জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

[২]আবদুর রহমান আয্যম, মহানবী (সা)-এর শাশ্বত পয়গাম, অনুবাদ- আবু জাফর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ. ১১৯।

www.pathagar.com

শেষ হওয়ার পরই আক্রমণ করেছি।' আমর রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি : 'কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যে লোকের চুক্তি হয়েছে সে যেন এই চুক্তি ভঙ্গ না করে এবং এর বিপরীত কিছু না করে। চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত কিংবা চুক্তির মেয়াদের পর খোলামেলা ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত এটা ভঙ্গ করা যাবে না।' বর্ণনাকারী বলেন, 'তারপর মুআবিয়া রা. নিজের লোকদের নিয়ে ফিরে আসেন।'[১]

আমরের কণ্ঠে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর এ বাণী শুনে মুআবিয়া রা. যুদ্ধাভিযান বন্ধের নির্দেশ দিলেন এবং বিজিত অঞ্চল প্রতিপক্ষকে ফিরিয়ে দিলেন।

২০.৭. দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধের শান্তিপূর্ণ উপায় : ইসলাম চায় পৃথিবী থেকে অশান্তি চিরতরে নির্মূল হোক এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হোক। এ জন্য যুদ্ধের বিকল্প অনুসন্ধান করে। যেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা যায় তা দূর করতে যুদ্ধের পরিবর্তে প্রথমে শান্তিপূর্ণ উপায় খোঁজে; যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে মীমাংসা করতে চায়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ না হলেই কেবল ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর যদি মু'মিনদের দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর আক্রমণ করে, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।'[২] এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য পরিপন্থি কোনো কাজ পছন্দ করে না এবং সেগুলো দূর করতেও চরমপন্থা গ্রহণ করে না। এ থেকে আরো একটি কথা প্রমাণ করা যায় যে, ইসলামী শরী'আহ্র সকল বিধিবিধানই বিশ্ববাসীর জন্য শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণকর।

২০.৮. শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে যুদ্ধ ও মতভেদ না করার কুরআনি দৃষ্টিভঙ্গি : মতবিরোধের ক্ষতি ও শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতির পরিণাম বুঝতে হলে এটা জানা জরুরি যে, আল্লাহ্ তা'আলার নবী হারুন আ. মতবিরোধ, শ্রেণিবিভক্তি ও বিশৃঙ্খলাকে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বিভক্তি ও অশান্তি সৃষ্টির পরিণতিকে মূর্তিপূজার চেয়েও খারাপ বিবেচনা করেছেন।[৩] ঘটনার বিবরণ হলো, হযরত মূসা আ. তাঁর ভাই হযরত হারুন আ.-কে প্রতিনিধি

---

[১]সহিহ আত-তিরমিযি, তাহকিক-মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, কিতাবুস সিয়ার আন রাসূলিল্লাহ স., বাবু মা জায়া ফিল গাদরি।

[২]আল কুরআন, ৪৯ : ৯

[৩]ড. ত্বাহা জাবির আলওয়ানী, ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৯, পৃ. ২৯।

www.pathagar.com

হিসেবে তাঁর কওমের কাছে রেখে যান। এ সময় ছামেরি নামের এক ব্যক্তি সোনা দিয়ে গো-বাছুর তৈরি করে। বনি ইসরাইল এতে ফেৎনায় পড়ে যায়। এমনকি তারা এর পূজা শুরু করে দেয়। 'হারুন আ. এই মারাত্মক বিকৃতি সম্বন্ধে চুপ থাকলেন।'[১] মূসা আ. তাঁর সম্প্রদায়ের উক্ত গোমরাহির কথা জেনে ফিরে এসে তাঁর ভাইকে বললেন, 'হে হারুন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করলো—আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে? তবে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করলে?'[২] উত্তরে হারুন আ. বললেন, 'হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও চুল টেনো না।' আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, 'তুমি বনি ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার কথা পালনে যত্নবান হওনি।'[৩]

ড. ইউসুফ আল-কারযাভি বলেন, 'এখানে লক্ষ করা যায় যে, হারুন আ. প্রধান নেতা ফিরে না আসা পর্যন্ত দলের ঐক্য ধরে রাখার নিমিত্তে কওমের গোমরাহির মতো কাজেও বাধা না দিয়ে চুপ থাকাকে শ্রেয় মনে করেছেন, যাতে কেউ বলতে না পারে যে, তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন।'[৪]

২০.৯. ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সব যুদ্ধ নিষিদ্ধ : ইসলাম অনর্থক ও অন্যায় যুদ্ধ সমর্থন করে না। ইসলাম কেবল পবিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যায়সঙ্গতভাবে জিহাদের অনুমতি দিয়েছে। ইবনে খালদুন ও আল তুরতুশি যুদ্ধকে 'সামাজিক দুর্যোগ' এবং আল হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ্ যুদ্ধকে 'সামাজিক ব্যাধি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫]

ইসলামী শরী'আহ্ সকল ধরনের যুদ্ধের অনুমতি দেয়নি। ইবনে খালদুন বলেন, যুদ্ধ চার প্রকার। প্রথমত, গোষ্ঠীগত যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, আদিম মানুষের হানাহানি ও হামলা। তৃতীয়ত, শরী'আহ্ অনুমোদিত ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ বা জিহাদ। চতুর্থত, বিদ্রোহী ও বিভ্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তিনি আরো বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের যুদ্ধ বৈধ নয়। বাকি দুই ধরনের যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৬]

---

[১]আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

[২]আল কুরআন, ২০ : ৯২-৯৩।

[৩]আল কুরআন, ২০ : ৯৪।

[৪]আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

[৫]মজিদ কাদ্দুরী, ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ, অনুবাদ- অধ্যাপক হাসান জামান, জ্ঞান বিতরণী, ২০১০, পৃ. ৫৭।

[৬]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ স. যুদ্ধের উন্মাদনা কখনোই পছন্দ করেননি। তিনি বলেছেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলা করতে ইচ্ছে পোষণ না করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার দু'আ করো।'[১]

আহযাব বা পরিখার যুদ্ধে পরিখা খনন করতে করতে রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি না থাকলে আমরা পথের সন্ধান পেতাম না; সাদাকাহ্ দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। তুমি আমাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করো এবং যখন আমরা শত্রুর সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করো। তারাই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। তারা যখনই কোনো ফিতনা সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি।'[২]

২০.১০. সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও সম্পদ লুটের জন্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ : ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য মহৎ। শুধু দেশ জয় করা, গনিমতের মাল অর্জন করা, নিজেদের জঙ্গিত্ব জাহির করা, অন্য দেশকে পঙ্গু করা, সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ করা বা বিশ্বের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অধিকারী হওয়া বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য যা মূলত কোনো দেশের শক্তি বৃদ্ধির জন্যই করা হয়, এমন যুদ্ধ ইসলাম সমর্থন করে না।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ স,-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, এক ব্যক্তি গনিমতের মাল অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে, অপর এক ব্যক্তি নিজেদের বীরত্ব দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করে? রাসূলুল্লাহ্ স. জবাব দিলেন, 'যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, তার যুদ্ধই আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ।'[৩]

ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো মানবতার মুক্তি, জুলুমের অবসান, শান্তি স্থাপন, স্বৈরাচার উৎখাত, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং সকল মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। যেমন, পারস্যের সেনাপতি রুস্তম মুসলিম সেনাপতি রিবয়ি ইবনে আমেরকে মুসলমানদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে রিবয়ি জবাবে বলেন, 'আমরা এমন এক জাতি, আমাদেরকে আল্লাহ্ এজন্য প্রেরণ করেছেন যে, আমরা যেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্বাধীন করে দেই। ধর্মের শোষণ থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের সুশাসন দান

---

[১]আব্দুর রহমান আয্যম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

[২]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল জিহাদি ও ওয়াস্সিয়ার, বাবু হাফরিল খানদাক।

[৩]সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল জিহাদি ও ওয়াস্সিয়ার, বাবু মান কাতালা লিতাকুনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল উলইয়া।

www.pathagar.com

করি। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে পরকালের বিশালতার দিকে নিয়ে যেতে পারি।'[১]

কুরআন-সুন্নাহ্, রাসূলুল্লাহ্ স.-এর জীবনী এবং তাঁর জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে যেসব নির্দেশ, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম শুধু পার্থিব সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার ধনসম্পদের অভাব নেই। অন্য সম্প্রদায় বা লোকের ওপর আধিপত্য বিস্তার, কোনো সামাজিক শ্রেণিকে অপরের চেয়ে পদমর্যাদায় উন্নত করা, অর্থনৈতিক বা সামরিক উদ্দেশ্যে কোনো দেশের সীমানা বৃদ্ধি করা, কাঁচামাল ও বাজার সৃষ্টি করা অথবা সংস্কৃতির দিক থেকে পশ্চাৎপদ জাতিকে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো মানবিক ও সার্বজনীন। ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য উদার। সমগ্র মানব জাতিকে এক পরিবারভুক্ত মনে করে এবং সকলকে অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা কেবল মুসলমানদের আল্লাহ্ নন– তিনি সমগ্র বিশ্বের আল্লাহ্।[২]

২০.১১. প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ : প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধকে পৃথিবীর সকল মানুষ, সকল ধর্ম, সকল মতাদর্শে এবং সকল যুগে শুধু সমর্থনই করা হয়নি; বরং এ ধরনের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়াকে চরম গর্হিত কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

একসময় খৃস্টধর্মে যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে পরিহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। যিশুখৃস্ট বলেন, 'তোমরা মন্দ কাজে বাধা দিও না। কেউ যদি তোমাদের ডান গালে চড় মারে, তাহলে তার দিকে তোমাদের বাম গালও এগিয়ে দাও, কেউ যদি তোমাদের এক মাইল যেতে বাধ্য করে, তোমরা তার সাথে দুই মাইল যাও।'[৩] তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তলোয়ার যথাস্থানে রেখে দাও। কারণ যারা তলোয়ার ধারণ করে তারা তলোয়ারের সাথেই ধ্বংস হয়ে যায়।'[৪] যিশুখৃস্টের এই মহান বাণী নিঃসন্দেহে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ব্যাপারে শতভাগ প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের ক্ষেত্রে খৃস্টানগণও যিশুখৃস্টের ঐ বাণী

---

[১]ড. ইউসুফ আল কারযাভি, হাকিকাতুত তাওহিদ। উদ্ধৃত : মোঃ মুখলেছুর রহমান, সন্ত্রাস নয়, শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম, এনআরবি গ্রুপ, ২০১১, পৃ. ৪১।

[২]আবদুর রহমান আয্যম, মহানবী (সা)-এর শাশ্বত পয়গাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

[৩]মথিউ- ৫ : ৩৯.৪২। উদ্ধৃত : আবদুর রহমান আয্যাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

[৪]আবদুর রহমান আয্যাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

www.pathagar.com

থেকে সরে এসেছেন। পরবর্তীকালে তারা স্বার্থপরতা ও দস্যুসুলভ মনোভাব পরিহার করে অত্যাচারিতের সাহায্যার্থে সংঘটিত যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ বলে অভিহিত করে।

হিন্দু ধর্মেও শেষের দিকের দার্শনিকগণ 'অহিংসা পরম ধর্ম'-এ মতবাদ প্রচার করেন এবং নরহত্যাকে পাপ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু একই সময়ের ধর্মবেত্তা 'মনু'-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যদি কেউ আমাদের স্ত্রীদের বেইজ্জতি করে, সম্পদ ছিনতাই করে কিংবা আমাদের ধর্মের অবমাননা করে তাহলে আমরা কী করবো? তিনি জবাবে বলেন, 'এমন অপরাধী মানুষকে মেরে ফেলা উচিত, সে গুরু কিংবা ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ কিংবা তরুণ, যাই হোক না কেন।'[১]

শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ইসলামেও উপযুক্ত ও বৈধ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধকে সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো যারা আক্রান্ত হয়েছে। কেননা, তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে।'[২]
'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না।'[৩]

বিখ্যাত ফিকহের গ্রন্থ বাদায়েউছ ছানায়েতে লেখা হয়েছে, 'শত্রুরা যখন কোনো মুসলিম দেশের ওপর আক্রমণ চালায় তখন জিহাদ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের ওপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয়ে যায়।'[৪]

২০.১২. যুদ্ধ নয়, শান্তিই ইসলামের পরম আরাধ্য : যুদ্ধ নয়, শান্তিই ইসলামের পরম আরাধ্য। ইসলাম কথায় কথায় যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। যেসব ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে তার উদ্দেশ্যও ওই একটি–শান্তি প্রতিষ্ঠা।

সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতিসংক্রান্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, 'এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।'[৫] 'তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ খোলা রাখেননি।'[৬] আল

---

[১]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
[২]আল কুরআন, ২২ : ৩৯।
[৩]আল কুরআন, ২ : ১৯০।
[৪]বাদায়েউছ ছানায়ে, খ.৭, পৃ. ৯৮।
[৫]আল কুরআন, ৮ : ৩৯।
[৬]আল কুরআন, ৪ : ৯০।

www.pathagar.com

কুরআনের এসব নির্দেশনা থেকে প্রমাণিত হয় ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই।

শান্তি প্রতিষ্ঠার অবিরাম সংগ্রামে অনন্যোপায় হলে কখনো কখনো ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেমন মানবদেহের কোনো অঙ্গে পচন ধরলে পুরো দেহের রক্ষার্থে উক্ত অঙ্গকে কেটে ফেলতে হয়, তেমনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিবিরুদ্ধ শক্তিকে যুদ্ধের মাধ্যমে নির্মূল করতে হয়েছে। এ পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনে অনিবার্যভাবে কোনো যুদ্ধে যদি লিপ্ত হতেই হয় তবে সেখানেও নেয়া হয়েছে পরিকল্পনা ও কৌশল, যাতে অল্প প্রাণবিয়োগেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সফল হয়। এ জন্য আমরা দেখি যে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সময়ে সংঘটিত ৫৭টি যুদ্ধে উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা মাত্র ১৬২ জন।[১] এতো অল্প প্রাণের বিনিময়ে সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণবাদী বিপ্লব সফল হওয়ার নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। অন্য দিকে যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিগত মাত্র দুটি বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ প্রাণ হারায় এবং আরো বেশি লোক বিকলাঙ্গ ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমা হামলায় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, লাখ লাখ লোক প্রাণ হারায় এবং বহু লোক বিকলাঙ্গ ও স্থায়ী ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

আরো মর্মান্তিক ঘটনা লক্ষ করা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর অপরাধে ১,৫৮,০০০ সৈন্যকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট শাসক জোসেফ স্টালিন শুদ্ধি অভিযানের নামে কুখ্যাত গ্রেট টেরর (Great Terror, ১৯৩৭-১৯৩৮)-এর সময় দশ লাখ ভিন্ন রাজনৈতিক মতে বিশ্বাসীকে তাদের মাথার পেছনে গুলি করে হত্যা করেছিল। ওদিকে চায়নাতে মাও সে তুং ১৯৪৯-এ আট লাখ চায়নিজ নাগরিককে রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।[২] ২০১৩-২০১৪ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট আল সিসি মুসলিম ব্রাদারহুডের হাজার হাজার নেতকর্মীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে এবং প্রায় এক হাজার জনকে তথাকথিত বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করে। তাই সকল কিছু বিবেচনা করলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামের চেয়ে সহনশীল ও মানবদরদি আর কোনো মতাদর্শে নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সাধন করা হয়।

---

[১]খন্দকার মনসুর আহমদ, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দিশারী মহানবী (সা), মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা সম্পাদিত, বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ৩৭৮।

[২]শফিক রেহমান, মৃত্যুদণ্ড দেশে বিদেশে যুগে যুগে (৬), দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১১ জুন, ২০১৪।

www.pathagar.com

২০.১৩. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অসহায়-নির্যাতিতদের সহায়তার জন্য যুদ্ধ : ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জালিমের কবল থেকে অসহায় ও নির্যাতিতদের সাহায্য করার জন্য। এ ধরনের যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ (legitimate war) বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছ না এবং সেসব অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য, যারা ফরিয়াদ করে বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ হতে বের করে নিয়ে যান এবং আপনার তরফ থেকে কাউকে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করুন আর আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী বানিয়ে দিন।'[১]

২০.১৪. ইসলামে যুদ্ধের নিয়ম ও শিষ্টাচার মানবিকতা সম্পন্ন : ইসলামের যুদ্ধনীতি অধিকতর মানবিকতাবোধ সম্পন্ন। যেসব ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। ইসলাম অতর্কিতভাবে কোনো জাতির ওপর আক্রমণ চালানোর অনুমতি দেয় না। কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে প্রথমে তাকে চরমপত্র দিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে হবে। এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন না হলেই কেবল যুদ্ধ করা যাবে।

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা. সিরিয়ায় সৈন্যবাহিনী পাঠানোর সময় তাদেরকে যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন সেগুলোর মধ্যে ইসলামী যুদ্ধনীতির নানা মানবিক দিকগুলো ফুটে উঠেছে। উক্ত নির্দেশগুলো হলো :[২]

ক. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে কেউ যেন হত্যা না করে।
খ. লাশ যেন বিকৃত করা না হয়।
গ. সন্ন্যাসী ও তপস্বীদের যেন কষ্ট না দেয়া হয় এবং কোনো উপাসনালয় যেন ভাঙচুর না করা হয়।
ঘ. ফলবান বৃক্ষ যেন কেউ না কাটে এবং ফসলের ক্ষেত যেন ধ্বংস না করা হয়।
ঙ. জনবসতিগুলোকে যেন জনশূন্য না করা হয়।
চ. পশুদের যেন হত্যা না করা হয়।
ছ. প্রতিশ্রুতি যেন ভঙ্গ না করা হয়।
জ. যারা আনুগত্য স্বীকার করবে তাদের জান-মালকে অবিকল মুসলমানদের জানমালের মতো নিরাপত্তা দিতে হবে।

---

[১]আল কুরআন, ৪ :৭৫।
[২]সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র., আল-জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০।

www.pathagar.com

ঝ. গনিমতের সম্পত্তি যেন আত্মসাৎ না করা হয়।

ঞ. যুদ্ধে যেন পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা হয়।

২০.১৫. পরাজিতদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ : ইসলাম শিক্ষা দেয় বিজিতদের সাথেও উত্তম আচরণ করতে। ইসলামের এ শিক্ষার বাস্তব উদাহরণ হলেন রাসূলুল্লাহ্ স. নিজেই। বদর যুদ্ধের বন্দিদের সাথে তিনি যে উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাধারণ ক্ষমা মানুষের জীবনরক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। ইসলামের অস্তিত্ব নির্মূল করার ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যার সুযোগ পেয়েও তিনি সেদিন তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি কাবার প্রাঙ্গণে অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশে বলেছিলেন, 'তোমরা কি জান আজ আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবো?' সমস্বরে জবাব এলো, 'আপনি সম্ভ্রান্ত ভাই এবং সম্ভ্রান্ত ভাইয়ের সন্তান।' মহানবী স. বললেন, 'আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো প্রতিশোধস্পৃহা নেই, যাও তোমরা সবাই মুক্ত-স্বাধীন।'[১]

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ স. ক্ষমার যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ইতিহাসে তা বিরল। সেদিন তিনি তাঁর আপন চাচা হামযা রা.-এর হত্যাকারী ওয়াহশি এবং তাঁর বক্ষ বিদারণ করে কলিজা চর্বণকারী হিন্দার মতো ইসলামের ঘোর দুশমনকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ স. শত্রুর সাথে যে মানবীয় আচরণ করেছিলেন সে সম্পর্কে ইতিহাসবিদ লেনপল বলেন, পরম শত্রুর ওপর মুহাম্মদ স.-এর সেই মহাবিজয়ের দিনটিও ছিল তাঁর আপন চিত্তের ওপরেও মহাবিজয়ের দিন। যে কুরাইশরা তাঁকে দুঃখ ও নির্যাতনে জর্জরিত করেছিল তিনি তাদেরকে নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দিলেন, সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য ঘোষণা করলেন সাধারণ নিরাপত্তা।[২]

এর চেয়ে অনুপম নজির আর কী হতে পারে যে, পরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়। রাসূল স.-এর এ নীতি অনুসরণ করা হলে পৃথিবীতে আর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থাকত না। মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের এ মহান জীবন দর্শন আমাদেরকে অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।

---

[১]নাসাঈ; কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসুরপুরী, রহমাতুল্লিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ১১৮; ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

[২]স্টেনলি লেনপল, দি স্পিচেজ এ্যান্ড টেবল টক্ অব দি প্রফেট মুহাম্মদ, ম্যাকমিলান এ্যান্ড কোং, লন্ডন, ১৮৮২, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুক্তদেশ
মুক্তচিন্তার সৃজনশীল প্রকাশন
ISBN 978 984 8690 574
9 789848 690574